

অপ্সময় চক্রবর্তী

# রাক্ষসায়ন



রাসায়ন

বই পড়ুন, বই পড়ান

রাক্ষসায়ন

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আ  
আ স্বা জা

RAKKHOSAYAN

A Short Story Collection by Swapnamay Chakraborty

Published by ATMAJAA PUBLISHERS

ওয়েব : [www.atmajaa.com](http://www.atmajaa.com)

ইমেইল : [contact@atmajaa.com](mailto:contact@atmajaa.com)

ISBN : 978-93-87885-16-5

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৪২৫

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

প্রকাশক

অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়

আত্মজা পাবলিশার্স

বসন্ত কুসুম, আড়িয়াদহ, কোলকাতা - ৫৭

মুদ্রণ

শরৎ ইমপ্রেশনস্ প্রাঃ লিঃ

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত : লেখক

(অনুমতি ছাড়া এই বইটির কোনও ধরনের প্রতিলিপি অথবা

পুনরুৎপাদন করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি

করা যাবে না। এই শর্ত অমান্য হলে

উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। )

সমাজ সমাবিষ্ট লেখক ও গবেষক  
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য বন্ধুবরেন্দ্র।

## বিন্যাস

ঝড়ে কাক মরে  
লজ্জামুঠি  
মানুষ কিংবা কোলবাশিশ  
গণেশ  
মানুষ ও বেগুন  
উইশ  
কাকায়ন  
যন্ত্রপাতি  
এ জীবন লইয়া কী করিব?  
আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের আশ্চর্য প্রযুক্তি  
তুরতুরির ডিম  
ক্যারাক্লাস্  
হনুমান  
কুহু  
কাননে কুসুম কলি  
একটি সতর্কতামূলক রূপকথা  
লাপ্লা  
ব্লু সি.ডি নিয়ে একটি গল্প  
প্রায় জ্যান্ত মেশিন বনাম প্রায় মৃত মানুষ  
বহুজাতিক  
জিনে, ক্রোমজমে  
সিলি সিলিকোন  
ভ্যাম্পায়ার  
রাস্কসায়ন

গত শতকের আট ও নয়ের দশকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মানুষ ও মেশিনের জটিল সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন, গল্পগুলি পুস্তকাকারে ‘সতর্কতামূলক রূপকথা’ নামে সংকলিত হয় কুড়ি বছর আগে। সেই বইটি দীর্ঘদিন ধরেই পাওয়া যায় না। পরে নতুন মুদ্রণও হয়নি। আমাদের মনে হয়েছে – সময়ের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে লেখক তখন গল্পগুলি লিখেছিলেন। আজ এই বিষয়ক সন্দর্ভ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

একই চিন্তাসূত্রে, গত কুড়ি বছরে এই লেখক আরও বেশ কয়েকটি এই বিষয়ক গল্প লিখেছেন। সেরকম আরও নয়খানি নতুন গল্প যুক্ত করে এই সংকলন প্রকাশিত হল।



## ঝড়ে কাক মরে

ফটোকপিয়ার মেশিনের এই প্লেটটা কিন্তু খুব ইমপোর্টেন্ট। এই যে কালো প্লেটটা দেখছেন, এর মধ্যে আছে সeleniাম কম্পাউন্ডের একটা ফিল্ম! সeleniামে একটা অদ্ভুত প্রপারটি আছে, এর মধ্যে লাইট পড়লে সeleniাম অ্যাটম থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে, ফলে সeleniাম চার্জড হয়ে যায়। এটাকে বলে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। বুঝতে পারছেন?

কিছুই বুঝতে পারছি না। তবু আলতো ঘাড় নাড়ি। পাশের ছেলেটিকে ফিসফিস করি। আপনি তো বেশ বুঝছেন দাদা, আপনি তো বি এস-সি। বুঝিয়ে দেবেন কিন্তু? ছেলেটি পরে বলেছিল, ধুং মশাই, ফটোফিজিক্স চ্যাপ্টারটা পড়েছি নাকি, আমাদের বেলা ওটা সাজেশনে ছিল না, আগের বারে এসে গিয়েছিল। তাছাড়া ওসব থিয়োরি ফিয়োরি বুঝে কী করবেন, প্র্যাকটিসটাই আসল।

খুব প্র্যাকটিস করলাম। দু-মিনিটেই একটা করে প্রিন্ট বার করে দিছি। ট্রেনার বলল, ভেরি গুড। আপনার হবে। কালি লাগানো বিড্‌স্‌গুলো প্লেটের গায়ে লেগে কী সুন্দর শিরশির শব্দ করে। হাতে কালো কালি লাগে, লাগুক। জামায় কালির গুঁড়ো পড়ে, পড়ুক। এই জামা নিয়ে আমি চন্দনার কাছে যাব। দ্যাখো, জেরক্স মেশিন। হাত মুছতে হয় বলে রুমালে ফিক্সার নামক কেমিক্যালটির মৃদু গন্ধ। আঃ। ওই কেমিক্যালটা কী যেন? অ্যাসিটালডিহাইড, নাকি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড? যা খুশি হোক। যখন বিজনেস শুরু করব, ক্যানিং স্ট্রিটে ফিক্সার বললেই মাল পেয়ে যাব।

ট্রেনিং চলছে। যে কোম্পানির মেশিনটা কেনা হচ্ছে সেই কোম্পানির পাঁচ দিনের ট্রেনিং। ব্যাঙ্ক লোন ম্যানেজ হয়েছে। জেরক্স-এর বিজনেস করব। ট্রেনিং-এর লাস্ট দিনে মা পকেটে ব্যোমকালীতলার ফুল গুঁজে দিল। দুগ্ধা-দুগ্ধা। দিন দশ-বারের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাবে মেশিনটা।

বাড়িওয়ালার টাকাটা পুরো ক্রিয়ার না হলে চাবি পাওয়া যাবে না, তার পরেও অনেক কাজ। ওয়ারিং করানো, সাইনবোর্ড, রং, তা ছাড়া একটা হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে হবে। সুসংবাদ! সুসংবাদ! আর শহরে ছুটিতে হইবে না। হেলা বটতলার মোড়ে নূতন জেরক্স মেশিন। গ্রাজুয়েট বেকার ছেলেকে মদত করুন। না। আমি এটা লিখব না। আমার বড় বানান ভুল হয়। আমি লক্ষ্মণের কাছে যাই।

লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। বাংলায় অনার্স। এখন লক্ষ্মণ স্যার। এলা ওলা চল্লিশটা ছাত্র পড়ে। লক্ষ্মণ রচনা লেখাচ্ছে। ‘বিজ্ঞানের জয়যাত্রা’। মানুষের আগুন আবিষ্কার বাস্তবিক পক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইহা মানুষের জীবনযাত্রায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করিল...আরে, এ যে সুধীরবাবু স্যারের দেয়া সেই নোট। আমি ঝাড়া মুখস্থ করেছিলাম। আমাদের বেলা ভেরি ভেরি ইমপোর্টেন্ট ছিল। সেবার কোর্সেচন আউট হবার গুজবে পরীক্ষার ঠিক আগে আগে অন্য ইন্সকুলের ছেলেরা রাত জেগে আমার খাতা থেকে টুকে নিয়ে গেছিল কিন্তু পরীক্ষায় এসেছিল ‘বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ’। আমি ঝাড় খেয়ে গেলাম, কিন্তু লক্ষ্মণ তো ভালো ছেলে, সে ঠিক ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে দিল।

লক্ষ্মণকে একটু বাইরে ডাকি। ওকে জানাই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দোকান ওপেন হচ্ছে, সেদিন ওকে থাকতেই হবে। হ্যাণ্ড বিলটাও লিখে দিতে বলি, আর পাঁচশোটা টাকা চাই। ধার।

টাকা দিতে পারবে না লক্ষ্মণ। ওর টিভি-র পিকচার টিউবটা কেটে গেছে। তাছাড়া দু-তিন মাসের মধ্যেই ওর জমিটা রেজিস্ট্রি করে ফেলতে হবে।

তাহলে বরং আশুর কাছে যাই...

এইভাবে লক্ষ্মণ, আশু, কানাই, ট্যারাবাচ্চু, অ্যাটম, চপলাপিসী, ছোটমামা, এঁদের কাছে ঘুরঘুর করে টাকা পয়সা জোগাড় করি। মায়ের গয়নায় হাত দিতে আমি চাই না, কিন্তু উপায় ছিল না। পুঁটুলিটা নেবার সময় মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারি নি। পুঁটুলি মুঠো করে মাথা নিচু করে বসাক জুয়েলার্সে যাবার সময় মা বললেন, দুগ্গা দুগ্গা। আমি আট হাজার পাই। বাঁ হাতের চেটোয় চোখ মুছে পরান ঘোষকে বান টাকা দিয়ে আসি। উনি চাবি দেন। সেদিন সন্ধ্যায় চন্দনার সঙ্গে সিনেমায় গেলাম।

থালায় বড্ড বেশি ঠকাস্ শব্দ হল, বউদি যখন ভাত দিল রান্ধিরে। মা বোধহয় বুঝলেন। বউদি যেন না শোনে ততটা আস্তে এবং অস্ফুটে বললেন, গয়না তো তোমাকেও দিয়েছি বউমা -

অথচ সবাই বলেছিল আমাকে, বসে না থেকে ব্যবসা-ট্যাবসার চেষ্টা করতে। বউদিও তো বলেছিল চাকরি আজকাল খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরাও পাচ্ছে না। চায়ের দোকান করলেও অনেক ইনকাম। কোনো কাজই তো খারাপ নয়। আমার দাদারও হেভি টাইপের স্পিড। ডায়মণ্ড জুটমিলের টাইপিষ্ট। বাবা বেঁচে থাকতেই ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন। দাদা চুপিচুপি দু-হাজার দিয়ে বলেছিল, কাউকে বলিস না। ‘কাউকে’ কথাটার ঠিক ঠিক মানেরটা আমি জানি। বউদিকে কিছু বলি নি। মা জানেন। দাদার জুটমিল প্রায় বন্ধ থাকে। হেলা বটতলার মোড়ে তাপস স্টুডিওর বারান্দায় টাইপ মেশিন নিয়ে বসে। বেকার ছেলেরা পাশপোর্ট ছবি তুলিয়ে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করায়। কিছু হয়ে যায় দাদার। কত রকম সমস্যা আছে মানুষের, কত রকমের দরখাস্ত।

জেরক্স বসাব শুনেই দাদা ‘জেরক্স’ শব্দটা এমন ভাবে উচ্চারণ করেছিল যে ওটা অনেকটা আত্ননাদের মতো লেগেছিল। জেরক্স, এ্যাঁ? আমি বলেছিলাম সবাই বলছে এ অঞ্চলে জেরক্স নেই, ভালো চলবে।

অবনীর দাদা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, উনিও বললেন লোনের ব্যবস্থা করে দেবেন। একটুক্ষণ চুপ ছিল তারপর বলেছিল, আমার টাইপটা গেল। আমি বলেছিলাম, তা হলে? দাদা বলেছিল, তাহলে আর কি, ক্রু, সায়েন্স এগুচ্ছে, কিছুই থেমে থাকে না। আমার পাটকলও বন্ধ হয়ে আসছে, নাইলন, পলিথিন - পলিথিনকে কি থামানো যাবে? ক্রু, জেরক্সই ক্রু।

দেড়কাঠার ছোট প্লটে টালির চালের বাড়িটা মায়ের নামে ছিল। ওটার এগেনেস্টে ব্যাঙ্ক লোন। মা গ্যারেন্টার। জেরক্স মেশিন আসছে।

বিজনেস শুরু, দোকান ওপেন, দেয়ালে মাকালী, তাকে গণেশ। একটা রবীন্দ্রনাথের ছবিও রাখলাম। দাদার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। মাকে প্রণাম করি, মা আমার কড়ে আঙুল কামড়ালেন। একটা ঝাঁটার কাঠি মেশিনে লাগিয়ে রাখতে বললেন, তাহলে নজর লাগবে না। ব্যোমকালীতলায় পূজো দেয়া জবার মালা দিলেন, মেশিনে পরালাম।

দুগ্গা-দুগ্গা।

চন্দনা একবার এল। বেশ সেজেছে। ও এ্যাতো সেজেছে কেন?

মাকে লেখা মায়ের গুরুদেবের একখানা চিঠি পরম স্নেহস্পদা কুলবালা বিমলা সুন্দরী দেব্যা: দীর্ঘজীবেষু...চারকপি আমার প্রথম জেরক্স প্রিন্ট। মা টাকা দিলেন। মা আমার চোখে চেয়ে হাসলেন। বাড়িওলা পরান ঘোষকে মা মিষ্টি খাওয়ালেন। ব্যাঙ্ক থেকেও এসেছিলেন একজন। ট্যারাবাচ্ছু এই খুশির দিনে একটা পাইন্টের দাম চাইতে এল। গুরুদেবের চিঠির দশ মিনিট পরে আসে একটা পঞ্চায়েতের রসিদ, তারপর একটা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন, তারপর একটা দলিলের কপি। তারপর একটা প্রেমপত্র। স্টাটিং – আমার প্রাণের শুকতার। লাস্টে ছিল এবার ৮০, ET শেফালি। লোকটির মুখে দাড়ি, হাতে সিগারেট। চিন্তান্বিত। বলে – ‘দশ কপি। সার্কুলেট করে দেব শালা।’ দুগুগা-দুগুগা।

কে জানত এই মফস্বলে এতসব সমস্যা আছে, জেরক্স মেশিনের এত দরকার ছিল। নে-রে বাচ্ছু, তোর পাইন্টের দাম। দোকানটা দেখিস। মাসের শেষে মায়ের হাতে তিনশো দিলাম। মা দুহাত বাড়িয়ে টাকা এমনভাবে নিলেন যেন নির্মাল্য। একটা দশ টাকার নোট গুরুদেবের ছবিতে ছুঁইয়ে কোথায় যেন রাখলেন। বাবার ছবিকে প্রণাম করতে বললেন, এত খুশি হয়েছিলেন যে মা, লুচি করেছিলেন রাত্রে, আর শোবার আগে কি যেন ভাবতে ভাবতে একটা বালিশের গায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন, সেই স্পর্শ আমার চামড়ায় স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি চোখ মুছে ফেললেন মা, বললেন হ্যাঁরে, ধারের কিস্তিগুলো শুধেছিস তো? বলি ব্যাঙ্ক আর বাড়িওলাকে দিয়েছি। অন্যদের দুমাস পর থেকে দেব। মা বললেন, তোর পিসি আর মামারটা ঠিকঠিক দিয়ে দিস যেন।

একটা শাড়িও কিনেছিলাম চন্দনার জন্য। ওটা দোকানেই রাখা ছিল। চন্দনা এলেই কাগজের প্যাকেটের তলা থেকে শাড়ির প্যাকেটটা টেনে বের করে বললাম, এটা মাইরি তোমার।

চন্দনা প্যাকেটটা নিয়েই বলল, ‘উরি ক্বাবা।’ তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, প্যাকেটটার গন্ধ শুঁকল, গালে বোলাল। কালচে হয়ে যাওয়া শুকনো ব্রণর সঙ্গে ব্রাউন পেপার ঘষার মৃদু খরখর।

চন্দনা বলল, তোমার বউদির জন্য কিনেছ? আমি বলি, না তো। ও একটুক্ষণ পরে বলে, তাহলে এটা বউদিকেই দাও। আমি বলি, সে কি, এটা তো তোমার জন্য কেনা। বউদিকে না হয় পরে...

চন্দনা বলল, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। শাড়িটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে কী বলব? কে দিয়েছে বলব? তুমি তো জানো, ওরা তোমাকে...

-সে তো আমি বেকার ছেলে ছিলাম বলে। এখন তো আর বেকার না...

-তবু। মা বকবে। ইন্টারকাস্ট। এইজন্যই তো রেজিস্ট্রিটার কথা বলি।

-দাঁড়াও, আর ছটা মাস সময় দাও আমাকে, আমি মোটরসাইকেলে চড়ে তোমার বাড়ি যাব। ডাইরেক্ট বলব – ভালবাসি। কাস্ট-ফাস্ট সব ফুটে যাবে টাকার কাছে। দাঁড়াও, রেজিস্ট্রিটা শিগগির করে নিচ্ছি।

বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এই তিন চার মাসে। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। যে জনার্দনের মাঠে নাকি জনার্দন ঠাকুরের ভূত ঘুরে বেড়াত, সেই মাঠ ঘর বাড়িতে ভরে গেল গত এক বছরে। আমার দোকানটার ঠিক উল্টোদিকে অঘোর হালদারের লম্বা ফালি জমি। হালদার মশাইয়ের ছেলে পার্টির থেকে টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে কয়েকটা দোকানঘর তুলছে। আমি কত রকম বায়নানামা, দলিলপত্রের জেরক্স করছি।

দেখতে দেখতে অঘোরবাবুর ফালি জমিটা দোকানঘর হয়ে বিলি বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একটা দোকানের নাম স্ন্যাক্স, কেক, পেস্টি, রোল এই সব পাওয়া যায়। একটা দোকানের নাম একুশ শতক, টিভি, টেপারেকর্ডার, ভিসিআর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদি বিক্রয় ও মেরামত করা হয়। প্রিয়দর্শিনী নামে ব্লাউজের দোকান হল একটা, শুধু ব্লাউজ নয়, শোকেসে সব লাল-নীল ইয়ে টানটান করে রাখা, খুব লম্বা করে দেখাতে। স্টাডি সেন্টার নামে বইখাতা পেন্সিল, সুগন্ধি রবার কমিক্স আর রং তুলির দোকান, তার পাশেই স্পিড কপি সেন্টার, অটোমেটিক পদ্ধতিতে মিনিটে ২০টি জেরক্স করা হয়।

অটোমেটিক ক্যানন মেশিনটি বসিয়েছেন মুকুল শিকদার। সবাই মাকলুদা ডাকে। জমির দালালিতে দুপয়সা হয়েছে। বেশ কিছু লোককে টুপি পরিয়েছেন উনি। ব্যান্স-ফ্যান্সের তোয়াক্কা করেন না। বলে গেলেন – জমির লাইন বড় লাইন। ট্যাকনিকাল লাইনে শুরু করলাম। আইসো মাঝেমধ্যে।

কাচের ঘরের মধ্যে মেশিনটা। ছোটোখাটো বডি। খালি সুইচ টেপা। স্ফেম ধরে নাড়ানাড়ির ব্যাপার নেই, ফিক্সিং চেম্বার নেই, বিডস্ নেই, কালির গুঁড়ো নেই, তিন সেকেন্ডে একটা করে কপি।

দামটা কিরকম পড়ল দাদা?

দামের কথায় কাম কী? বহুত দাম।

নিজেই অপারেট করবেন, নাকি লোকটোক রাখবেন?

দেখা যাক সেল কেমন হয়। তেমন হইলে একটা লোকটোক তো রাখব অনে। জানাশুনা বিশ্বাসী আছে নিকি? সত্যকথা কইতে কি, এইসব টেপাটিপির কাম আমার পুয়ায় না।

দারুণ মেশিনটা কিন্তু আপনার। সময় পাইলে আইসো মাঝেমাঝে।

কে জানতো এত বেশি সময় পেতে থাকব। ক্রমশ আমার সেল কমছে। খুব সময় পেতে থাকি। প্রায়ই চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে থাকি। হেলাবটতলার মোড়ের রিকশাওলাদের আমার আত্মীয় মনে হয়। ওরাও আমার মতো চুপচাপ বসে আছে। ধাই করে চলে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার বোঝাই অটোরিকশা! আমার সামনে স্পিড জেরক্স। আমার ভাতে টান দিয়েছে বদমাশটা।

কে বদমাশ? স্পিড না জেরক্স। নাকি লক্ষ টাকার মূলধন যা দিয়ে স্পিড কেনা যায়, জানি না। আমি সামনের দোকানটার দিকে তাকাতে পারি না। ভয় হয়। মুকুল শিকদারের ‘স্পিড জেরক্সে’ এখন সবসময় কাজ। একদিন দেখতে পাই মুকুল শিকদারের স্পিড জেরক্সের গায়ে বড় বড় করে লেখা প্রতি কপি ৬০ পয়সা মাত্র। এতদিন ৭০ পয়সা ছিল। আমার রেটও কমাতে হয়। আমিও লিখে দি ৬০ পয়সা। তার মাত্র দুদিন পরে, সবে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, আকাশে বিলিক মেরেছে রোদ্দুর, মাকলুদা ভাঁড়ে রং নিয়ে ৬০-এর উপর ক্রশ চিহ্ন দিল। লাল কালিতে লিখল মাত্র ৫০ পয়সা। মাকলুদার পাতলা টেরিকট হাওয়াই শার্টের ভিতর দেখা যাচ্ছে জালি জালি গেঞ্জি। আমি দুহাতে আমার মাথার চুল চেপে ধরি। মুকুল শিকদারের কাছে ছুটে যাই। টেরিকট জামা, জালি জালি গেঞ্জি, ঘামাচিময় চামড়া ভেদ করে আমার নখর হাত ওর হৃদপিণ্ড চেপে ধরে। বলে দালালির কাঁচা পয়সায় অটোমেটিক মেশিন বসিয়ে খুব পাঁয়তারা হচ্ছে? কিন্তু আসলে বলি, মুকুলদা, এরকম করছেন কেন দাদা, আমাকেও বাঁচতে দিন।

-কেন? কী হয়েছে? মুকুলদা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন।

-পঞ্চাশ পয়সায় আমার পড়তা হয় না মুকুলদা, আমার সেল কম। প্লেটের দাম বাড়ছে, কালি, কেমিক্যাল দিনকে দিন বাড়ছে, আমার পোষাচ্ছে না।

-কিন্তু আমার তো পোষায় ভাই...

-আপনার তো পোষাবেই, আপনি মিনিটে কুড়িটা করতে পারেন। আপনার অনেক সেল। এমনিতেই আমার কাজ নেই, রোট বেশি থাকলে কেউ আসবে না অথচ আমার চারিদিকে ধার মুকুলদা, অনেক ধার করে মেশিনটা বসিয়েছি। ...আমার গলার স্বর এমন বিকৃত হয়ে যায় যে অচেনা লাগে।

মুকুলদা আমার গালে দু-আঙ্গুলের টোকা মারলে একফোঁটা জল ছিঁড়িছান হয়। বলে - শালা ইয়ং ছেলে, কাঁদিস? ঘাবড়াস না, আমি তরে মাঝে মাঝে কাজ পাঠামু আমি সামলাইতে পারছি না। দাঁড়া, চা আনাই। মুকুলদা লোক রেখেছে। সে খুব ব্যস্ত। 'নিজে বাঁচে পরকে রাখে ধর্ম বলে জানবি তাকে' ১০ কপি করে ও চা আনতে যায়। আমি খাব না চা।

চন্দনা বলল, কী গো বিজনেসম্যান, কী খবর? আমার রাগ ধরে। চন্দনা বলল, আমায় দেখতে আসবে। আমি নিশ্চুপ। বলো না, আমি কী করব। চন্দনা আমার জামার হাতা খামচে ধরে।

যা খুশি করো, বলে আমি অন্যদিকে মুখ ফেরাই। চন্দনা কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়।

লক্ষ্মণ আসে। লক্ষ্মণস্যার। সঙ্গে গুচ্ছের ছাত্র। কাল বাংলা পরীক্ষা। গুজব রটেছে রচনা আউট হয়ে গেছে। লক্ষ্মণ বলল, শিগ্গির চল্লিশ কপি। রচনার হেডিং মানব কল্যাণে বিজ্ঞান। ছিল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। ওটা কেটে এটা করা হয়েছে। ভূমিকার উপর কাগজের তালি। জয়যাত্রার জয়গায় মানব কল্যাণ, তাই ভূমিকায় একটু চেঞ্জ। মাঝখানে একটু এবং উপসংহারেও তালি মারা আছে। আমার ছাপতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে লক্ষ্মণ - ধুস্, এসব আর চলে না, বলে স্পিড জেরক্স-এ চলে গেল - আমার জন্য চক্ষুলজ্জায় মাত্র দশকপি রেখে।

পরদিন স্পিড জেরক্স আরো দশ পয়সা কমাল। মুকুলদার কাছে ছুটে যাই আমি। আমি কিছু বলার আগেই উনি বলেন, তোমার জন্য রোট কমাই নাই আমি। ইউ আর নট মাই কমিপিটিটার। বাসস্টিয়ান্ডে আরেকটা অটোমেটিক হয়েছে। ওরা এই রোটই রাখছে। কমিপিটিশন মার্কেট, বুঝলো না?

অ্যাটম তাগাদা দিয়েছে তিনবার। ট্যারাবাচ্চু বলল, দেখে নেবে। চপলাপিসি এসেছিল আমরা কেমন আছি দেখতে। বলে গেছে - আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্বাস করা খুব মুশকিল।

ব্যাঙ্কে গত মাসেও দিই নি, এ মাসেও পারব না। সারাদিন ছ-টাকার কাজ হয়েছে আজ। রাত্তিরে চাবি বন্ধ করি। এ চাবি যেন আর খুলতে না হয়। যেন মরে যাই, আজ রাত্তিরেই যেন মরে যাই। বাড়ি গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ি। বিকৃত গলায় বলি, মা, মেশিন বেচে দেব। আমি তোমার সব নষ্ট করেছি মা, গয়না, টাকা...

চন্দনারও চোখের তলায় যেন হঠাৎ কালি। বলে, মেশিনটা বেচে দিয়ে তারপর কী করবে তুমি? আমি বিড়বিড় করে বলি, মুকুলদার দোকানে কাজ নেব। ও বলল, এমন ভেবো না। কানের কাছে মুখ আনে চন্দনা। বলে, তুমিও অটোমেটিক মেশিন কেনো। এটা বেচে দিয়ে...আমার তো হার আছে, বালা আছে...

ওতে কিছু হবে না চন্দনা, অটোমেটিক মেশিন অনেক দামি, দামের সঙ্গে পারবে যুদ্ধ করে? কদিন পরে আরো ভালো আর আরো দামি কিছু বেরিয়ে যাবে। জানো, ঝড় বইছে, টেকনোলজির ঝড়।

এখন বড় আস্তে হাঁটি আমি। আমার সারা গায়ে হালকা বাতাসে ওড়া এঁটো শালপাতার দুঃখ। বাড়ি গিয়ে দেখি মায়ের গুরুদেবের ছবিটা ভাঙা। মায়ের বিছানায় ভাঙা কাঁচের টুকরো পড়ে আছে। মা তবে ভেঙেছে ছবিটা, অবিশ্বাসে, রাগে, অভিমানে। মা এলেন ঘরে। মায়ের কপালে দেখি রক্ত। উঃ, রক্ত। এবার বুঝে যাই। ছবিতে মাথা ঠুকেছিল মা, ভীষণ। কী হবে মা?

অ্যাটম, টেরুয়া, চপলাপিসি, চিন্তা কোরো না। সবাইকে শোধ করে দেব। বাড়িওলা অঘোরবাবুকে ছেড়ে দেব। তোমার ঘর ছেড়ে দেব আমি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম নতুন অবস্থায় একটি জেরক্স মেশিন বিক্রয়। কয়েকজন দেখে গেল। বাড়িওলা বলল, সেই ভালো। অল্প কেপিটালে এইসব হয় না। এখন কি করবেন, চায়ের দোকান-টোকান? নাকি দোকানটা ছাড়বেন। দোকানটা ছাড়লে আপনার সঙ্গে কথা আছে। ভালো পার্টি আছে একটা। ফ্যান্সি সেলুন করতে চায়। মেয়েছেলের চুলও নাকি কাটাই করবে। আপনি সেলামি বাবদ আমাকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে দু-এক হাজার বেশি ফেরত পাবেন।

ছেলেটার নাম ভুজঙ্গ সরদার। বারো ক্লাস অবধি পড়েছিল। থাকে এখান থেকে ষোলো কিলোমিটার ভিতরে। নারায়ণপুরে। নারায়ণপুরে সবে ইলেকট্রিক এসেছে। জেরক্স বসাচ্ছে ভুজঙ্গ। দশ কাঠা জমি বিক্রি করেছে। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে। গরুর গাড়িতে উঠবে জেরক্স মেশিন। ভুজঙ্গর কপালে সিঁদুরের টিপ ভুজঙ্গ ভীষণ মমতায় মেশিনের গায়ে হাত বুলোচ্ছিল।

গাড়িতে উঠছে মেশিনটা। সাবধান ভাই। খুব সাবধান। মেশিনটা খুব ভালো ভুজঙ্গবাবু, কক্ষনো ট্রাবল দেয় নি। চার্জারের সুইচটা একটু জোরে টিপবেন, কেমন। পিছনে সামান্য রং চটে গেছে, যেন জল না পড়ে, এ্যাঁ?

সব সময় ধুলো মুছে দেবেন, একটু নরম কাপড়ে। প্লেটটাই আসল, যত্নে রাখবেন, এ্যাঁ, যত্নে। নখ লাগাবেন না, মেশিনটা বড় ভালো ছিল জানেন, ওর কোনো দোষ নেই...

ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ করে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রটা নিয়ে গরুর গাড়ি ছাড়ল।

দুগ্গা—দুগ্গা।

বিসর্জনের পর শূন্যবেদিতে বসানো একাকী প্রদীপের মতো ওই ঘরে বসে থাকি নিশ্চুপ। শূন্য প্লাগ পয়েন্ট। তার। টুকরো কাগজ। কালির দাগ।

মুকুলদা এল। বলল, একবার আইসো আমার কাছে। একটা দরকারি কথা আছে।

## লজ্জামুঠি

এক যে আছে মেয়ে, তার নাম হ'ল গে সুচিত্রা। সুচিত্রা তখনো হয়নিকো, এক শিবরাত্রিরে সুচিত্রার মা গঙ্গামণি রাত জেগে দেখেছিল তিনটে বায়োস্কোপ – সাগরিকা, হারানো সুর আর শিল্পী। উরিম্মা, কী বই, চোখ ছলছল, বুক ঢলঢল। শেষ রাত্রিরে বাড়ি ফিরে, পেসাদ পেয়ে চোখ দুটো একটু বুজেছে কি বোজেনি, এমন সময় বাঘছাল পরা এইয়া বড় ত্রিশূল হাতে স্বয়ং মহাদেব অশোকনগর রিফিউজি কলোনির সূর্য সেন ব্লকের গঙ্গামণির ঐ টিনের বেড়ায় ত্রিশূল ঘষছেন আর খটখটাং শব্দ করছেন। গঙ্গামণি দেখে তো থ। চোখের পলক পড়ে না, মুখের রা কাড়ে না। সাত তাড়াতাড়ি পঞ্চপ্রদীপ আর একটা ধূপকাঠি দিয়ে ভজনা করে। মহাদেব বললেন – গুড়মুড়ি খাব। গঙ্গামণি কলাইকরা বাটিভরা গুড়মুড়ি দেয়। বাবা মহাদেব ভুড়ুক ঢেকুর তুলে বললেন-খুশি হ'লাম রে খুব। কী চাস বল। বর দোবো। গঙ্গামণি ফস্ করে বলে ফেলল – সুচিত্রা সেন। যেন সুচিত্রা সেনের মতো একটা মেয়ে হয় আমার। মহাদেব মিলিয়ে গেলেন।

দশমাস দশদিন পর কোল আলো করে একটি মেয়ে এল গঙ্গামণির। শাশুড়ি বুড়ি বললে – এঃ, মাইয়া? ধাই বললে-উলু দাও। কেউ দিলে না। ধাই বললে-শাঁখ বাজাও, কেউ বাজালে না। গঙ্গামণির স্বামী বিড়িতে লম্বা টান মেরে দূরে আছাড় মেরে ছুঁড়ে ধানকলের কাজে চলে গেল। গঙ্গামণি তো কাউকেই বলেনি যে মহাদেবের বরে এই মেয়ে হয়েছে। বললে কি রক্ষা থাকত? বলতো-বেআক্কইল্যা বউ, পোলা না চাইয়া মাইয়া চাইছ?

গঙ্গামণি ওর মেয়ের নাম রাখে সুচিত্রা। দিন যায়, সুচিত্রা শশীকলার মতো দিনে দিনে বাড়ে। জন্মের সময় চুল ছিল পাতলা পাতলা, চুল আর ঘন হয় না। নাকটা ছিল বোঁচা। দিনের মধ্যে কতবার নাকের গোড়া টিপে দিত, তবু বোঁচাই রয়ে গেল। চোখ দুটো গোল গোল।

গঙ্গামণি মেয়ের খুব যত্ন করে। চুল আঁচড়ায়। উকুন বাছে, শিকনি মোছে। নিজে না খেয়ে মেয়েকে খাওয়ায়। দুপুরে লাল আইস্কিরিম কিনে দেয়। মহাদেবের বরের মেয়ে বলে কথা।

কিছুদিন পর সুচিত্রার একটা ভাই হ'ল! ধাই বলল, শাঁখ বাজাও, উলু দাও। পাড়া প্রতিবেশী শাঁখ বাজাল, উলু দিল, হুলুস্থুল কাণ্ড হ'ল। বাপ করল কি, দিনদুপুরে মাল খেল, আর কোথেকে টাকা ধার করে মাছ কিনে মাছের মুড়োয় দড়ি ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বাড়ি এল। বছর ঘুরতেই আর এক ভাই। আনন্দের আর সীমা নাই। শাশুড়িবুড়ির ফোকলা মুখ পদ্মহাসিতে ভরে গেল। বুড়ি যেদিন মরল, সবাই বলল-সুখে মরেছে।

তারপর তো পিঠাপিঠি ভাই দুটো হুটোপাটি করে বড় হয়, প্লাস্টিকের চটি পরে হাঁটি হাঁটি করে। বড় ভাইটা যখন সবে হাঁটতে শিখেছে তখন একদিন হ'ল কি, সকালের খেজুর রস বন্ধুরা মিলে বিকেলে খাবে বলে বারান্দার কোণে ফেনা-ওঠা হাঁড়িটা রেখেছিল সুচিত্রার বাপ, বড়ছেলোটা শট্ মেরে হাঁড়ি উল্টে দিয়েছিল, তাইতে বাপের বন্ধুরা ওর নাম রাখল চুনী। চুনী গোস্বামীর নাকি হেভি শট্। আর ছোটটা অটোমেটিক হয়ে গেল পান্না।

চুনী পান্না খায় আমের দু সাইড, বোন পায় আঁটিটা। কাঠাল কোয়া ভাল ভালটা ভাইরা খায়, বোন পায় দাগিটা। তিনজনকে মা একসঙ্গে খাইয়ে দিলে ডিমসিদ্ধর আধখানা চুনী, আধখানা পান্না, আর সুচিত্রার ভাতের গ্রাস একবার এ আধখানার গায়ে ছোঁয়, একবার ও আধখানার গায়ে ছোঁয়। হাবড়া হাটের লাল জামা গায়ে দু ভাই দিদির দু হাত ধরে স্কুলে যায়, বগলে লাল মলাটের বাল্যশিক্ষা, দিদির তখন কিশলয়।

ধানকল বন্ধ হ'ল, সুচিত্রার বাপ বেকার হ'ল। কত সব নতুন নিয়মের মেশিন বেরুচ্ছে, পুরনো নিয়মের মেশিনে পড়তা কম। দু দিন দ' হয়ে বাড়িতে বসে রইল সুচিত্রার বাপ, তারপর একদিন বলে বাণিজ্যে যাবে।

সুচিত্রার বাপ রোজ রোক এগারটা দশের ট্রেনে বাণিজ্যে যায়। আড়তদারের থেকে চাল নেয়, চালের বস্তা নিয়ে ট্রেনে ওঠে। পুলিশ-পেয়াদাকে ঘুস দিয়ে পার্লিকের খিস্তি খেয়ে শহরে এনে চাল বেচে। একদিন হ'ল কি, ক'জন জিন্ন পরা সওদাগর বনগাঁ বড়ার থেকে ভিনদেশি কাপড়জামা আনছিল, ওদের সঙ্গে ট্রেনে মাল রাখা নিয়ে সুচিত্রার বাপের ঝগড়া লাগল, ওরা ধাক্কা মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দিল সুচিত্রার বাপকে। ও বেচারি নুলো হয়ে ঘরে ফিরে এল।

বাপের ঐ অবস্থা দেখে চুনী পান্না বলল, মা, আমরা চায়ের দোকানে কাজ নেব। আমরা কাপ ধুতে পারি, গেলাস ধুতে পারি, তিরিশ পয়সা করে চার কাপ চায়ের দাম কষতে পারি। পাঁচ টাকার থেকে আশি পয়সা কাটিয়ে ফিরত কত বলতে পারি। ও কথা শুনে গঙ্গামণির চোখে জল এল। বলল, ও কথা বলিস নি। তোরা বই না দেখে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা কইতে পারিস, হও ধরমেতে ধীর কইতে পারিস, ম্যাস্টর তোদের কত ভালবাসে, তোরা পড়। ম্যাট্রি পাশ দে। কালোব্যাগ নিয়ে কলকাতা যাবি। তোরা পড়। রোজগার আমিই দেখব। ঠোঙা বেচব।

সুচিত্রার ইস্কুল শেষ হ'ল। ঠোঙায় হাত লাগালে বরং সংসারের লাভ। ইস্কুলের খাতগুলোর লেখাপাতায় ছটাকি ঠোঙা হ'ল, সাদা পাতা দু ভাই পেল। মায়ে-ঝিয়ে কাগজ কাটে, নুলোবাপে আঠা আঁটে, দু ভাই লিখাপড়ি করে, দু ভাই পরীক্ষা পাস দেয়, গঙ্গামণি ভাবে, আহা রে, এটু ঘি, মাছের মুড়ো দিত পারলি ছাওল দুটো ফাস্ হ'ত।

একদিন হাবড়া থেকে ঠোঙা বেচে ফিরছে গঙ্গামণি, ট্রেনের সিটে বসে অফিসার আর অফিসারনী কথা কইছে।

অফিসার। দ্যাখো দ্যাখো তিল ক্ষেত। ওগুলো তিল ফুল।

অফিসারনী। আহা চোখ জুড়িয়ে যায়। কতদিন একটু সবুজ দেখি না। একেবারেই বন্দী যদি একটা মেয়েটেয়ে পেতাম, আদর করে রাখতাম।

অফিসার। তোমার মাসিকে বলে দেখো এদিকে যদি একটা মেয়ে পাওয়া যায়...

অফিসারনী। তবে নিজের মেয়ের মতোই আদরে রাখি। মলিটা আর জলিটাকে ওর হাতে দিয়ে আমরা টোনাটুনি তাহলে একটু ঘুরে বেড়াই।

গঙ্গামণি তখন মাথার ঘোমটা টেনে বলে, আমার একটা মেয়ে আছে, বড়ো লক্ষ্মী নিবেন?

অফিসারনী অমনি বলে, হ্যা-হ্যা-হ্যা নেব, নেব...।

-ব্যাতন?



বেতনের জন্য চিন্তা নেই, আমরা দু জনে চাকরি করি। ঠিকানা দাও, ফেরার সময় দেখে যাব।

গঙ্গামণি বাড়ি ফিরে বড়ছেলেকে বলে তোর তো অঙ্কে মাথা ভাল। ক’ দেখি, ডেলি ডেলি আড়াই গুরুস হইলে মাসে কত?

-পচাত্তর।

-চাইর শনিবারের চাইর সিনেমা, উকুন বাছা, হাত-পা-ব্যথা, কাজে মন নাই, - পনের গুরুশ বাদ দে। কত থাকে?

-ষাইট।

-ছয় টাকা গুরুশ হইলে ষাইট গুরুশ কত?

-তিনশ ষাইট।

-গুরুশ প্রতি কাগজ আঠা চাইর টাকা খরচ। ষাইট গুরুশে কত খরচ?

-দুইশ চল্লিশ।

-তিনশ ষাইটের থন দুইশ চল্লিশ বাদ দিলে কত হয়?

-একশ কুড়ি গ মা।

গঙ্গামণি হিসেব করে পায় সুচিত্রা মাসে একশ কুড়ি টাকার আয় দেয় এই সংসারে। খোরাকি আছে। খোরাকি ধরলে কিছুই থাকে না।

পরদিন বিকেল বেলা অফিসার আর অফিসারনী হাজির। বলে-কৈ গো, মেয়েটা দ্যাখাও।

গঙ্গামণি ঠোট কামড়াল। সত্যি সত্যিই চলে এল যে। গঙ্গামণি আসন পেতে বসতে দিল, নেবু নিংড়ে সরবৎ দিল। অফিসারনী সুচিত্রাকে দেখল। শুধোল-নাম কী? ‘সুচিত্রা’ নাম শুনে অফিসারনী হেসেই অস্থির। বলে সুচিত্রা ডাকতে পারব না বাপু। শুধু চিত্রা। বলল-কাজ কিছুই নেই। সংসার খুব ছোট। টুকটাক ফাইফরমাস খাটবে, চিত্রমালা-চিত্রহার দেখবে, মেয়ের মতো থাকবে।

বাপ মায়ে চোখাচোখি। মেয়ের মাথা নিচু, মুখে রা নেই। গঙ্গামণি বলে -দেড়শো টাকা দিবেন, মনি অর্ডারে পাঠাবেন।

দেড়শো বড়ো বেশি হয়, একশো কুড়ি।

বাপে মায়ে চোখাচোখি। মেয়ের মাথা নিচু, মুখে রা নেই। আইচ্ছা, একশো তিরিশ।

চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে চিত্রা চলল কলকাতা। দু ভাইকে বলল-ভাল করে পড়িস, সব অঙ্ক রাইট করিস, সব বানান ঠিক করিস্। ফাস্ হলে চাকরানী দিদিকে চিঠিতে লিখিস। খাতা লাগলে কাগজ কিনিস, টিপিন বেলায় নজেন খাস্।

ঝাঁ চকচক ঘরের মেঝে, হাঁটতে গেলে পিছলে যায়। সাঁই সাঁই সাঁই গাড়ি ছুটছে, জানলা দিয়ে দেখা যায়। গ্যাসের উনুন, ঠাণ্ডা আলমারি, বাড়িতে কর্তা-গিন্নি আর জলি মলি। জলি হ’ল তোতাটা, মলি হ’ল পুঁটিটা। কর্তা-গিন্নি অফিস যায়, চিত্রা তোতাকে ছোলা দেয়, কাচালক্ষা খাওয়ায়, খাঁচা পরিষ্কার করে।

তোতা বলে, তুমি আমার সই।

চিত্রা বলে, আচ্ছা।

তোতা বলে, সই তোমার দেশ কোথায় ছিল?

হাবড়া অশোকনগর। তোমার?

আমার? ভুলে গেছি গো, শুধু একটা নীল পাহাড়, সবুজ ঝিল আর লাল বটফলের গাছ মনে পড়ে।

সুচিত্রা বাবুদের বিছানার চাদর টানটান করে, বই আলমারির ধুলো ঝাড়ে, ঠাণ্ডা আলমারি সাফসুফ করে, কুটনোটা কুটে দেয়, বাটনাটা বেটে দেয়। কত্তা গিনি দুজনাই খুব ভালবাসে। ফুটপাতের ফ্রক দিল, লাইফবয় সাবান দিল, শোয়ার জন্য শতরঞ্জি দিল। বলল, আমাদের ছেলেমেয়ে হয়নিকো, তুই আমাদের ছেলে, তুই আমাদের মেয়ে।

গিনিমা একদিন বললেন, মা চিত্রা, তোর তো এখানে কাজ অনেক কম, কাজই নেই, দ্যাক না, পাশের বাড়ির রেবতীর কত কাজ, সংসারে সাতজনের কাজ, বলি কি ঠিকে ঝিটাকে ছাড়িয়ে দি। কটা আর বাসন, কটা আর ঘর। তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব।

চিত্রা বলল, বেশ তো।

ঠিকি ঝি পেত পঞ্চাশ। চিত্রার কুড়ি টাকা বাড়ল। বাড়িতে চিঠি লিখল-মাগো, কুড়ি টাকা বেশি দিব চুনী পান্না যেন ফল খায়, বাবা যেন দুধ খায়।

তোতা বলল, কি গো সই, কেমন আছ?

চিত্রা বলল, সুখে আছি।

তুমি?

তোতা বলল, সুখে আছি। বড় বড় লাল লাল লঙ্কা খাচ্ছি!

চিত্রা বলল, তোমার খাঁচাটা খুব সুন্দর গো।

তোতা বলল, হিংসে কোরো না সই, তোমারটা বুঝি খারাপ?

সূর্য ডোবে রাত পোহায়। দিন যায় মাস যায়। গিনিমা বলেছেন ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দেবে। গিনিমা বলেছেন, কী সুন্দর হয়ে গেছিস রে। কলের জলে চান করে তোর রঙ খুলে গেছে।

পুকুরে নায় পাপী তাপী গঙ্গা নায় চোর

কলের জলে যে চান করে তার বহু পুণ্যের জোর।

দেশে যেবার গেল বাবা বলল, কী সুন্দর হয়েছিস তুই। বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে এল চিত্রা।

তোতা শুধোলো, কীগো সই, মুখ শুকনো যে?

চিত্রা বলল, বাপ মরেছে।

তোতা চুকচুক শব্দ করল – আহা রে! কেমন করে গো?

রক্তবমি। আমার কোলে মাথা রেখে বাপ আমার সগুণে গেলেন।

তোমার মা বুঝি বুড়ো বয়সে সুখে থাকার লোভে সব যত্ন ছেলেদের করেছে, বুড়োটা অযত্নে মরেছে?

ও কথা বোল না সই। শাখা ভেঙে কোরা কাপড়ে মার কী কান্না।

কাঁদবেই তো। সোয়ামি মরলে স্তিরি তো আধখানা।

সে কথাই তো মা কইছিল। মা কাগজ কাটতো বাবা আঠা সাঁটতো। এখন মা আধখানা। কী করে সংসার চলবে? একা একা ঠোঙা হয়? কী করে চুনী-পান্না দেবে ম্যাট্রি পাশ?

তোতা বলল, আহা গো, তোমার ছোট কাঁধে কত বোঝা।

সুচিত্রা একদিন গিন্নিমাকে বলল, মাগো, হারু ধোপা আপনাদের চাদর কাচে, কাপড় কাচে, কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা খরচ হয়। ওসব বরং আমিই কাচি। ঐ পয়সাটা আমাকে দিন। মা বললেন, বেশ তো, কিন্তু তুই কি অমন পরিষ্কার করে কাচতে পারবি? ও বলল, ঠিক পারব। মা বললেন-দেখি কেমন পারিস; চিত্রা মাকে লিখল-কুরি টাকা আরও বেশি দিব মাগো।

ছেলেটির নাম রতনকুমার। ফোলা ফোলা চুল, চোখে নীল রঙের চশমা, জেল্লামারা লাল গেঞ্জি। মাঝে মাঝে আসে ক’দিন ধরে। বাড়িতে ঢোকান আগে সিগারেটটা ফেলে দেয়। সন্কেবেলায় বাজারটা করে দেয়, দোকান থেকে ওষুধটা এনে দেয়। কিছুক্ষণ টিভি দেখে। সুচিত্রা চা দেয়। আঙ্গুলে আঙুল লাগে যেন বিরবিরানি, শিরিষ পাতার শিরশিরানি চিত্রার গায়ে।

মা বলেছে রতন খুব ভাল ছেলে। বাবুর অফিসের বেয়ারা। পারমেন হলে সুচিত্রাকে ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে।

রতনকুমার রতনকুমার ফুলেল জাদুমণি

অনেক গুণের গুণী

ফণীর মাথার মণি।

রতনকুমার পেরায় পেরায় বাবুকে বলে, স্যার কবে পারমেন হব? বাবু বলেন, দাঁড়া দাঁড়া, সবে তো মাসে ছদিনের ক্যাজুয়ালে ঢুকলি। এখন দু’চার বছর ডেইলি রেটে কর...।

চিত্রা, মানে সুচিত্রা সন্কে হলে বারান্দার ধারে ঘুরঘুর করে। রতনকুমার না এলে ফ্যানের ঘোরায়ে মন খারাপের হাওয়া গুমরে মরে।

হ্যাঁরে তোতা, ও কবে পারমেন হবে?

তোতা খাঁচার ফাঁক দিয়ে আকাশের ফালি দেখল। চোখ পিট পিট করে বলল, জল এগোয় না, তৃষণ এগোয়।

বুঝলাম না তোতা, বুঝিয়ে বল!

রাজহংসের চরণ দেখে বকের নেঙা পেঙা।

একদিন এক গরমের দিনের রোববার। গিন্নিমা মেঝেতে শোবেন। খাটের পিছনটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ওখানে আঁচল বিছাতে গিয়ে গিন্নিমা পেলেন পোড়া সিগারেটের টুকরো। কপাল কুঁচকে উঠল গিন্নিমার। খুঁজতে লাগলেন আরও কিছু পান কিনা। পেলেন কি যেন। চিত্রাকে ডাকলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, দ্যাক ঘরের কোনায় সিগারেট পোড়া। ও তো ছোয় না। ওঁর বন্ধুরা এলে বাইরের ঘরে বসে।

সুচিত্রা দু হাতে দরজার পর্দা চেপে ধরে।

এবার গিন্নিমার গলা চড়ে-সিগারেট কি করে এল?

জানি না মা।

সুচিত্রার চোখ ঘরের লাল মেঝের মাঝখানের কালো পদ্রটোর দিকে। স্থির।

মা ওর চোখ থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলোচ্ছেন। ঐ দৃষ্টির স্পর্শে সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে থাকে সুচিত্রার। মার মুখ থেকে একটা আওয়াজ বের হল-হুম্।

মা নিয়ে এলেন লাল বাস্ক। বাস্ক খুললে কৌটোর মতো কি যেন। লম্বা তার জোড়া। মেশিন। মা বললেন, মিস্ত্রি। মশলা বাটা হবে, ঘোল হবে, শরবত হবে, চাটনি হবে। ছ্যাঁত করে উঠল সুচিত্রার অন্তর। ভিতরের কাগজের ইংরিজি কথা পড়ছিলেন মা। সুচিত্রা বলল, মেশিনেই সব করবে? তাহলে আমি?

তোর কী ক্ষতি? তোর তো আরও ভাল হল। তোর বন্ধু হল, কাজের হেলপ হল। মেশিনটাকে টেবিলে রাখলেন মা, গর্তের মধ্যে দই দিলেন, জল দিলেন, চিনি দিলেন, সুইচ টিপলেন-ঘড় ঘড় শব্দ। চোখের নিমেষেই ফেনা ফেনা ফেনা। এ-সব আমায় দেখাবি না ঢং-এর মেশিন, ঢং রাখ তুই, খিঙ্গিপনা দেখাবি না।

মা বললেন, বেশ গুণের মেশিন। তোকেও দেখিয়ে দেব, শিখিয়ে দেব, কিন্তু আমরা না বললে চালাবি না।

মা অন্য কাজে গেলে একা একা মেশিনটাকে দ্যাখে সুচিত্রা। সুচিত্রা জিভ ভ্যাঙালো। মেশিনটাও জিভ ভ্যাঙালো। সুচিত্রা ঝাঁঝ গলায় বলল, ক্যানো এসেছিস? মেশিন বলল, ইঃ! তোর তাতে কী? সুচিত্রা বলল, তুই আমার সই না শত্রুর? মেশিন বলল, যা ভাববি তাই। সুচিত্রা বলল, তুই তবে আমার সই, আমার মিতা। আয় আমরা ফুল পাতাই। পদ্ম হবি, পদ্ম?

বাবু এলে দইয়ের ঘোল খান গরমের দিনে। চামচে নেড়ে সুচিত্রাই করত এতকাল। আজ মা করে দিলেন। মেশিনে। রান্নাঘর থেকে সুচিত্রা বাবুর 'বাঃ' শুনতে পেল। আর 'বাঃ' শব্দটা সুচিত্রার চোখের কোনায় জলের ফোঁটা হয়ে দুলতে লাগল। অমনি মেশিনটা খল্ খল্ হাসতে লাগল। সুচিত্রা বলল-এমন হিংসে ভাল নয় পদ্ম, মরণ দেখে হাসি ভাল নয়। মেশিনটা ঢঙির মতো হাসল তবু। এমন সময় রতনকুমারের গলা শুনতে পেল সুচিত্রা।

রতন বলছে, ধোপাবাড়ি যেতে হবে নাকি?

মা বললেন, না।

বাজার?

না।

চানাচুর?

না।

ওষুধ?

না।

চিত্রমালা শুরু হয়ে গেছে। সুচিত্রা ও ঘরে যায় না। যেতে পারে না। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেশিনটার ধারালো রূপোলি দাঁত আঙুলে ঘোরায়।

একদিন এক রবিবারে প্রেশার কুকার ফোঁসফোসাঁছে, ওঘরে কস্তা-গিনির কথা হচ্ছে। গিনি বলেন, মানুষের চেয়ে মেশিন ভাল।

কন্তা বলেন, ওটা কবে আনব বল।

গিল্মি বলেন, ম্যাচিওর করবে এন.এস.সি.।

কন্তা বলেন, তারপরেতেই নি আসছি।

গিল্মি বলেন, রতন যেন আর না আসে।

কন্তা বলেন, দেখতে পাবে আসছে মাসে।

অমনি হিস্ হিস্ করে তুমুল শব্দে প্রেশার কুকার ধোঁয়া ছাড়ল, আর টপ্‌টপ্‌ করে দু ফোঁটা জল সুচিত্রার গালে কেন গড়াল সুচিত্রা জানে না।

সকালবেলা সুচিত্রা আবার দেখল মেশিনের কেরামতি। মুহূর্তে হয়ে গেল পুদিনার চাটনি, পোস্তুবাটা। কন্তা বললেন, কী মোলায়েম। মেশিনটা খিল-খিল হেসে উঠল। গিল্মি বলেন, তোর তো ভালই হল বল, বাটতে হল না। মেশিনটা আরও জোরে হেসে উঠল। গিল্মিমা অফিস যাবার সময় বললেন, মেশিনটা মুছেটুছে রেখে দিস।

জল দিয়ে ঝাকিয়ে জারটা পরিষ্কার করে সুচিত্রা। শুকনো কাপড়ে মোছে খুব সাবধানে, যেন নখের দাগ না লাগে। কী চকচকে শরীরটা ওর। বড়লোকের মেয়ের মতো গা। মোলায়েম করে মমতায় মমতায় মোছে।

তোতা বলে, কীগো মিতে? তোমায় কে বলেছে সোহাগ দিতে?

সুচিত্রা বলে, আমার মন বলেছে।

ভাল ভাবলেই ভাল

কালো ভাবলেই কালো

মনের কাছে সব রয়েছে।

তাই নারে পদ্ম?

মিস্ত্রি মেশিন উত্তর দেয় না।

সুচিত্রা জারের উপরে মুখ নেয়। শ্বাস নেয়। হাঙ্কা পুদিনাপাতার ঘ্রাণ।

সুচিত্রা বলে, শোন সই, তোর মনের কথা কই। রতনের কথা বলবে বলবে ভাবে, কিন্তু বলে না। বলে-পদ্ম সই, পদ্ম সই, তুই আমাকে ভালবাসিস? তুই আমার কাজ কমাবি?

মিস্ত্রি মেশিন কিছু বলে না।

আমার চেয়ে তোর কাজ ভাল, আমার নিন্দে, তোর প্রশংসা, তবু আমি তোকে হিংসে করি না। করতে নেই।

একবার একটু ঘোর তো দেখি, ঘোর। দেখি তোর ঢং। সোহাগী। সোহাগ চাঁদবদনী ধনি। সুচিত্রা প্লাগ গুঁজে দেয়। সুইচ অন করে। ঘোরে না। রাগ করলি পদ্ম সই? মেশিন ঘোরে না। আলোর সুইচ টিপে দেখে জ্বলে না। ওঃ তবে লোডশেডিং। সুচিত্রা মেশিনের গায়ে আঁকিবুকি কাটে। লেখা রতন! রতন! ঐ আঙুলটা দিয়েই মেশিনের রূপোলি দাঁতগুলি ঘোরায়। কী ধার।

রতন! রতন!

পদ্মরে পদ্ম। পদ্ম সই! কোন সুখে তুই ফুটিসরে পদ্ম, তুই না সত্যের ফুল!

চলকে উঠল রক্ত। রক্তে মাখামাখি। চিৎকার করে উঠল সুচিত্রা। তুমুল চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ ঘুরছে। মেশিন ঘুরছে। ভীষণ ঘুরছে। আঙুলের টুকরোটা লাফাচ্ছে... লাফাচ্ছে, ছিন্ন-ভিন্ন। ক্রমশ রক্ত-কাদা। জারের গায়ে লাল চন্দনের মতো লেগে রয়েছে রক্ত-কাদা। ডগাহীন হাতটা ঝাকাচ্ছে সুচিত্রা, দেওয়ালে ফুটে উঠছে রং নকশা, সুচিত্রা কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে। বিড়ালটা একটানা ডেকে চলেছে--মিউ-মিউ মিউ।

চাই কুড়কুড় ঢাকের বাদ্যি, মাইকে গান। রদুরে-রদুরে নাচে জরির ঝালর। পুজো এল।

‘অন্য বাড়ির হলে সেদিনই বিদেয় করে দিত, আমি বলেই পুজোয় আবার শাড়ি দিলাম।’ মা বলেছিলেন। ছাপা শাড়িটার নতুন গন্ধ। ব্যান্ডেজ বাঁধা শাড়ি ঘুরোতে কষ্ট। ব্যান্ডেজের ওষুধের গন্ধ নতুন শাড়ির গন্ধে মেশে। গিন্নিমার সঙ্গে একদিন বারোয়ারি পুজো দেখতে যায়। কিছু ভাল লাগে না। এত ভিড়েও মানুষ নাই, এত আলোয় অন্ধকার, এত শব্দেও নিবুম। রতন আর আসে না।

দশমীর পরদিন হাসপাতালে যাবার তারিখ ছিল। পরতে পরতে খুলল ব্যান্ডেজ। আঙুলটার নখ নেই। নখের জায়গায় একটা দলামোচড়া এবড়ো-খেবড়ো মাংসপুঁটলি ব্যাঙের বাচ্চার মতো বসে আছে।

বিকেলে বাবু দেখতে চাইলে সুচিত্রা ওর লজ্জামুঠি খোলে না। একা-একা খুলল, তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদল। সেই দিনই সন্দের সময় লোকেরা এসে কি একটা মেশিন দিয়ে গেল। ওরা বোঝাচ্ছিল, বলছিল দু মিনিটেই একেবারে পরিষ্কার, সাফসুফ। সুচিত্রা বুঝল আবার কিছু একটা মেশিন। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। রাত্রে কত্তা- গিন্নির কথা হল-মেশিন ভাল না মানুষ ভাল, মানুষ ভাল না মেশিন ভাল, মেশিন-মানুষ, মানুষ-মেশিন।

ক’দিন পরে রবিবার। মা নিজে হাতে ছোলা দিলেন পাখিকে। বাবু চা খাচ্ছিলেন। মা বললেন, কৈ গো, একবারটি এসো, মলিকে ছেড়ে দিচ্ছি।

তারপর সুচিত্রাকেও বলল-মা, বেড়ালটাকে বিদেয় দেব, তাকেও আর কাজ করতে হবে না এখানে। তোকেও ছেড়ে দেব। আমরা ঝাড়া হাত-পা হব।

ছিরিক ছিরিক রক্ত ছলকায়। সে কী কথা!

সুচিত্রার গা টলমল, চোখ ছলছল।

যারে তোতা উড়ে যা...

খাঁচার গায়ে চুমো দিয়ে দরজা খুলে দিলেন মা। তোতা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আবার খাঁচায় ঢুকে যায়।

বাবু তাকান মায়ের দিকে, মা তাকান বাবুর দিকে। তোতাটা কারুর দিকে তাকায় না, খাঁচায় ঢুকে চোখ বুজে বসে থাকে।

সকালের জলখাবারে একটা বড় রসগোল্লা পেল সুচিত্রা। পাওনা টাকা বুঝে পেল। মা বলেছে নিজে গিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে।

সুচিত্রা একা-একা এঘর-ওঘর করে। লাল সিমেন্টের কালো আলপনার গায়ে হাত বুলায় বাথরুমের কলের চাবি ঘুরায়। ছর ছর জলের শব্দ শোনে।

তোতার কাছে যায়। তোতা তুই বড্ড বোকা। ছাড়া পেলি, গেলি না। তোতা বলে - খাঁচার বাইরে আমার কিছু নাই। ডানায় আমার শক্তি নাই। কেমন করে ডানা নাড়ে, কেমন করে আকাশে ওড়ে-ভুলে

গেছি। আমার অচিন দেশের অশথ ছায়ায় তুই যা।

সুচিত্রার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। রতন। রতন।

রতন এল। কতদিন পর। ঢাই কুড়কুড় বাদ্যি বাজে। রতন বলে, বিজয়ার পোনাটো করতে এলাম। মা প্লেটে করে মিষ্টি দিল। সুচিত্রা এক গ্লাস জল নিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। সুচিত্রার কাটা মাংস পুঁটুলি দেখে আঁতকে উঠল রতন। অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ঐ গেলাসে জল খেল না। বোতল গড়িয়ে জল খেল। সুচিত্রার দিকে একটিবারও চাইল না। একটি কথাও কইল না। চলে যাওয়ার চটির শব্দ ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্।

বালতি ব্যাগে শাড়িকাপড় গুছিয়ে চোখ মোছা ভেজা রুমালে টাকা কটা বেঁধে সুচিত্রা তৈরি। বাবুকে প্রণাম করল। মা ঘাড়ে পাউডার ঢালছে।

লাল সিমেন্টের কালো আল্লনাকে বলল-যাই। বারান্দার রেলিং, জলের কল, বেলুনচাকি, যাই। মিক্সি মেশিন, নতুন মেশিন, তোরা সুখে থাক, আমি যাই। যাইরে তোতা পাখি। তুই রইলি ডালে, আমি রইলাম জলে, দুইজনে দ্যাখা হবে মরণের কালে।

সন্ধে হয় হয়। কাকেরা ফিরছে, বকেরা ফিরছে। ধোঁয়ার গন্ধ, শাঁখের শব্দ – এ সময় বাড়ি ঢুকল সুচিত্রা। ঘরে গান হচ্ছে টেপ-রেকর্ডারে। ডিস্কো ড্যান্সার। ঘরে মা আর ছোট ভাই। মা ঠোঙা করছে। কী খুশি। মা বললেন, তোর কথাই ভাবছিলাম। কাল ভাইফোঁটা। গতবারেও আসিসনি। কদিন থাকবি?

ওসব কিছু বলে না সুচিত্রা। মুঠোর মধ্যে ভরে রাখে নষ্ট আঙুল। বলে, ভাইরা লেখাপড়ি করছে তো?

পান্নাটা পড়ছে যা হোক, চুনীটা পড়ে না আর। রোজগার করে। বর্ডারে যায়। এই তো টেপ-রেকর্ড কিনেছে। ঐ যে, বেড়া লাগিয়েছে। পড়ালেখায় কি চাকরি হয়? কত এম.এ. বি.এ. ঘুরছে।

চুনী আসে রাত করে। ঠোঁটের উপর নতুন গোঁফের রেখা। চুল ফোলা ফোলা। গায়ে জেল্লামারা লাল গেঞ্জি।

একসঙ্গে ভায়ে বোনে খেতে দেয় মা। ও খায় না। লজ্জামুঠি খুলতে ওর ভয়। মেয়ে সন্তানের খুঁত হয়ে থাকার লজ্জা। লজ্জা কতক্ষণ আর গোপনে থাকে? রাত্রে প্রতিপদের চাঁদ ডুবে গেলে নক্ষত্র ছড়ানো আকাশের তলায় পুকুরঘাটের স্নান আলোয় মায়ে-ঝিয়ে কতক্ষণ কাঁদল। দিঘির জলে শালুক ফুল, শালুক ফুলে অন্ধকার। শালুক রে শালুক, এই নারীজন্ম তুই নে, তোর জন্ম আমায় দে।

পরদিন সকালে দুর্বা তুলে ধান সাজিয়ে চন্দন বেটে রেকাব সাজিয়েছে মা। চুনী পান্না দু ভাই বসেছে আসন পিঁড়ি। ওদের বড় তাড়াহুড়া। গ্যাঁড়া বাবলু স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। চুনীর সঙ্গে পান্নাও যাবে আজ কাজ শিখতে। ভায়ের কপালে ফোঁটায় যম দুয়ারে কাঁটা দিল সুচিত্রা। তারপর এগিয়ে দিল মিষ্টির থালা। চোঁচিয়ে উঠল চুনী-দিদি, তোর আঙুল? সুচিত্রা আঁচল চাপা দেয় মুখে। মুখ নিচু করে। মা তখন অল্প করে বলেছিল আঙুল নষ্ট হবার গল্প।

ক্রমশ কপাল কুঁচকে উঠছিল চুনীর, মুখে ফুটছিল বিরক্তি রেখা। মায়ের সব কথা শেষ হবার আগেই হাতের খাবার দূরে ঠেলে দিল চুনী, কী ফ্যাসাদ বাধালি, অ্যাঁ? কী রকম বেঁকে রয়েছে ঠোঁট।

সুচিত্রারও নিচু মুখটা, ভারি মুখটা, ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে জেগে ওঠে, যেন জলের অতল থেকে মাথা তুলল মনসা-বাহন। তাকাল সোজা। নির্বাক। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কত কী বলে। কোঁচকায় কপাল, আর গোটা নারী

জন্মটাকে জ্বলন্ত অঙ্গার করে ছুঁড়ে মারে চোখের দৃষ্টিতে। থপ্ থপ্ পায়ে ঘর থেকে বার হয়, মেদিনী কেঁপে ওঠে, স্বর্গসভায় বেহুলার পদ-নুপুরের আর্ত-নিব্বন চরাচরে বাজে। পৃথিবী টলোমলো, দিঘির জলে টলোমলো শালুক ফুল। গা গুলিয়ে ওঠে সুচিত্রার। সত্যি সত্যি গা গুলোয়। পুকুর পাড়ে বসে পড়ে। বসে পড়ে একটা ফ্যাসাদ হয়ে যাওয়া গোটা নারী-জন্ম। সারা শরীর থেকে কী যেন দলা পাকিয়ে উঠতে চায়। হড়-হড় করে বমি করে ফেলে। ঐ টক জল, ঐ ক্লদ, শালুক পুকুরের দিকে বহে যায়। ঐ উদগার কেমন যেন অর্থবহ হয়ে ওঠে। ঐ উদ্গীরণ, ঐ লাভাস্রোত, ধোঁয়া ওঠা পৃথিবীর মাটিতে বহে যায়। মাটি ফেটে যায়, দু ভাগ হয়। মা ধরিত্রী বলে, আয়, কোলে আয়, শান্তি নে। সুচিত্রা তার লজ্জামুঠি খুলে ধরে। ময়ূর পাখনার মতো খুলে যায় হাত। বাতাস নাড়িয়ে তার তুমুল নিষেধ – যাব না, যাব না। কালো দিঘির জল বলে আয়, আয়, শান্তি নে। হাতের নিষেধে ওর যাব না যাব না।

লজ্জামুঠি খুলে গেছে। মাটির গায়ে ফুটে উঠছে চারটি নখের কঠিন আঁচড় চিহ্ন। আঁচড়ের সম্ভ্রাস। মেয়েলি ভাষার ঐ স্ফোভ চিত্রলিপি মাটিতেই পড়ে রইল। রতন জানল না, চুনী-পান্না না, জানল না বাপ পিতামহ পূর্বপুরুষ।



## মানুষ কিংবা কোলবালিশ

ক’ দিন আগেই রাস্তায় পিচ দিয়েছে। সাইকেল ছুটিয়ে বড় সুখ, তারাদাস তাই পোঁ-পোঁ ছুটছিল। মোটর গাড়ি ওকে ওভারটেক করে সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে বের হয়ে এল একজন রোগাপানা, পাকা চুল, ফর্সা মানুষ। বলল, শোন তারাদাস, কথা আছে। লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি তারাদাস।

তারাদাস বলল, কী কথা?

লোকটা বলল, তুমি উড়বে?

‘এ্যাঁ?’

বলছি, ‘তুমি উড়বে?’

‘মাইরি আর কী! – মানুষ কি উড়তে পারে?’

‘মানুষ পারে না। এতদিন পারেনি। এবার পারবে।’

‘ইঃ।’

‘শোন তারাদাস। তোমায় ওড়া শেখাব।’

‘ও’। বুঝে গেল তারাদাস। পাগল-ফাগল হবে। ও প্যাডেলে চাপ মারে।

লোকটা আবার বলে, ‘যেও না, কথা আছে।’

তারাদাস বলে, ‘এখন আমার কথা শুনবার সময় নেই, আমার এখন দ্বারকপাটি যেতে হবে।’

‘দ্বারকপাটি কার বাড়ি?’

‘ভোলা ঘোষের বাড়ি। ভোলা ঘোষকে চেনেন? বাড়িতে ডেয়ারি বানিয়েছে। জার্সি গোরু। জেনারেটর আছে ঘরে। জেনারেটরে টি.ভি. চালায়, ভি.ডি.ও. চালায়...’

‘আর এখন তুমি ওর জন্য ভি.ডি.ও. ক্যাসেট নিয়ে যাচ্ছ,- কেমন না?’

‘হ্যাঁ। শোলে, ডন, আর...ইয়ে।’

‘বুঝেচি। বলে যাও।’

‘ওটা বেশি রাতে চলবে। ভোলা ঘোষের শালা এসেছে বাড়িতে।’

‘নাও তারাদাস রেডি হও। ওড়া শেখাব। তোমার আর কষ্ট হবে না। এই চেন খুলে গেল, এই টায়ার পাংচার-টিউব লিক্ এসব হ্যাপা আর পোহাতে হবে না তোমার। তুমি আকাশে উড়ে...’ তারাদাস এখন আকাশের দিকে তাকায়। দু’ফালি মেঘ ভাসছে। দুটো চিল উড়ছে।

গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ার থেকে বুড়োটা কী একটা বের করে বলল, ‘এই দেখ ডানা। লাল ডানা’। খুলে ধরল বুড়োটা। রূপকথার বইয়ের ছবিতে পরিদের যেরকম ডানা হয়, ঠিক সে-রকম। লোকটা যাদুকরের মতো হাসছে।

‘এটা তোমার পিঠে বেঁধে দেব তারাদাস।’

এঃ। মাইরি আর কী। আমাকে উড়িয়ে দিয়ে সরে পড়ো আর আমি পড়ে মরি আর কি। তারাদাস এবার বুদ্ধি করে বলে, ‘আগে আপনি উড়ে দেখান তো দেখি কি রকম উড়তে পারেন তারপর নয় আমি উড়ছি।’

‘আমার যে হার্টের দোষ, আমি উপরে উঠতে পারি না। তবে আমি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। শূন্য বাঁদর পাঠিয়েছি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।’ এই বলে ক্যারিয়ার থেকে বার করে আনল একটা খাঁচা। শূন্য খাঁচা। ‘এই খাঁচাতেই বাঁদরটা ছিল, সেদিন পালিয়েছে।’ বুড়োটা এরপর বার করে আনল একটা কোলবালিশ। রেশমী কাপড়ে মোড়া, জরির ঝালর ঝুলছে।

বলল, ‘কোলবালিশটাকে মনে করো একটা মানুষ। মানুষটা শুয়ে আছে। এইবার দ্যাখো এই মানুষটার পিঠে এই ডানাজোড়াটা বেঁধে দিলুম।’

‘বাঃ কী সুন্দর কাচ বসানো ডানা।’ তারাদাস দেখল কোলবালিশটার পিঠে ডানাটা বেঁধে দিতেই কোলবালিশটা প্রজাপতি হয়ে গেল।

‘এগুলো কাচ নয় খোকা, এগুলোকে বলে ফোটো ইলেকট্রিক সেল। এতে সূর্যের আলো পড়লে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, সেই বিদ্যুতেই এই ডানা নড়ে। পেট্রোল-ব্যাটারি কিসসু লাগে না। দিনের আলোয় সারাদিন চিলের মতো আরামসে ওড়ে, কোনো অসুবিধা নেই। তবে রাতে বেশিক্ষণ ওড়া যাবে না। সোলার এনার্জি তো, সারাদিন ডানায় রোদ খাইয়ে তবে রাতেও কিছুক্ষণ ওড়া যায়, তারপর আস্তে আস্তে এনার্জি ফুরিয়ে যায়। “ডানায় রোদের গন্ধ মুছে ফেলে চিল” আছে না-জীবনানন্দের কবিতায়? তুমি তো আবার পড়নি এইসব, ঐ রকম ধারা। বুঝলে না?’ কিছুই বুঝল না তারাদাস। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

এবার দ্যাখো, খাঁচাটাকে ঝুলিয়ে দিলাম। এই যে মানুষটা শুয়ে আছে, এর পেটে বেল্ট বেঁধে বাঁদরের খাঁচাটা ঝোলালাম। চাঁদে যাবার আগে কুকুর, বাঁদর এদের পাঠিয়ে ছিল না মানুষ?—তারপর তো মানুষ বিশ্বাস করে রকেটে উঠল।—তা তুমিও তো মানুষ, তাই তোমার বিশ্বাস তৈরির জন্য বাঁদর পাঠাচ্ছি। যদিও বাদর পালিয়ে গেছে, খাঁচাটাই পাঠাচ্ছি তাই।

‘এবার দ্যাখো মানুষটার মানে কোলবালিশটার বেল্টের এই বোতামটা টিপলাম। সবুজ আলোটা জ্বলল। মানে ফুল এনার্জি। এবার সুইচ অন করলেই ডানা নড়বে। দ্যাখো তারাদাস এখানে কী করছি। এক হাজার ফিটের বোতামটা টিপে দিলাম।—কেন বলো তো? কারণ এই রেশমি জামা পরা মানুষটা তো আসলে কোলবালিশ বোধ বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই। কখন থামতে হবে জানে না। কখন বাঁয়ে ঘুরবে, কখন ডাইনে ঘুরবে জানে না। এইজন্য এক হাজার ফুটের বোতামটা টিপে দিলাম। এক হাজার ফিট উঠেই আবার নেমে আসবে। আমি আমার ইচ্ছেমতো ওকে বাঁয়ে ঘোরাতে পারি, ডাইনে ঘোরাতে পারি, ওঠাতে পারি, নামাতে পারি, আমার ইচ্ছেমতো। পুরো আমার ইচ্ছেমতো।’

বোতাম টিপল লোকটা, আর কোলবালিশটার পিঠে ডানা নড়তে লাগল। কোলবালিশটা একটা প্রজাপতি। উড়ছে। চাকতি বসানো সুন্দর ডানায় উড়ছে। শূন্য খাঁচাটা অবাধে উঠে যাচ্ছে আকাশে। তারাদাস ঘাড় উঁচু করে কোলবালিশটা দেখে। আহা। ডানা নড়ছে। প্রজাপতি। বাতাসে একটা হাল্কা গোঁ গোঁ শব্দ। তারাদাস ভীষণ ড্যাভড্যাভ করে তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই গোঁভা খেয়ে কোলবালিশ – পাখিটা নামতে থাকে। লোকটা বলে, দেখলে, এবার কেমন নেমে যাচ্ছে? যা বলব, ও তাই করবে।’ কোলবালিশটা নাটিতে নেমে

গেলে বাঁদরের খাঁচাটা ভুঁয়ে এলিয়ে পড়ে। কোলবালিশটার দিকে তাকিয়ে বুড়ো লোকটা বলে, ‘এভ্রিথিং ওকে?’ কোলবালিশের জরির ঝালর বাতাসে নড়ে।

‘তারাদাস, এবার তুমি।’

তারাদাস মাথা চুলকোলো। বলল, ‘না। আমি পারব না।’

‘বোকা ছেলে। পারব না আবার কী? সুইচটা অন করলেই তো উড়বে, আর সামনের হাতের কাছেই এটা স্টিয়ারিং। ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে, নিচে, যেদিকে সরাবে সেদিকেই যাবে। কোলবালিশটা স্টিয়ারিং জানে না, তাই উঠেছে আর নেমেছে। কোলবালিশটার বিবেচনা নেই তাই আমি যা হুকুম করেছি ও তাই করেছে। নাও, কাছে এসো, ডানা বেঁধে দি।’

‘তা আমাকেই ধরলেন কেন? আমার ভান্নাগে না।’

‘ভান্নাগে না? তুমি বলনি তোমার নিজের মনে মনে-যখন ছ’মাইল আটমাইল দূরে দূরে ভাঙা সাইকেল চালিয়ে ক্যাসেট সাপ্লাই করতে যাও বা ফেরত আনতে যাও,- বলনি হে ভগবান আমি যদি পাখি হতাম?’

‘সে তো কত লোকেই বলে।’

‘কিন্তু সবাই তো আর তোমার মতন নয়। তুমি তোমার মাতামহীকে অতিশয় ভালোবাস। তিনি যে উপদেশ দেন তুমি তাহা পালন কর। তুমি মিথ্যা কথা কহ না। অন্যায় কর্ম কর না। যদি দৈবাৎ কর, অনুতপ্ত হও। তুমি কটুবাক্য, কুবাক্য কহ না। পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, সেই হেতু পরের দ্রব্য লও না। আলস্যে কাল কাটাও না। ভিডিও. ভাণ্ডারের মালিক নারায়ণবাবু যাহা আদেশ দেন তাহা প্রফুল্ল বদনে সত্বর পালন কর। ব্লু ক্যাসেটগুলি ঠিক ঠিক স্থানে লুক্কায়িত রাখ।’

ইতিমধ্যে তারাদাসের পেটে বেন্ট বাঁধা হয়ে গেছে। পিঠে সেট হয়ে গেছে ডানা। ‘নাও স্টিয়ারিং ধরো। ওঠো, ওয়ান, টু, থ্রি।’ বোতাম অন করে দিল লোকটা। ডানা নড়তে লাগল। “স্টিয়ারিং উপরের দিকে ঠেলো”..বুড়ো চিল্লাল। তারাদাস তাই করল। তারাদাস উপরে উঠতে লাগল। তখন চ্যাচাল, ‘আমার সাইকেলটা দেখো...’

বুড়োটা বলল-‘সাইকেল পড়ে থাক। সাইকেল স্তর পার হয়ে গেছ তুমি। তুমি ওড়ো। উড়তেই থাকো।’ তারাদাস আকাশে উঠছে। দুধারে বিস্তৃত সবুজ। বুড়োটা দু’বাহু উপরে তুলে বলে চলেছে-‘ডানাটার সম্মান রেখো তারাদাস। এটাকে খারাপ কাজে লাগিও না। ডানাটার মর্যাদা রেখো তারাদাস। মানুষের কাজে লাগিও এটাকে।’...বুড়োটা বকেই চলেছে। তারাদাস ঘাড় উঁচু করে মেঘ দেখে। স্টিয়ারিং সামনে ঠেলে, পেছনে ঠেলে, উঁচু করে, নিচু করে, বাঁয়ে ঘোরায়, ডাইনে ঘোরায়, তারাদাস ওড়ে। সারাটা আকাশ নিয়ে খেলা করে। বহু নিচে কালো সুতোর মতো মদালসা নদী। ঐ নদীটা পড়েছে মধুক্ষরা নদীতে। ঢেউ-কলকল মধুক্ষরা নদীটা কী শান্ত এখন। নকশি কাঁথার মতো আলপনা আঁকা মাঠ। কৃষিক্ষেত্র। চাষের মানুষেরা মিশে আছে মাঠের সবুজে, আর মাঠের সবুজ মিশেছে বহু দূরের আকাশের নিচে। কোনটা যে চম্পাহাটি, কোনটা যে সজনেহাটি বোঝা যায় না। কোনটা যে দুধসাগর গাঁ আর কোনটা যে ক্ষীরসাগর গাঁ বোঝা যায় না। তিন কাঠা তেরো ছটাকের সঙ্গে দুই-কাঠা বারো ছটাকের ঝগড়ার কথা মিথ্যে মনে হয়। জনার্দনের আতাগাছের ডাল হরিপদর সীমানায় দু’হাত ঠেলে আসা মিথ্যে মনে হয়। শুধু মাঠের বিশাল সবুজ সত্যি। মদালসা নদীর

দুপাশে দুধের ফেনার মতো জমে থাকা কাশবনের সাদা রঙ সত্যি। আকাশের গায়ে ওড়া তুলোর মেঘ সত্যি। ঐ তিন সত্যি সারা গায়ে মেখে মেখে মেখে লুটোপুটি খায় তারাদাস। তারপর এক সময় তারাদাস নামতে থাকে। আবার দেখতে পায় মাঠের সবুজে খোপ খোপ আলের সীমানা। সবুজের ভিতর থেকে উঠে আসে বিড়িখোর মানুষ। তারাদাস দেখে সবুজের ভিতর দিয়ে কালো রাস্তা। কালো রাস্তায় ভ্যান-রিকশা দেখে তারাদাস। তারাদাস দেখে একটা লোক সাইকেল চেপে যাচ্ছে। লোকটা ধনা-মনা-ঘনা যে কেউ হতে পারে। কে লোকটা বোঝা যাচ্ছে না। সাইকেলটা হিরো-র্যালি-বি,এস.এ. যা খুশি হতে পারে। কী সাইকেল বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা সাইকেল চালিয়ে আম-জাম-পাকুড়-অশ্বথের ভিতরে একটা গ্রামের গভীরে মিশে যায়। তারাদাস যেখান থেকে উড়েছিল সেখানে গিয়ে দেখে ওর সাইকেলটা নেই। তখনই চিৎকার করে-‘সাইকেল...আমার সাইকেল...’। নেই সাইকেল নেই। বুড়োটার কথা মনে হল একবার। তুমি সাইকেল স্তর পার হয়ে গেছ তারাদাস। তখন শ্যামল মিত্রের গানটা একবার গাইল - ‘যাক্ যা গেছে তা যাক...’ তারাদাস এ-সময় দেখে কালো রাস্তা দিয়ে একটা ভ্যান-রিক্সা আসছে। ভ্যান-রিক্সা থেকে কথা আসছে। ভ্যান-রিক্সার বডিতে মাইক ফিট করা।

আউর ক’ গোলি বা?

ছে গোলি-

তেরা ক্যা হোগা কালিয়া!

আপকা নিমক খায়া সরকার।

অব গোলি খা...

শোলের ডায়লগ। পার্বতী হলে শোলে এসেছে। শোলের কথা মনে হতেই আতর্নাদ করে ওঠে তারাদাস। ক্যাসেট?

ক্যাসেট সাইকেলের বাস্কেটে ছিল। তারাদাস কালো ফিতের মতো রাস্তাটার দিকে হতবাক তাকায়। তারাদাস দেখে একজন খালি-গা মানুষ রাস্তা থেকে কী যেন কুড়িয়ে নিল, তারপর ফেলে দিল। মাথার বুড়ি নামিয়ে অন্য একজন মহিলা কী যেন তুলে নিল, আবার ফেলে দিল। সাঁই করে মাটিতে নেমে এল তারাদাস। ঐ তো, ওগুলোই তো ভি.ডি.ও. ক্যাসেট। শোলে, ডন, আর ডটডট। খালি-গা মানুষদের এসব দরকার হয় না। কিন্তু এসবে ভোলা ঘোষদের সুখ হয়। ভোলা ঘোষের সুখের খোঁজে তারাদাস অনেকক্ষণ পরে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়াল। ওগুলো কুড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল দারকপাটি।

ভোলা ঘোষ তখন তার শালা, শালা-বৌ-এর সঙ্গে রসিকতা করছিল। ‘বলো তো-এটার উপর ওটা দিয়ে মাগ-ভাতারে রইল শুয়ে...এটা কী?’ ভোলা ঘোষের শালা-বৌ বলল, ‘ইশ্ কী অসভ্য।’ ভোলা ঘোষ বলল, ‘তোমার মনের মধ্যে পাপ। ওটা হ’ল খিল। দরজার খিল।’ এমন সময় ঘেউ ঘেউ আর হাঙ্গা হাঙ্গা ডাক শুনে বাইরে তাকাল ভোলা ঘোষ, দেখল একটা ডানাওলা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। ভোলা ঘোষ বাইরে বেরোলে হাতজোড় করে দাঁড়ায় তারাদাস। যেন গরুড়। নারায়ণের বাহন। তারাদাস বলে, ‘নারায়ণ ক্যাসেট ভাঙার থেকে এসেছি। এই যে ক্যাসেট। ডন, শোলে আর ইয়ে।’ কুকুররা ঘিরে ধরেছে তারাদাসকে। ভীষণ ঘেউ ঘেউ তারাদাস চোঁ করে উপরে ওঠে। সূর্য লালচেপানা হয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ ওড়া যাবে না, বুড়োটা

বলে দিয়েছিল। আকাশে দিক ঠিক রাখা মুশ্কিল। উত্তরে মধুস্করা নদী, দক্ষিণে গোপেশ্বরের মন্দিরের চূড়া। এবার নিজের গ্রামের দিকে যায় তারাদাস।

জনার্দন মল্লিক চেক লুপ্তি পরে মজুর চরাচ্ছে। বগলে ট্রানজিস্টার, হাতে সিগারেট। বাগানের গাছের আগায় আতা পেকে আছে। তোতা পাখির কিচির মিচির। তারাদাস যেতেই পাখিরা উড়ে পালায়। বেশ বড়ো-সড়ো একটা আতা ছিঁড়ে নিল তারাদাস। তিতু আতা খেতে ভালোবাসে। তিতু জনার্দন মল্লিকের মেয়ে। জনার্দনবাবুর বাড়ির চারিদিকে মাটির পাঁচিল, দরজায় গণেশ। পাঁচিলের গায়ে লেখা: জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন। আরও আছে।

গাছ লাগান গাছ বাঁচান, গাছ হ'ল প্রাণাধিক।

নিবেদন করিছেন শ্রী জনার্দন মল্লিক।

জনার্দন মল্লিকের ভগ্নীপতি পাশের গ্রাম ক্ষীরসাগরের পঞ্চায়েত প্রধান। জনার্দনের জমির কাছে সরকারি ডিপকল হয়েছে। এখন বছরে তিনটে চাষ। এখন জনার্দন মল্লিককে সবাই জনার্দনবাবু বলে। তিতুর খোঁপায় একদিন কাঠালিচাঁপা গুঁজে দিচ্ছিল তারাদাস, জনার্দনবাবু দেখে ফেলেছিল। বলেছিল-‘আর কক্ষনো এ বাড়ির দরজা মাড়াবি না হারামজাদা।’ তারাদাস দরজা মাড়ায় না। সাঁই করে সোজা পাঁচিল-ঘেরা উঠানের মধ্যখানে নামে। তিতু তখন গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজছিল। হাতের মধ্যে আতাটা দিয়েই উপরে উঠে যায় তারাদাস। কদমগাছের মগডালে আনন্দে ক’বার দোল খায়। ওকে ঘিরে জড়ো হতে থাকে লোকজন। সবার চোখ উপরে। আকুল আহ্বানে বলে, নেমে এসো, কদম্বের শাখা হতে নেমে এসো ত্বর। তারাদাস উড়ে উড়ে নেমে আসে। বাচ্চারা আনন্দে হাততালি দেয়। তিতু ভীষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। হাতে তখনো আতা। তারাদাস মাটিতে নেমে কোমরের বেল্ট খুলে ডানাটা পিঠ থেকে খুলে পাশে রাখে। মানুষজন আর তারাদাসকে দেখছে না তেমন। ডানাটাকেই দেখছে। তারপর তারাদাসকে ঘিরে মিটিং বসে। জনার্দন মল্লিক হাঁকে, ‘অ্যাঁ তিতু, এখানে কী? যা-ঘর যা...’ তারপর তারাদাসকে বলে, ‘ঝেড়ে বল তো তারাদাস, ব্যাপারটা কী?’ তারাদাস সব বলে। প্রথম থেকে সব বলে। মতিলাল ভট্টাচার্য ফিসফিস করে হীরালাল মিত্রকে বলে, ‘সিডিউল কাস্টরা সব দিক থেকেই সুবিধে পাচ্ছে হে।’ জনার্দন মল্লিক সব শুনে নিয়ে কদমগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে -

‘শুন বলি জনগণ শুন সবে এক মন তারাদাস গর্ব সবাকার...’

ঠিক সেই সময় জনার্দনের উপরে গলা চড়িয়ে বলতে শুরু করল ‘বন্ধুগণ, তারাদাস একটা ওড়ার যন্ত্র পেয়েছে’ - তা যেভাবেই হোক। কিন্তু তার ঐ ওড়ার ফয়দা নারায়ণ বিশ্বাসকে একা ভোগ করতে দেয়া হবে না। তারাদাসের ডানার সাহায্যে নারায়ণ বিশ্বাস ওর দোকান থেকে আরও দূরে দূরে আরও তাড়াতাড়ি ক্যাসেট সাপ্লাই করে আরও বেশি মুনাফা করবে। আমরা তারাদাসকে অনুরোধ করব হে তারাদাস, তুমি তোমার ডানা জনগণের কাজে লাগাও। আমার মুকুলে মেটাসিড স্প্রে করো উড়ে উড়ে। তাতে সব মুকুলেই ওষুধ লাগবে। ক’টা বাঁদর এসে প্রায়ই জ্বালাতন করে, তাড়া করলে এ ডাল থেকে ও ডালে পালায়। তুমি রাক্ষসের মুখোশ পরে উড়ে উড়ে বাঁদর তাড়িও।’

তারাদাস বলে, ‘বেশ তো।’

তারাদাসের ঠাকুর্মা চোখের জলে নাকের জলে একশা। বাপ-মা মরা নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘হ্যারে, তের ভয়ের কিছু নেই তো, ডানাটা বিগড়াবে না তো?’ তারাদাস বলে, ‘না-না, কিছু ভয় নেই। ডানা চালানো ভীষণ সোজা। আমার তো এখন আর মাটিতে পা দিতেই হচ্ছে করে না।’ বুড়ি বলে, ‘হ্যারে, তোর মালিক এবার তার একটু মাইনে বাড়াবে তো?’ তারাদাস বলে, ‘না বাড়াক। এবার মেলার সময় দেখো-কী রকম কামাবো। মোটর সাইকেলের আশ্চর্য খেলা আসে না, ভোঁ ভোঁ ঘোরে, কত টাকা কামায়। আমিও বোঁ-বোঁ উড়ব। মাইকে বলব আসুন দেখুন-উড়ন্ত মানুষ...’

নারায়ণ বিশ্বাসের হাটের নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারের সাইন বোর্ডের তলায় আর একটা ছোট সাইন বোর্ড জুড়ে দেয়া হয়েছে। বি.দ্র: খবর পাইবা মাত্র উড়ন্ত মানুষ দ্বারা দ্রুত অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

এই গ্রামে ইলেকট্রিক এসেছে বছর দুই। ফোন ছ’মাস। নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারের ফোন নম্বর দুই। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের ফোন নম্বর তিন। আট মাইলের মধ্যে আর হেল্থ সেন্টার নেই, আট মাইলের মধ্যে আর ভি.ডি.ও. ভাণ্ডারও নেই। তারাদাসকে নতুন পোশাক দিয়েছে নারায়ণ। কালো প্যান্ট, সাদা জামা। তারাদাস ছন্দে ছন্দে ওড়ে আনন্দে।

তারাদাস পাঁচজনের উপকারও করে দেয়। এ নিয়ে ওর সমস্যা। কেউ হয়তো বলল-‘তারাদাস, নারকোল গাছ থেকে দুটো নারকোল পেড়ে দিবি?’ ও পেড়ে দিল-ওর তো এক মিনিট। পরে দুখীরাম এসে বলল-‘তারাদাস, আমার ভাত মারিস না। আমি একটাকা নিয়ে নারকোল পাড়ি। তুই এসব করলে আমার কী হবে?’ একদিন জনার্দন বলল-‘তারাদাস, এই কাগজগুলো ধর, আকাশ থেকে ছড়িয়ে দিবি।’ তারাদাস তাই করল। হরিপদ মাস্টার তো রেগে বলল, “তারাদাস, জনার্দনের চক্রান্তে পা দিও না। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। জনার্দনের ভগ্নীপতি ক্ষীরসাগর থেকে এসব করাচ্ছে। আমার কথা ছাড়া আর কোনো কাজ করবে না, এই তোমায় বলে দিলুম। আমি এই গাঁয়ের প্রধান।’ তারাদাস মাথা নাড়ে।

গাঁয়ে একদিন জনার্দন মল্লিকের বাড়িতে ডাকাতি হল। পুলিশ কী করে জানতে পেরেছিল ঠিক ক’টার সময় ডাকাতি হবে, তাই পুলিশ জীপ নিয়ে এসেছিল আবার ডাকাতও জানতে পেরেছিল পুলিশ আসবে, তাই ডাকাতরা একটু আগেভাগেই এসে গিয়েছিল। পুলিশ যখন এল ততক্ষণে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা মাঠ ভেঙে পালাচ্ছে। জীপ তো আর মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে পারে না, তাই আর ডাকাতগুলোকে ধরা গেল না। পুলিশ বলল-‘খবর আছে আসছে হুগুয় হরিপদবাবুর বাড়িতে ডাকাতি হবে।’ হরিপদ বলল-‘সে কী? তবে তো আপনাদের এলাট থাকতে হয়।’ পুলিশের বড়বাবু বললেন- ‘এলাট না হয় থাকলাম, তবে মাঠ ভেঙে ডাকাত পালালে আমরা কী করব? মাঠে তো আর জীপ যায় না।’ হরিপদবাবু তক্ষুনি তারাদাসকে ডেকে আনিয়ে বলল, ‘তারাদাস, পুলিশ সাহেবকে একটু ওড়া শিখিয়ে দে ভাই, সামনের সপ্তাহে ডাকাত আসবে, আমার বাড়িতে ডাকাতি হবে, ডাকাতি করে মাঠ ভেঙে পালাবে। ট্রেনিংটা থাকলে তোর ডানাটা নিয়ে মাঝমাঠে উড়ে গিয়ে পুলিশ ডাকাতকে গুলি করে দিতে পারবে।’

এ আর বেশি কথা কী। তারাদাস রাজি হয়।

বড়োবাবুর হাই-ব্লাডপ্রেসার। মেজবাবু ট্রেনিং নিতে এলেন। নাম কানাই পাত্র। ট্রেনিং হল। তারপর মেজবাবু উড়তে উড়তে করল কী, বলা নেই, কওয়া নেই মধুক্ষরা নদীর ধারে চলে গেল। নদীর পাড়ে

সুহাসিনী গ্রাম। গ্রামের ধারের পুকুরে গ্রাম্যবালারা সব কলহাস্য সহকারে স্নানরতা ছিল। তাদের বস্ত্র ছিল পুকুরপাড়ে ছাড়া। কানাই করল কি, সাঁই করে কয়েকটা কাপড়-চোপড় তুলে নিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ডালে উঠে বসে রইল। কানাইয়ের হাতে মোহন বন্দুক।

ব্যাপারটা জানাজানি হল যখন সাপ্তাহিক বিষদাত পত্রিকায় ব্যাপারটা লেখা হ'ল। জনার্দন মল্লিক ওর মাঠের মুনিষ-মজুরদের শোনাল-

‘আরে শুন সবে মন দিয়া আজব কাহিনী  
সম্প্রতি হইয়াছে ইহা লোক জানাজানি  
মাস্তার হরিপদ  
মাস্তার হরিপদ-কানাই পাত্র চক্রান্ত করিয়া  
নারীর বস্ত্র নারীর ইজ্জত লইল যে হরিয়া  
শুন সেই বৃত্তান্ত...’

হরিপদ বলল, ‘তারাদাস, তার ডানাটারই যত দোষ। যত অশান্তির কারণ। এই ডানাটা ভেঙে ফেলা হবে কিনা এ নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব।’

নারায়ণবাবু বললেন-‘তারাদাস, তোর ঠাকুমা আমার হাতে পায়ে ধরে বলেছিল বাপ-মা মরা নাতিটার একটা গতি করে দিতে। বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়েই তোকে আমি চাকরি দিয়েছিলাম। শোন তুই আমার চাকরি করিস। ওসব হরিপদদের কথা শুনবি না। জনার্দনের কথাও না। আমি যা বলব তাই শুনবি, যা বলব তাই করবি। তার ডানা কাউকে দিবি না। ওটা আমার।’

তারাদাস বলল, ‘বুড়োটা ডানাটা দেবার সময় যে বলেছিল-ডানাটার অমর্যাদা হতে দিস নি, মানুষের উপকারে লাগাস....’

নারায়ণ বিশ্বাস বলল: ‘বিচার করে উপকার করতে হয়। তার ছোট মাথায়, বোকা মাথায় কি এত বিচার-বিবেচনা আসে? বরং আমিই বিচার-বিবেচনা করে বলে দেব তোকে।’

নারায়ণ ক্যাসেট ভাঙারে লক্ষ্মী এল। ফুলে ফেঁপে উঠল দোকান। দোকানের নাম সামান্য চেঞ্জ। ভাঙারটা হলো সেন্টার। নারায়ণবাবু দোকানে রঙ করালেন, নতুন লাইট বসালেন: ধূমধাম করে বিশ্বকর্মা পূজা হ'ল। ভি.সি.পি, ভি.সি.আর-এ মালা পড়ল, তারাদাসের ডানায় মালা পড়ল, চন্দন পড়ল, ধূপকাঠি গোঁজা হল স্টিয়ারিং-এর ফাঁকে। ইঞ্জিনিয়ার ডেকে নারায়ণবাবু ডানায় ওয়ারলেস সিস্টেম করালেন। স্টিয়ারিং-এর মাঝখানটায় তো একটা স্পিকার দেয়া হল। উড়ন্ত তারাদাসকে এখন নারায়ণবাবু নির্দেশ দিতে পারেন, আবার তারাদাসের কথাও শুনতে পান নারায়ণবাবু। যেমন :

‘ভূদেব সামন্তর বাড়িতে পৌঁছে গেছি স্যার...’

‘ইয়েস।’

‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আরও দু’দিন রাখতে চাইছে স্যার।’

‘না, তা কী করে হয়; মালতীমাধবপুরে অষ্টপ্রহর হরিসংকীর্তন চলছে, ওখানে তো আজই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দিতে হবে।’

‘স্যার, অবনী সাঁতারার বাডি পৌঁছে গেছি স্যার।’

‘ইয়েস।’

‘অবনী বাডি নেই।’

‘ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল।’

‘স্যার?’

‘ইয়েস...’

‘ডটডট ক্যাসেটের ব্যাপারে বৌদির সঙ্গে কথা বলা কি ঠিক হবে?’

‘এতদিনেও কায়দা শেখনি? একটু বুদ্ধি করে বল।’

তখন তারাদাস এইভাবে কথা বলে!-‘তিনটে ক্যাসেট দিয়ে গেলুম বৌদি, সতী সাবিত্রী, হাণ্টারওয়ালী আর দ্রৌপদী কী বস্ত্র হরণ। লাস্টেরটার ডবল দাম কিন্তু- দেব?’

বৌদি বললেন, ‘রেখে যাও...’।

নারায়ণ তারাদাসকে কোয়ার্টার দিয়েছে বৈকুণ্ঠ ভবনের চিলেকোঠায়। বৈকুণ্ঠ ভবন নারায়ণের নতুন বাড়ি। অল মোজাইক। তারাদাসের ঠাকুমা চিলেকোঠায় মনের সুখে ঝোল চচ্চড়ি রাঁধে। মুখে আর হাসি ধরে না। বলে, এবার লাতবৌ আনবো।

তারাদাস কাজে যাবার সময় বুড়িকে পেন্নাম করে। উড়াল দেবার আগে ডানার বোতাম টেপার সময় শোনে-‘দুগ্ধা-দুগ্ধা’। তারাদাসের হাতে নতুন ঘড়ি, পরনে নতুন ইউনিফর্ম। বুড়ি তাকিয়ে থাকে...

তারাদাস যায়

জরির জুতো পায়

একশো টাকার জামাজোড়া

তারাদাসের গায়

মন্দা মন্দা বাতাস লাগে

সোনামণির পায়।

এদিকে জনার্দন ভার্সেস হরিপদর ঝগড়া উঠেছে তুঙ্গে। জনার্দন তো নিমিত্ত মাত্র। আসলে ঝগড়াটা হল দুধসাগরের প্রধান হরিপদর সঙ্গে ক্ষীরসাগরের প্রধান গোবর্ধনের। জনার্দনের দোষ হল গোবর্ধন ওর ভগ্নীপতি। জনার্দনের আতাগাছের ডালগুলো হরিপদর সীমানার মুখে পড়েছিল। গাছের ডাল তো আর দাগ নং জে.এল. নং বোঝে না। কাটলেও আবার ডাল গজায়। এ নিয়ে ঝামেলা। সালিশি হয়েছিল গাছটা কেটে ফেলতে হবে। তখনই ঐ বিখ্যাত কবিতাটার জন্ম। ঐ যে, জনার্দনের পাঁচিলের গায়ে যেটা লেখা আছে: গাছ লাগান, গাছ বাঁচান গাছ হ’ল প্রাণাধিক, নিবেদন করিছেন জনার্দন মল্লিক। গাছটা সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। এবার কাটতেই হল।

আতাগুলো ভুঁয়ে লুটোপুটি, তোতা পাখিরা সব উড়ে পালাল। জনার্দনের বোকা মেয়ে তিতুর সে কী কান্না। কান্না আর থামে না। তারাদাস বলে, কাঁদিস না তিতু, আমি, আমি তোকে...



গাঁয়ের শেষ প্রান্তে আতা বাগানের বস্তুতে যে ছোটলোকগুলো থাকত, ওখানে আগুন লাগল। দুটো বাচ্চা পুড়ে মরে গেল। আতাগাছ যে-কটা ছিল পুড়ে কালো। আতাবাগান বস্তির লোকগুলো হরিপদর হয়ে খুব খেটেছিল ভোটে।

অনন্ত মাঝিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। মদালসা নদীর জলে ভেসে উঠল ওর লাশ।

নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়িতে এখন অনেকবার বাজে টেলিফোন।

নারায়ণবাবু এখন কেউকেটা লোক। চিন্তামগ্ন লোক।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে গোবর্ধনের ফুসুর ফুসুর

নারায়ণবাবুর সঙ্গে হরিপদর ফুসুর ফুসুর

নারায়ণবাবুর সঙ্গে পুলিশের ফুসুর ফুসুর।

তারাদাস এখন ঘর আটকা। নারায়ণবাবু বলেন, এখন ক’দিন বাইরে বেরুতে হবে না তারাদাস। তোর ডানার দিকেই সবার নজর। পেলে কেড়ে নেবে, নয়তো ভেঙে দেবে।

বুড়ি ঠাকুমা তারাদাসের ডানায় থুথু দেয়, কাঁটার কাঠি বেঁধে দেয়।

একদিন বৈকুণ্ঠ ধামে অনেক জুতো। বসার ঘরে দোর বন্ধ করে আলোচনা। ঘরে কে কে আছে জানে না তারাদাস। আকাশে সেদিন সকাল থেকে মেঘ।

তারাদাসের ঠাকুমা খিচুড়ি চাপিয়েছে। এমন সময় নারায়ণবাবু এলেন তারাদাসের চিলেকোঠার ঘরে।

‘তারাদাস, কথা আছে।’

‘কী কথা?’

‘একটু বেরুতে হবে তোকে।’

‘আজ যে মেঘলা দিন। সূর্যের আলো না পড়লে যে আমার ডানা নড়ে না।’

‘আলো আছে। আলো আছে বলেই তুই আমাকে দেখছিস, আমি তোকে দেখছি। একবার দেখনা-রে ভাই তারাদাস, ভীষণ দরকার।’

‘ভাই’ ডাক শুনে তারাদাস গলে যায়। ডানা লাগিয়ে একবার ট্রায়াল দিল। একপাক উড়ে এল। ভাবল সত্যিই তো, আলো কী অদ্ভুত। সূর্যকে দেখতে না পেলেও সূর্য আছে চরাচরে।

তারাদাস বলল, ‘কোথায় যেতে হবে?’

নারায়ণ ছাদের কোনায় ডেকে নিয়ে যায়। বলে ‘সোজা উত্তরে। মধুস্করা নদী পার হয়ে হবে।’

‘ওখানে তো আমাদের ক্যাসেটের কেলায়েন্ট নেই,-’

‘ক্যাসেট নয়-রে, অন্য জিনিস।’ নারায়ণের গলার স্বর গাঢ়। ‘জিনিসটা আনতে হবে তোকে।’

‘কী জিনিস?’

‘পরে জানবি। শোন তারাদাস, নলখাগড়ার মাঠ পার হয়ে মধুস্করা নদীর পাড়ে যাবি। তারপর নদী পার হয়ে একটু গেলেই একটা মন্দির, সেই মন্দিরের পাশে নামবি। তারপর কোথায় যাবি কী করতে হবে ওয়ারলেসে বলে দেব তোকে। এই-নে চাবি। লাগবে তোর। জিনিসটা খুব সাবধানে আনবি, খুব সাবধানে।’

ক্যাসেট রাখার বাস্কেটটা পেটের তলায় ভালো করে বেঁধে দেয় নারায়ণ। তারাদাস যাত্রা করে। বুড়ি ঠাকমা বলে, ‘দুগ্গা দুগ্গা।’ নারায়ণ হাত নেড়ে বলে, ‘গুডলাক।’

নদীর উপরে আসে তারাদাস। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে নদী এখন বিশাল। তাকালে ভয় লাগে।

নদী পার হয়েই দেখল আতাবন। পাকা পাকা আতা ফলে আছে। ওয়ে ওয়ে..ওয়ে ওয়ে...। দুটো তিতুকে দেবে, দুটোর বীজ সারা দুধসাগরে ছড়িয়ে দেবে। আতা ফলগুলো বাস্কেটে পুরে নিল তারাদাস। গাছের কোটরে পেল তোতা পাখির ছানা। তুলে নিল। তারাদাস বাঁচাবে। মাউথ পিসে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তারাদাস।

‘মধুস্করা নদী পার হয়েছ?’

‘ইয়েস স্যার।’

‘এবার অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলো। ওর কথা মতো কাজ করে যাও।’

‘ইয়েস স্যার।’

একটা খ্যাড়খেড়ে গলায় শুনতে পায়, ‘তারাদাস এখন কোথায় আছ?’

‘আতাবনে। কী সুন্দর আতাবন।’

‘গুলি মারো আতাবন। সামনে যাও।’

‘ইয়েস স্যার।’

‘মন্দির দেখেছ?’

‘ইয়েস স্যার।’

‘চুড়ায় ত্রিশূল?’

‘ইয়েস স্যার।’

‘মন্দিরের পিছনে নেমে যাও।’

‘ইয়েস স্যার।’

মন্দিরের পিছনের কাশবনে নেমে যায় তারাদাস। তারপর কথামতো লাল রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে যেতেই একটা একতলা বাড়ি। বাড়ির দরজায় তালা। কথামতো চাবিটা বার করে তারাদাস। তালাটা খোলে। ঘরের জানালা-টানালা সব বন্ধ। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা গন্ধ।

টচটা বার করে। জ্বালায়। ঘরের কোনায় চারটে প্যাকেট। টার্চের আলোয় তারাদাস খুঁজতে থাকে পদ্মফুল আঁকা প্যাকেট। তারাদাস পায় না। প্যাকেটগুলো উল্টেপাল্টে দেখে। কোনোটাতেই পদ্মফুলের ছবি নেই। তারাদাস খুব সমস্যায় পড়ে। হনুমান কী করেছিল, হনুমান?

বিশল্যকরণী খুঁজতে গিয়ে হনুমান বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরো গন্ধমাদনটাই নিয়ে এসেছিল না? তারাদাস চারটে প্যাকেটই তুলে নেয়। হেড অফিসের সঙ্গে কথা বলে:

‘কোনো প্যাকেটে পদ্মফুলের ছবি নেই স্যার। ওভার।’ আবার সেই খ্যাড়খেড়ে – ‘ভালো করে দ্যাখো।’

‘দেখেছি স্যার, খুব খুব ভালো করে দেখেছি। ওভার।’

‘সে কী?–নিশ্চয়ই আছে। ভালো করে দ্যাখো।’

‘নেই স্যার।’

‘সব রাসকেল। কেউ ঠিক করে কাজ করে নি। তুমি এক কাজ করো। চারটে প্যাকেটই নিয়ে এসো, আমরা পরে দেখে নেব।’

‘প্যাকেটে কী আছে স্যার।’

‘তা তোমার জেনে কাজ নেই। তুমি প্যাকেটগুলো নিয়ে এসো।’

তারাদাস চারটে প্যাকেটই তুলে নেয়। অজানা প্যাকেট। আকাশ মেঘলা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেণ্টের বোতামটা টিপল তারাদাস। হলুদ আলো। মানে ডানায় শক্তি বেশি নেই। মধুস্করা নদী পার হতে পারবে তো? দুগ্ধা বলে উড়ান দিল তারাদাস।

উড়তে উড়তে আতাবন পার হলো তারাদাস। উড়তে উড়তে যেন টের পায় একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে ও। নদীর উপরে চলে আসে তারাদাস। ডানা যেন আর তত জোর কাঁপছে না। একটু করে নিচু হয় তারাদাস। নদী মাঝ বরাবরও আসেনি। নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারাদাস। তারাদাস ভয় পায়। ওয়ারলেসে জানায়-‘নদীর উপর দিয়ে উড়তে উড়তে আমি তারাদাস বলছি, আমি নিচে নেমে যাচ্ছি ক্রমশ। আমাকে একটু হাল্কা হতে হবে। একটু ওজন কমাতে হবে আমার। একটা প্যাকেট ফেলে দিচ্ছি জলে....’

তক্ষুনি সমবেত স্বর- ‘সর্বনাশ তারাদাস, প্যাকেট ফেলো না।’

‘আমায় যে হাল্কা হতে হবে।’

‘তা হলে পেছাপ করে দাও।’

তাই করল তারাদাস। মধুস্করা নদীর জলে তারাদাস পেছাপ করল।

একটুক্ষণ পরে আবার যেন নিচে নামছে তারাদাস। একটু পরেই তারাদাস আবার চিৎকার করল-‘আমি আবার নিচে নেমে যাচ্ছি। এবার একটা প্যাকেট ফেলে দিচ্ছি আমি, যে-কোনো একটা প্যাকেট।’

‘যে-কোনো একটা প্যাকেটের মধ্যেই আমাদের দরকারি প্যাকেটটা আছে। প্যাকেট ফেলো না। তুমি তোমার প্যান্ট খুলে ফেলো।’

তাই করল তারাদাস। কায়দা করে প্যান্টটা খুলে ফেলে দিল মধুস্করা নদীর জলে। কিছুক্ষণ ঠিক, কিন্তু, একটু পরেই আবার নিচে নামতে লাগল তারাদাস। বর্ষায় উথাল- পাথাল নদী। তারাদাস চিৎকার করল-‘আবার নিচে নেমে যাচ্ছি আমি। জলে ডুবে যাব। একটা প্যাকেট ফেলে দিই আমি?’

‘আর কি কিছুই নেই তোমার কাছে তারাদাস ঐ প্যাকেটগুলো ছাড়া? ধারালো কিছু নেই? শরীরের কিছুটা রক্ত ঝরিয়ে দিতে পারো না তুমি?’

‘আমার কাছে কটা আতা ফল আছে, আর তোতা পাখির ছানা।’

‘আতা ক্যালানে কোথাকার। ফেলে দাও। এক্সুনি ফেলে দাও সব।’

তখনই ডুকরে কেঁদে ওঠে তারাদাস। তারাদাস তখন বুড়ির ভিতর থেকে বের করে নিল একটা আতাফল। পরিপূর্ণ গন্ধ ছিল। তারপরই মুঠিতে শক্ত করে চেপে ধরল আতা ফল ফেটে যায়, ভেঙে যায়।

একটু একটু করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে তারাদাস। তখন আকাশকে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মহিমাকে সাঁই সাঁই বাতাসকে বলল, ‘আমাকে বাঁচাও...’

আর অল্প কয়েক হাত নিচেই তোলপাড় জল। তারাদাস চোখ বুজে তুমুল আতঁনাদ করে-‘আমাকে বাঁচাও।’ তারাদাসের চতুর্দিকে তখন শুধুই বৃষ্টির গুঁড়ো, আর কালো স্পিকারের যান্ত্রিক কলরব, ‘ফেলে দে-ফেলে দে আতা।’

এখন তারাদাসকে বাঁচতে হলে যে কোনো ংকটা জিনিস বেছে নিতে হবে। আতা কিংবা বাদামি প্যাকেট। প্যাকেটে কী আছে জানে না তারাদাস। বিষ না বীজ-না বীজাণু- না ড্রাগ-হেরোয়িন না নাপাম না শালগ্রাম নিউক্লিয়ার ছাই, তারাদাস জানে না। অথচ তারাদাসেরই ডানায় ভর করে চলেছে। হুকুম।

তারাদাসের আগে কোলবালিশটাও উড়েছিল। ওড়ানো হয়েছিল। কোলবালিশটার নিজের কোনো ইচ্ছে ছিল না। প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত ছিল না। তারাদাস তো কোলবালিশ নয়। ডুবে যাবার আগে ওকে ংকটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

## গণেশ

কতদিন হল নিরুদ্দেশ?  
গত হাটবার থে।

মানে কত দিন?

ধরুন চাইর দিন।

বয়স?

বন্যার সালে জন্ম।

পাশ থেকে কনস্টেবলটি বলল, চোদ্দ লিখুন স্যার।

গোঁপ উঠেছে?

এই এটু রেখা মতন।

আচ্ছা। চোদ্দ। ঝগড়া-ঝামেলা কিছু হয়েছিল?

না আজ্ঞা।

টাকাপয়সা চুরিটুরি...

কীই-বা আছে আমার যে নেবে?

আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আছে কিছু?

সিটা কী স্যার?

এই ধর কোনো আঁচিল, জড়ুল কাটা দাগটাগ...

পাশ থেকে কনস্টেবলটি বলল, চিন্ন, চিন্ন, ঝা দেখি তোমার ছেলেরে চিনা যাবে। বিজয় হাজরা তক্ষুনি বলল, আছে স্যার, আছে। ছ্যামড়ার বাঁ কানটা বড়, এই এ্যাতো পর্যন্ত, কুলোর মতন পেরায়।

নতুন আসা মেজবাবু অবাক হয়। বলে কুলোর মতো? অসুখ-বিসুখ নাকি?

কনস্টেবলটি মানেওলা হাসি মেরে বলল, আছে স্যার, এ অঞ্চলে ব্যাপার আছে। পরে জানবেন।

নতুন আসা মেজবাবু লিখলেন: ভেরি লার্জ লেফ্ট ইয়ার।

থানায় ডায়েরি করিয়ে বিজয় হাজরা ফিরছিল। তখনই দেখল পিচরাস্তার বাস স্টপেজে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিল্টার ফুঁকছে গোপীবল্লভ। চুলে টেরি, গায়ে টেরিকটন, বগলে চামড়ার ব্যাগ, আর জামা-কাপড়ের পুঁটলি। গোপীবল্লভকে আগে নাম ধরেই ডাকত বিজয় হাজরা। বয়সে ছোট। ধোপাদের ঘরের ছেলে। টেন-ক্লা শ অন্দি পড়েছিল। এখন এই ড্রেসমারা অবস্থায় কী ডাকবে ভাবছিল, তার আগেই গোপীবল্লভই ডাকল, ও বিজয়...। ডাকের মধ্যেও বেশ মশলা এসেছে। বিজয় হাজরা কাছে গেল। গোপীবল্লভ বলল, কি হল, তোমার ভায়রাভাইয়ের কেসটা কী করলে? বিজয় বলল, ওসব কেস-কথা পরে। আমার ধনঞ্জয়ডারে কী করলা তুমি, কানটা ইয়া বড় হয়ি গেল, ইস্কুলের ছেলেপিলে আর পাড়ার চেটো-চ্যাংড়ারা সব ওর লম্বা

কানটা ধরি টানিটানি, এমন অস্থির করি তুলিল যে ছ্যামড়া খ্যাপাপনা হয়ি নিঘঘিননেতি ঘর ছাড়ি পালাল। এখন যে কতি গেচে সে... গোপীবল্লভ আঙুলের সিগারেটসমেত হাতের পাঞ্জাটা ভোটের হাতচিহ্নের মতো বিজয় হাজারার মুখের সামনে ধরল। মানে থামো। বিজয় থামলে গোপীবল্লভ বলল, বুঝলে বিজয়, ঝারা খ্যাপাচ্ছে, ওইসব চ্যাংড়াচোটাগুলুন, ওদের মধ্যি দেকো, অনেকিরি কান বড় হবে, নাক বড় হবে, হাত বড় হবে, কিছু ব্যস্ত হবার নেই, কাজ এগুচ্ছে।

বিজয় হাজারা বলে, সি কতা নয়। বলতিচি, তুমি ত পাঁচ জায়গায় ঘাই মারো, আমার ধনার সন্ধানটা কোরো। টিভিতে ওরে দ্যাকানো যায় না?

সে দ্যাখাবে কি করি? ওর কি ছবি আছে?

হ্যাঁ, আছে বৈকী। মেলার সময় তোলা হয়েছিল, পিছনে তাজমহলের সিন...

সে ত পুরনো। কান বড় হবার পর ছবি আছে?

তা অবিশ্যি নেই।

তবে?

তাইলে ধনারে খুঁজি পাবার কি উপায়?

সে আমি দেকচিখনে। তোমার কিছু চিন্তা করার নেই। চিন্তা করবে চিন্তামণি। তোমার ভায়রার কাছে যাবার ছেল, একটা কেস আছে বলছিলে না?

সিটা মোর দ্বারা হবে নি। আমি নে যাব নি। মাথা নাড়তে থাকে বিজয়।

ঠিক আছে। আমি একাই যাব। এড্রেসটা, মানে ঠিকানাটা ত বলবে।

ওই ত, আনন্দপুর গেরাম।

ভায়রার নাম?

মহাদেব হাজারা।

বাস এসে গেল। সিগারেটের হলুদ ফিল্টার সাদা ধূতরোফুলের দিকে ছুড়ে দিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরল গোপীবল্লভ।

একটু টাউনে যাব। জামাকাপড়গুনু এটু লগ্নিতি দিতি হবে।

ধোপাদের ছেলে গোপী এখন জামাকাপড় কাচাতে ধোপাবাড়ি চলল।

গোপীবল্লভ হাজির হল মহাদেব হাজারার ঘরে। গোপীবল্লভের পরনে ফাইন ধুতি। কোচাটা ফুল বানিয়ে পকেটে রাখা। ঠোট লাল। বগলে চামড়ার ব্যাগ। বলল, বিজয় হাজারা পাঠায়ি দেছে।

কী বিত্তান্ত?

কথা আছে। দরকারি কথাবার্তা আছে কিছু।

মহাদেব হাজারা খেজুরপাতার চাটাই পেতে দিল। গোপীবল্লভ চাটাইয়ে ফুঁ দিয়ে বসল। সটাস্ করে ব্যাগের চেন খুলল। কিছু কাগজপত্র বার করল।

মহাদেব হাজারা বুঝে নিল কোনো দুনম্বরী ব্যাঙ্ক পার্টি। এখন নানা রকমের ব্যাঙ্ক গজিয়েছে। মা লক্ষ্মী সঞ্চয়, ম্যাডোনা সেভিং এরকম সব। টাকা খিঁচে হাওয়া হয়। মহাদেব তাড়াতাড়ি বলে, টাকাপয়সা। মোটে

নেই, ওসব দিতি পারব নি।

গোপীবল্লভ বলে, টাকাপয়সা তোমায় দিতি হবে না, বরং উলটি তুমিই পাবা। ম্যালা টাকা। আগে ব্যাপারটা মন দে শোন।

একটা ফিল্টার সিগারেট ধরায় গোপীবল্লভ, আর-একটা মহাদেবের দিকে বাড়িয়ে দেয়। কমলা রঙের ফিল্টারটা মহাদেবের দিকে চেয়ে আছে। নেব না নেব না করেও মহাদেব ওটা নেয়। গোপীবল্লভ সিগারেটের সামনে গ্যাসলাইটার খিচ্ করে। লাইটার ফণা তুলে দেয়।

শোন বলি। আমি একটা কোম্পানির কাছ থেকে আসছি। কামিং ফ্রম ভেরি গুড কোম্পানি। ইন্টারন্যাশনাল লেবেলিং কোম্পানি। ইন্টারন্যাশনাল জুড়ে কাজ কারবার। এই কোম্পানি মানুষের সেবার জন্য কাজ করতিছে। নানানরকমের রিসার্চ চালাচ্ছে। বুঝলে? মহাদেব মাথা নাড়িয়ে হ-হ করে। কিন্তু বুঝতে পারে না, এতবড় কোম্পানির মহাদেবের কাছে কী দরকার। সিগারেট টানতে ভুলে যায় মহাদেব।

গোপীবল্লভ বলে, আমি হলাম গে সেই কোম্পানির লোক। ক্যানভাসার। এজেন্ট। বোঝা না?

মহাদেব এবার অন্যরকমের মাথা নাড়ায়। মানে বোঝে নি।

গোপীবল্লভ বলে, তোমার একটা ছেলে আছে না। একটু কেমন খ্যাপা মতো।

মহাদেব বলে, খ্যাপা নয়, একটু বোকা মতন। আসলে খুব সরল পোকিতির।

কোম্পানিরে ছেলেটা দ্যাও। ছমাস বাদ ফিরে পাবা। সঙ্গে ট্যাকা। কাগজপত্র খোলে গোপীবল্লভ।

আমি যে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারতিছি না।

সব জলের মতো বুঝোয়ি দিচ্ছি, শোন। আমাদের কোম্পানির কিছু গুঁড়াগুঁড়ি দরকার। ছেলেপিলে। খাবে ভাল, থাকবে ভাল। এবার টার্ম আর কন্ডিশনগুলি শুনি নাও। আমাদের কোম্পানিই হল যে সাইন্টিফিক কোম্পানি। রিসার্চ চলতিছে, বোঝা না। যে ছেলেদের ওখানে নেয়া হবে, তার গার্জিয়ান ভরতি করি দিলেই প্রথমে নগদ পাঁচশ টাকা পাবে। ফাইব হানড্রেড। এবার ওই ছেলেদের সঙ্গে ইনজিকশন ফোঁড়া হবে। রিসার্চের ইনজিকশন। এক একটা ছেলের একেক সঙ্গে। কার কোন সঙ্গে ইনজিকশন ফোঁড়া হবে তা কোম্পানির সাইন্টিস্টরা ঠিক করবেন। ইনজিকশন কারোর কারোর সঙ্গে বড়পানা হয়ি যাতি পারে, বোঝা না, যদি বড়পানা হয়ি যায়, তবে ছ মাস পরে ছেলেসমেত পাবা পাঁচ হাজার। যদি কিছু না হয়, দুমাস পর্যন্ত ওরা দেখবে কাজ হচ্ছে কিনা। যদি কাজ না হয়, দুমাস পরে ছেলে ফিরে সঙ্গে এক হাজার টাকা।

মহাদেব বলে, ডেলি ডেলি ইনজিকশন ব্যথা লাগবে নি? গোপীবল্লভ সিগারেটে টুসকি মেরে ছাই ঝেড়ে বলে স্পেশাল ইনজিকশন যে। পিম্‌ডের কামডের চেয়িও কম ব্যথা। তোমার ভায়রার গায়ের অনেক ছেলেপিলে আমাদের এই ইন্সটিমে গিয়ে আবার ফিরে আসিছে। ওদের জিজ্ঞাসা করলি ডিটেল জানতি পারবা। সব্বাই গায়ের ওজন বাড়িয়ে ফিরি আসিছে। ওদের কাছে ইনকোয়ারি করি দেখবে ডানলোপিলো, মানে দুধির ফেনার মতো নরোম বিছানায় শুয়িছে, ভাল ভাল খায়িছে...

মহাদেব বলল, ওই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বললে, অঙ্গ বড় হলি ত খুঁতো হয়ি যাবানে, তার কী হবে?

তার আর হবেটা কী? তুমি ত আর মেয়েসন্তান পাঠাচ্ছ না যে একটা আঙুল ছোটবড় হয়ি গেলে খুঁতো হয়ি যাবানে, বে দিতি পারবা না। পাঠাচ্ছ ত ছেলি। সোনার আংটি আবার বাঁকা হয় নাকি। তা তোমার

ভায়রার ছেলেরও ত কানটা বড় হয়ে গেছে। তয়? কী হল? বরং হিল্লো হয়ে গেল এই বেকারির যুগে।

কি হিল্লো হল?

অ!শোন নি বুঝি! তোমার ভায়রা ত আমার কাছে কেঁদি-পেদি একসা। বলে ছেলে হারায় গেছে। আমি বললাম, অত নার্ভাস হবার নাই, আমি দেখছি। কদিন আগে স্বরূপনগরে এয়িচিল সার্কাস, বা ভেবিচি, ওখানে জোকোরের কাজে ওরে নিয়ে নেছে। তা বোঝ। এই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সি চাকরি জুটোয়ে নিল। কানটা বড় হল বলেই না পেল! তা এখানে বলে রাখি। কোনো থান্টি নেই। সবারই যে এমনধার। অঙ্গ বেড়ে যাবে তার কোনে থান্টি দিচ্ছে না কোম্পানি। আসলে ইটাই হল কোম্পানির রিসার্চ। একটা ইনজিকশন দিলে কারোর কারো অঙ্গ বড় হয়ে যাচ্ছে আবার ওই একই ইনজিকশনে কারুর কিছুই হচ্ছে না। কেন এমনধারা হয় এই হল রিসার্চ। ওসব বড় বড় ব্যাপার। বোঝবা না। এই যেমন ধরো চিংড়ি খেয়ে কারোর গায়ে চাকা চাকা ওঠে, কারুর-বা কিছুই হচ্ছে না। তা তোমার ছেলিটারে দ্যাও।

মহাদেব মাথা চুলকোয়। কিছু বলে না। একবার বলল, ধরো যদি ইদিক-সিদিক কিছু হয়ে যায়?

ইদিক-সিদিক মানে?

এই ভালমন্দ কিছু?

ও, সে কথাটা বলা হয় নি। কোম্পানি সব ব্যবস্থা রেখিচে। কিছু ত্রুটি করে নি। যদি রিসার্চ চলাকালীন একম্পার করে, মানে মরিটরি যায়, তবে লগদ দশ হাজার দিচ্ছে কোম্পানি। বাড়ি ফিরি আসার পর ওরকম কিছু হলি অবশ্য কোম্পানি দায়ি না। যদি...

থাক। থাক। ও কথা বলতি হবে না আর।

তবে কি করবা।

ভেবে দেখি। পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করি।

পরামর্শ তুমি কি করবে? সে আমি কয়ে দিছি। ডাকো তোমার পরিবার।

সে ত এখন ঘরে নাই। মুড়ি ভাজতি গেছে।

আচ্ছা। তবে ছেলিটারে নে এস, একটু দেখি।

সে বোধহয় ঘুমুচ্ছে। ও একটু ঘুময় বেশি।

বয়স কত হবানে একচুয়াল?

ধরো দশ চলচে।

নাম কি রেখিচো?

রেখিচিলাম ত গণেশ। কিন্তু ছেলোটা এটু বোকাসোকা ত, কথা পষ্ট বলে না, মুখ দে নাল গড়ায়, ওরে সবায় ডাকতি লাগল ক্যাবলা। এখন বলতি গেলে ওটাই নাম।

মিলিয়ি-দুলুয়ি নাম রাখিছিলে ত বেশ, মহাদেবের পুত্র গণেশ। তবে বুধবার আসি? মঙ্গলে উষা বুধে পা যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

নাগো, আর কদিন যাক। পরের মাসে এসো।



মহাদেবের ভায়রাভাই বিজয় হাজারার ঘর এমন কিছু বেশি দূর না। আট দশ কিলোমিটার হবে। কিন্তু কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা হয়, ভায়রা-ভায়রা দেখা হয় না। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই ওদের। বিজয়ের ছেলে ধনঞ্জয়ের কান বড় হবার কথা শুনেছে কিন্তু একবারও চোখের দেখা দেখতে যায় নি। এবার গেল। পরামর্শ আছে। বউকে নিল না। মহাদেব ত মাগের ভেড়ো নয়, যে সব বউয়ের কথামতো চলবে।

মহাদেবকে দেখে বিজয় হাজারারা বেজায় খুশি। স্বামীস্তিরিতে যত্ন আন্তি করল। মহাদেবকে মানি অর্ডারের কাগজ দেখাল। ধনঞ্জয় ডায়মণ্ড হারবার থেকে পাঠিয়েছে পঞ্চাশ টাকা। তারপর খবর কাগজের ছবি দেখাল। খামে করে পাঠিয়েছে ছেলে। ছেলের ছবি উঠেছে। মহাদেব পড়তে পারল ‘ডায়মণ্ড হারবার টাইমস’। ধনঞ্জয়ের মস্ত কানের উপর বসে আছে একটা টিয়া পাখি। কানের মধ্যে অনেক রিং সার সার আটকানো। একটা রিংয়ের সঙ্গে দড়ি বাঁধা, একটা বাঁদর দড়ি টানছে। মানে দোল খাওয়াচ্ছে। ধনঞ্জয় হাসছে। তলায় লেখা জুপিটার সার্কাসের একটি দৃশ্য।

ভালই ত আছে ধনঞ্জয়।

মহাদেব বলল, ধনার সঙ্গে ত দেখা হল না। অন্য দু-একটা ছেলেপিলে দেখাতি পার যারা ওই ইক্ষিমে গেছে। একটু তত্বতালাশ নিতাম।

বিজয় তখন মহাদেবকে নিয়ে চলল কাছেই একটা ঘরে। ঘরে নতুন টিন চকচকচ্ছে। বিজয় বলল, যদু ঘরামির ছেলের টাকায় নতুন টিন। মেয়ের বিয়েও দেছে। বিয়েতে সাইকেল টেপেরেকট দেছে। যদু ঘরামির গাজনের সন্নেসীর মতো খাংরাখাংরা চুল, মুখে দুশ্চিন্তা লেপে থুয়েছে।

যদু বলল, ভালই হল তুমি এয়িচ। তোমার কাছেই যাব মন করছিলাম। আমার ছেলেডারেও সার্কেসে টুইকে দাও। যদুর ছেলে এল। বছর বারোর হবে। ডানহাতের আঙ্গুলগুলো হাতখানেক লম্বা হয়ে পায়ের গোড়ালির কাছটা পর্যন্ত নেমেছে। একবার পিঠ চুলকোল ছেলেটা। আঙ্গুলগুলো সাপের বাচ্চার মতো কিলবিল করে উঠল।

যদু বলল, ছেলেডারে নিয়ি বড় ব্যামেলায় পড়িচি। পুলিশ খুব টর্চার মার করিল। মুখটা, এখনো কেমন ফুলি রয়েছে।

টর্চার মারিলো ক্যানো? কী দোষ?

আর বল ক্যানো। গোপীর কোম্পানি ছেলে ফিরৎ করিল তখন ত সব বড় বড়। যুধিষ্ঠির তখন পিছু লাগল।

যুধিষ্ঠির কেডা?

যুধিষ্ঠিরের নাম শোন নি? যুধো। চোরটা। ও বলিল তোরে আমার বড় দরকার। তোর আঙ্গুলগুলো এমন কায়দায় হয়িচে যে কোনো যন্তরের সাধ্য নেই এর ধারে যায়। যুধো ওরে ট্রেনিং দেল। ঘরের জানালার ভিতর দি হাত ঢুকোয়ে আঙ্গুলের কায়দায় জিনিসপত্তোর গ্যাড়াতি শিখাল। এর মধ্যে কবে তালবন্দীর এক মুরগির মাষ্টারের বউয়ের গলার হার আঙ্গুলের কায়দায় চুরি করতি যেয়ে বিপত্তি ঘটাল। মাষ্টার সেদিন বাড়ি ছিল নি। পাটি মিটিং করতি যেয়িছিল বারাসত। মাষ্টারের বউ গলায় সুড়সুড়ি পেয়ি সজাগ হল, আর দেখল মুখির উপর হাত আর লম্বা লম্বা আঙ্গুল কিলবিল করতিছে। সে ভাবল ভূত। তারপর অজ্ঞান। মাষ্টার পরদিন

পুলিসি খবর করল! পুলিস ত মোর বাপধনটারে ধরি নিয়ি প্যাদাল। ছেলে সব স্বীকার যেছে। যুধোরে কিছু করল নি। সে দিব্বি ঘুরি বেড়াচ্ছে। এখন পুলিস বলতেছে যদিও ওর আঙুল এরম পানা লম্বা থাকবে, মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে থানায় ট্যাক্সো দিতি হবে। আমিও যেছিলাম থানায়। বললাম, এত টাকা কোথেকে পাব। মেজাবাবু বললে, ক্যানো, এতগুলো টাকা পেলে যে, কোম্পানি দেল। বললাম, মেয়ে বে দেছি। বড়বাবু বললে, তাহলি কাটি ফ্যালো। তারপর খোঁজ করি এজেন্ট গোপীবল্লভেরে ধল্লাম। সে বলে, কাটিতি হয় হাসপাতালে কাটাও গে যাও। কোম্পানি বড় করি দিতি পারে। ছোট করার কুনো কনডিশন নাই।

যদু ঘরামি এবার বিজয় হাজরার কাছে প্রায় হাতজোড় করে। বলে, তোমার ছেলেডারে বলিকয়ি আমার ছেলেডারেও সার্কেসে চুইকে দ্যাও। ছেলেডার হিল্লৈ হয়ি যাক।

বিজয় বলল, ছেলের ত ঠিকানা জানতি পারি নি। আসবে নিশ্চয়। আমি বলবানে। আর একটা বাড়িতে মহাদেবকে নিয়ে গেল বিজয়। মহাদেবকে বলল, এ বাড়ির ছেলেটার খারাপ জায়গায় ইনজিকশন দেছে। বিজয় ডাকতেই ছেলেটা এল। বিচ্ছিরি ব্যাপার। ওটা ল্যাজের মতো লাগছে। মহাদেব ত অচেনা লোক, দেখেই ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর সৈঁধিয়ে গেল। বিজয় বলল, থাক। লজ্জা পাচ্ছে। এরকম আরো দু-একটা ইন্সকিমের ছেলেকে নিজের চোখে ইনিস্পেকশন করে ঘরে ফিরল ওরা।

বিজয়কে জিজ্ঞাসা করে মহাদেব -তুমি ভাই কি পরামর্শ দাও। ইন্সকিমে পাঠাব? বিজয় বলল, আমি ভাই কী বলব। নিজির পাঁঠা...

মহাদেব সিদ্ধান্ত নিল যা টাকা পাওয়া যাবে তার তুলনায় ফ্যাচাং এমন কিছু না। লম্বা হয়ে গেলে চোখে চোখে রাখলেই হবে যাতে যুধিষ্ঠিরদের পাল্লায় না পড়ে। আর তা ছাড়া তার ছেলে হল হাবাগোবা। যুধিষ্ঠিররা নেবেও না। আর অন্য কোনো অঙ্গ বর হয়ে গেলে সার্কাসে না হোক মেলায় দেখিয়ে দুপয়সা পাওয়া যাবে। সিঁদুর-টিদুর পরানো ছ-ঠ্যাংওলা গরু দেখেছে মেলায়। পঞ্চাশ পয়সা টিকিট কেটে দেখছে সব। গোপীবল্লভকে শুধু বলবে খারাপ জায়গাটায় যেন ইনজিকশন না দেয়, এটুকু যেন দেখে। মহাদেব আরো সিদ্ধান্ত নিল যে বউকে কিছুই বলবে না। বললে, বউ কিছুতেই ছেলেকে ছাড়বে না। হাবাগোবা যাই হোক না কেন, বহু আদরের ধন এই ক্যাবলা। ক্যাবলা হবার পর আর ছেলেপুলে হয় নি। হাসপাতালেও দেখিয়েছিল। বলে দিয়েছে নাড়িতে জট লেগে রয়েছে। অপারেশন কেস। ম্যালা টাকার ধাক্কা। এই স্কিমে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে অপারেশন করিয়ে নাড়ির জট ছাড়িয়ে নেবে। গোপীবল্লভ নিতে এলে বউকে বলবে কলকাতার বড় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে। ছ-মাস পর ভাল হয়ে ফিরে আসবে। আর গোপীবল্লভকে অনেক করে বুঝিয়ে বলবে-দেখো, খারাপ জায়গাটায় যেন ইনজিকশনটা...

সকাল থেকে মেঘ। বাতাস থম মেরে আছে। গাছের পাতা নড়ে না। বিবিধ ভারতী বাজে। মহাদেব ওর ছেলেকে আদর করছে সকাল থেকে। ওর মুখের লালো মহাদেবের সারা গায়ে লেপ্টেছে। বিবিধ ভারতী বাজে। ক্যাবলা হাতের আঙ্গুলগুলোয় আঁকড়ে ধরে আছে ট্রানজিস্টার। কদিন আগে কিনে এনেছে মহাদেব। ছেলে চলে যাবে। কদিন বাজাক। বড় শখ ছিল ছেলের।

মহাদেব ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, কিরে, ওখানে গিয়ে ভাল থাকবি ত বাবা?

ঠাকব।

আমাদের জন্য খুব ভাববি?

ভাবব।

ইনজেকশন দিলে ব্যথা লাগলে কাঁদিস না।

কাদব না।

আমাদের জন্য কাঁদবি না ত!

কাদব না।

চোখের জল ফেলবি?

ফেলব।

আসলে হাবাগোবা ছেলেটি ঠিক মতো বুঝতেই পারছে না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কী জন্য যাচ্ছে।

মহাদেবের বউ মুড়ির মোয়া বাঁধছে। গুড় মাখানো মুড়িতে নুন মাখানো জল পড়ছে। কাল থেকেই কাঁদছে ও। বিবিধ ভারতী বাজছে।

বাইরে ঘুঘু ডাকে। এমন ঘুঘু কি রোজই ডাকে? বাতাস থম্। একটা পাতা খসে গেল। ডম্‌ডম্‌ ডিগাডিগা। মায়া মমতা কষ্ট লেগে লেগে মুড়ির মোয়াগুলি গোলাকার হয়ে ওঠে ক্রমশ। একটা নিয়ে ক্যাবলার হাতে দেয়। বলে, হাসপাতালে খিদে পেলেই চেয়ি-চিস্তি খাস বাপ আমার। ক্যাবলা বলে, না - চাইব না।

আসলে ঘরে বড্ড খাইখাই করে বলে বকুনি খায় ও। ও পেট ভরতেও ঠিক বোঝে না। বমি করে ফেলে। তখন মারও খায়। আর 'চেয়ে চেয়ে খাবি' বললেই বলে আর চাইব না।

ক্যাবলার মা ক্যাবলার সারা গায়ে হাত বুলতে থাকে। বলে কিছু দুঃখ করিস নি বাপ আমার। ভাল হয়ি ফিরবি। ইস্কুলি ভরতি হবি। হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে এমনি ধারা আরো অনেক কথা থাকে যা ক্যাবলার সারা শরীরে মিশে যায়।

ভগবান, আজ যেন গোপীবল্লভ না আসে।

গোপীবল্লভ আসে। বলে বস রেডি ত? মহাদেব 'রোসো, আর দশ মিনিট' শব্দ কটা উচ্চারণ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। ছেলেকে নতুন জামাপ্যান্ট পরানো হয়েছে। পলিথিনের ঠোঙায় নারকোল নাড়ু, মুড়ির মোয়া।

গোপীবল্লভ বলে, এসব কিছু দরকার নেই। কোম্পানি বাইরের ফুড অ্যালাউ করবে না। ওরাই যথেষ্ট ফুড দিয়ি থাকে। গণেশের মা বলে, তবু থাক। ভালবাসে।

ক্যাবলার সঙ্গে ক্যাবলার মাকে নিচ্ছে না মহাদেব। মহাদেব যাচ্ছে। ক্যাবলা ট্রানজিস্টারটা ছাড়ছে না। শব্দ করে আঁকড়ে রেখেছে। ক্যাবলার মা ক্যাবলার কড়ে আঙুল কামড়ে দেয়। মাথার আঘাণ নেয়। আর একবার সর্বশরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরে। আই অ্যাম এ কমপ্ল্যান বয়।

সেই বিরাট বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে গোপীবল্লভ বলল, দ্যাখ, এই বাড়ি। ঘাড় উঁচু করে মহাদেব দেখল বাড়ি কি ভাবে আকাশ ছুঁয়েছে। গোপীবল্লভ বলল, এই বিল্ডিংটার চোদ্দ আর পনের তলায় হল আমাদের কোম্পানি। কি যে কাণ্ডকারখানা চলতেছে কোনো ধারণা করতি পারবা না। কত রিসার্চ, এক্সপিরিমেন্ট। এমন যে নিমফল-বীজ, তার পোণ্ডায় ইনজিকশন মারি দেচ্ছে, সেই বীজ পুঁতলি যে নিমগাছ হবে তার পাতার হবে মিষ্টি সোয়াদ। এইসব চলতিছে। ছাইন্স যে কোথায় গিয়ে ঠেকিছে তোমরা বোঝবা না। ওরা লিফ্ট-এর

ভিতর ঢুকল, দরজা বন্ধ হল নিজে নিজে। এই প্রথম ভয় পেল ক্যাবলা। কেঁদে উঠল। চোদ্দ তলায় একটা ফুল নকশাকাটা দরজা ঠেললেই ঠাণ্ডা। টেবিলের ওপাশে সুন্দরী মেয়েছেলে। মেয়েছেলের সামনে চেয়ার। গোপীবল্লভ বলল, তোমরা এখানে বোসো। নরমের ভিতরে ডুবে যায় মহাদেব। মহাদেবের কোলে গণেশ। অন্য একজন ছোটচুল সুন্দরী আসে। সামনে মেলে ধরে রঙিন কাগজ। ‘সই করবেন, না টিপ?’ কাপা কাপা সই করে মহাদেব হাজরা। আর একবার চুমো খায় ওর ক্যাবলা গণেশকে। ওর লালা লাগে মুখে। মেয়েটি মহাদেবের হাতে পাঁচটি একশ টাকার নোট দিয়ে মুচকি হাসে। তারপর মহাদেবের কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে যায়। অন্য একটা ফুল নকশাকাটা দরজা ঢেকে দেয় ওদের। গোপীবল্লভ মহাদেবের কানে কানে বলে, মন খারাপ কোরো না। তোমার কোনো লস্ নেই, উল্টি লাভ। কীই-বা করতে তোমার হাবাগোবা ছেলেডারে নিয়ি? যা হোক ওই পাঁশশো থেকে আমারে গোটা পঞ্চাশ দ্যাও। মহাদেব বাড়ি ফেরে। হাতের কজিতে ধর্মতলা থেকে কেনা সত্তর টাকায় ইলেক্ট্রনিক্স ঘড়ি।

এরপর আকাশে আরো ইনসট উঠে যায়। ক্রয়োজেনিক রকেট ইঞ্জিনের নো হাউ জেনে যায় ভারতবর্ষ, কর্ডলেস টেলিফোনের উৎপাদন বাড়ে। ছয় ডিজিটের টেলিফোন নম্বর সাত ডিজিটের হয়। অনেক স্ত্রী ভ্রণ নষ্ট হয়, অরণ্য ধ্বংস হয়, গৃহবধু পোড়ে, ক্যাবলা ফিরে আসে।

ওর নাকটা লম্বা হয়ে নাভির কাছটাতে এসে পড়েছে। একটু একটু নাড়াতেও পারে। গুঁড়ের মতোই লাগে। ওর কানদুটোও বড় বড় করে দেয়া হয়েছে। ওর শরীর নাকি দারুণ সেনসেটিভ। নাকের উপর কয়েকটা ইনজেকশন দেয়ার পরই নাকটা তাড়াতাড়ি বাড়তে শুরু করেছিল। এটা একটা রেয়ার কেস। নাককে নাকি সহজে বাড়ানো যায় না। এর আগে আফ্রিকায় মাত্র একটি কেস সম্ভব হয়েছে। নাকের পর কানেও ইনজেকশন অ্যাপ্লাই করা হয়। এজন্য কিছু বেশি টাকা পার্টিকে দিয়েছে কোম্পানি। ক্যাবলার গা থেকে অনেকবার রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করেছে কোম্পানি। কী আছে ওই রক্তে। কেন এত তাড়াতাড়ি সাড়া দিচ্ছে। ওই পরীক্ষার ফল পার্টি জানে না। ক্যাবলার মাথার ভিতর থেকে নিউরোন সেল নিয়ে পরীক্ষা করেছে কোম্পানি। ওই পরীক্ষার ফল পার্টি জানে না। ওকে নানা রকমের ইনজেকশন দেয়া হয়েছে ওর শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। কী ইনজেকশন, কী হরমোন কিংবা স্টেরয়েড বা অন্য কিছু পার্টি জানে না। শুধু পার্টির স্কিম ম্যাচুয়োর করে। পার্টি প্রজেক্ট থেকে ফিরে আসে লম্বা নাক আর দুটো বড় বড় কান নিয়ে।

গোপীবল্লভ বলে, গণেশ নামটা এত দিনে সার্থক হল। একেবারে রিয়েল গণেশ করে দিয়েছে কোম্পানি। গণেশের বাপ মহাদেব। মায়ের নামটা দুর্গা করি দিলিই একেবারে ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যায়। তোমাদের কাঁঠালগাছে সাইনবোর্ড মারি দেবা—কৈলাশ।

ছোটবেলার মহাদেবের বাবা মহাদেবকে সঙ সাজাতো। মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, ঝুঁটিতে পালক গুঁজে, মুখে নীল রঙ করে হাতে বাঁশি লাগিয়ে কেঁট ঠাকুর কিংবা গায়ে ছাই মাখিয়ে মাথায় জটা বেঁধে মহাদেব। মহাদেব হলে চোখ বড় বড় করতে হত আর কেঁট হলে চোখ তুলুতুলু করতে হত। লোকের দুয়ারে গেলে পয়সা মিলতো, চাল-ডাল সিধে মিলতে। এখন মহাদেব ভাবে এই সত্যিকারের গণেশকে যদি সাইকেল রিক্সার সিটে বসিয়ে হাটে নেয়া যায়, কেমন হয়।

গণেশের পেটটাও আগের চেয়ে একটু বড় হয়েছে। মহাদেব ভাবে কোম্পানিতে ভাল খাওয়া-দাওয়া পেয়ে এমনটা হয়েছে। গায়ের লোকজন দেখতে আসে। বলে, একেবারে জ্যাস্ত গণেশ গো। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেব দ্যাখে মাদুরের উপর কিছু খুচরো পয়সা ছিটিয়ে আছে। গুনে দেখে টাকা খানিক হবে।

পাশের গাঁ থেকে জীবনের মা, ভামিনীবুড়ি লাঠি ঠকঠক করতে করতে আসে। এসে বিহ্বল তাকিয়ে থাকে। বলে সত্যিকারের ভগমান দেখনুগো। আঁচলের গিট খুলে একটা আধুলি বের করে গণেশের পায়ের কাছে রাখে।

গণেশ বলে, জিলিপি খাব।

বুড়ি বলে, হ্যাঁ-ত্যা, লিচ্চয়। লিচ্চয় আমি জিলিপি ভোগ দেবো। বুড়ি লাঠি ঠকঠক করতে করতে বেরিয়ে যায়। গোটা চারেক জিলিপি নিয়ে আবার আসে। গণেশের পায়ের সামনে রাখে। নীল মাছি উড়ে আসে। গণেশের নাকের তলায় দুটি শাশ্বত ফুটো। ফুটোসমেত নাকের ডগাটা জিলিপির সামনে উপর নাড়ায়। শ্বাস ছাড়ে। মাছি উড়ে যায়। এবার শ্বাস নেয়, গন্ধ শোঁকে। গণেশ হাসে। একঘর লোক দেখে। বুড়ি বলে, কিরপা কর বাবা গণেশ। আর পারতেছি না। জীবনের বউটা খাতি দেয় না। বড় জ্বালাতন করে। কেবল গাল মন্দ করে। উদ্ধার কর।

গণেশ মাথা নাড়ে আর জিলিপি খায়। পরদিন ভোরবেলা কলমি শাক তুলতে গিয়েছিল জীবনের বউ। সাপে কাটল ওকে। তাই শুনেই ভামিনীবুড়ি মাথা চাপড়াতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, হায়রে হায়। বাবা গণেশ তুমি এমন জাগ্রত বুঝতি পারিনি গো। আমি ভোকলা বুড়ি, আমার কথাই শুনলে। জীবনের এখন কী হবে। গাঁয়ের লোক জীবনের বউকে ভ্যানগাড়িতে শুইয়ে হাসপাতালের দিকে যায়। ভামিনীবুড়ি মাথা কুটে বলে, একবারটি মহাদেব হাজরার ঘরে নে চল ওরে, দোহাই বাপাদের।

আশেপাশে ওঝাবদ্যি নেই। যে ওঝাটি ছিল মরে গেছে। তার ছেলে বিডিও অফিসের পিওন। সে কিছু কিছু বশীকরণ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম করে অবশ্য। কিন্তু তাকে তেমন বিশ্বাস নেই। হাসপাতালের দিকেই চলল ওরা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আট কিলোমিটার। অনেকটা সময় লাগবে। বুড়ির কথায় কেউ কান দেয় না। বুড়ি সাইকেলভ্যানের সামনে শুয়ে পড়ে। বলে, আমার মাথা খা। বউডারে বাঁচাতে চাস ত গণেশের কাছে নে চল।

মহাদেবদের পাড়া হাসপাতালের পথেই পড়ে। জীবনের বউ ভ্যানে শুয়ে আছে। জ্ঞান আছে। ভ্যানের কোণে ভামিনীবুড়ি বাবা গণেশ বাবা গণেশ করতে থাকে। মহাদেবের উঠনে ভ্যান থামে।

ভামিনীবুড়ি ভ্যান থেকে নেমে বলে, বাবা গণেশ, একবারটি দেখা দাও। আগের দিন ঝা কয়েচি অলাষ্য কয়েচি। মাথার ঠিক ছিল না বাবা। এখন তোমার ঠেয়ে এনিচি। ওরে কিরপা কর।

গণেশ তখন হাগতে গিয়েছিল। এত লোক দেখে পাগুবজবা গাছটার তলে দাঁড়িয়ে পড়ে। গণেশের মা তাড়াতাড়ি জলের কাজ করিয়ে দিয়ে প্যান্ট পরিয়ে দেয়। গণেশের কপালে গেরিমাটির তিলক। শুঁড়ে একটা লাল ফিতে জড়ানো। গণেশের মা তাড়াতাড়ি পাগুবজবা গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে লাল ফিতের মধ্যে গুঁজে দেয়। গণেশ আসছে হেলতে দুলতে। শুঁড়টা একবার নাড়াল। একটু ওঠাল। ও বোধহয় ভামিনীবুড়িকে

চিনতে পেরেছে। জিলিপি ভোগ দেয়া বুড়ি। বুড়ি গণেশের সামনে শুয়ে পড়ে ভুয়ে। বলে বউডারে বাঁচয়ি  
দ্যাও বাবা, বরং আমারে পার কর।

গণেশ এদিক চায়, ওদিক চায়। কারুর হাতে কোন শালপাতার ঠোঙা নেই। গণেশ ঘরের দিকে মুখ  
ফেরায়। বুড়ি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। গণেশ কি ভেবে বুড়ির দিকে চায়। বুড়ি বলে, কিরপা হবে ত  
বাবা!

গণেশ বলে, কিপা হবে।

বুড়ি বলে, একবারে বউডারে স্পর্শ করি দ্যাও ঠাকুর। গণেশ আস্তে আস্তে বউটার গলায় হাত দেয়।  
লকেটের ঝুটো পাথরের লাল চিকচিক দেখে। কে একজন ভ্যানরিকশার ঘণ্টি বাজিয়ে দেয় টিরিং।

মাইল দুয়েক পরেই কৈবর্তহাট। ওখানে মাইক। আলুর চপ ভাজার গন্ধ। জীবনের বউ উঠে বসে। বলে,  
চা খাব।

চা খেয়ে অবশ্য হাসপাতালে যায়। ডাক্তার বলে, সাপে বিষ ছিল না তেমন, তবু যাহোক ইনজেকশন  
দেয়।

জীবন আর জীবনের বউ মুরগি নিয়ে আসে মহাদেব হাজারার বাড়ি। বলে, গণেশকে পূজো দোবো।  
এরপর লোকজন আসতে থাকে। পরীক্ষায় পাস, আই আর ডি পি বা জওহর রোজগার যোজনার কাজ,  
বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভ, শূল বেদনার উপশম, স্বামীর সংসারে সুমতি, এইসব কামনাবাসনা বয়ে নিয়ে  
লোকজন আসে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা পাড়ার ছাগলে এসে অনেক ফুল খায়, শালপাতা খায়।

ইতিমধ্যে একদিন নতুন পাম্পশু জুতোয় মচমচ শব্দ করতে করতে গোপীবল্লভ এল। বলল, কোম্পানির  
আফটার সেল সার্ভিস বলে একটা ব্যাপার আছে। দেকতি এলাম। শুনলাম তোমাদের দিন ফিরি গেছে।

মহাদেব হাত কচলায়।

গোপীবল্লভ গণেশের কাছে গিয়ে বলে, কি গণেশ, কেমন আছ?

গণেশ চোখ পিটপিট করে।

বল, কেমন আছ, ভাল না?

গণেশ মাথা নাড়ে। বলে, না।

কেন? ভাল নেই কেন?

আমাল অচুক।

কে বলল, অসুখ? তোমার সুখ। তুমি এখন জ্যান্ত গণেশ। ভগবান। শোন বলি। কেউ যদি তোমার কাছে  
আসে, তুমি ডানহাতখানা সামনে ধরবা। আঙ্গুলগুলি এই এমনি করি জোড়া রাখবা। যেন ভোটের হাত চিন্ন।  
এটা বরাভয় মুদ্রা। কি মহাদেব, এসব শিখোয়ি দেবা ত। আর শোন গণেশ। এই বরাভয় মুদ্রা পাইকিরি  
সবারে দেখাবা না। যারে মনে হবে তারে দেখাবা। নইলে ওজন থাকবে না।

মহাদেবের বউ চা করে আনে। চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট, চানাচুর।

মহাদেবের বউ ঘোমটার ভিতর থেকে বলে-আমার ক্যাবলার মধ্য সত্যিসত্যিই গণেশের অংশ আছে।  
নইলে ঠিক ঠিক গণেশ পানা হতিছে কেন? পেটটা বড় হতিছে। ঝা বলতেছে তাই হচ্ছে। রোগব্যাদি ভাল

হচ্ছে। লোকের মনস্কামনা পূরণ হতিছে। আমাদেরও ঘরদুয়ার হল। ওর মধ্যে যদি গণেশ নাই থাকবে, মনস্কামনা পুরে কেন? গোপীবল্লভ হাসে। বলে, গণেশের মধ্যে গণেশ যদি আসি গেছে মনে করো, ভাল কথা। ও, ভাল কথা, শোনলাম অনেকে নাকি মুরগি নে আসে? গণেশের পূজায় মুরগি পেসাদ কোথাও শুনিচ? এসব ছোটলোকদের প্রাকটিশ। শুধু ফল-ফলাদি। নিরামিষ। বোঝা না?

মহাদেব মাথা নাড়ে। গোপীবল্লভ বলে, আমাদেরও একটু স্মরণে রেখ। আমার জন্যই ত এইসব। আমিই ত গণেশ বানালাম। একেবারে বঞ্চিত করো না। বোঝা না? আমিও গণেশের কৃপাপ্রার্থী একজন।

জোরে জোরে হাসে গোপীবল্লভ। মহাদেব বলে, হাসির কথা নয় বল্লভ। এই ধর না কেন আমার নাম মহাদেব। ছেলের নাম রাখিলাম গণেশ। এরপর যে ও সত্যি সত্যি গণেশ হয়ে গেল, এখানে ভগবানের কোনো ইচ্ছা ছিল কিনা কে বলতি পারে?

বল্লভ বলে, ভগবান নয়, সবই কোম্পানির ইচ্ছা।

পঞ্চায়েতের ভোট এসে গেল। পাশের ব্লকের এক প্রার্থী এসে পূজো দিয়ে গেল। জিতল সে। গণেশের ঘরে ভিড় বাড়ল।

এখন আর রোজ রোজ গণেশের দেখা পাওয়া যায় না। সপ্তাহে দুবার। সোম আর বুধ। এখন মোকদ্দমায় জয়লাভ বা ব্যাঙ্ক-লোন প্রাপ্তির জন্যও লোকে আসছে। মোপেড মোটরসাইকেলে চড়া লোক আসছে, পকেটে ক্যালকুলেটর নিয়ে লোক আসছে, হাতের কবজিতে ইলেকট্রনিক ঘড়িসমেত হাতজোড় করছে।

গণেশ এখন দর্শন দেবার সময় হাফপ্যান্ট পরে না। সিন্কেস রঙিন ধুতি পরানো হয় ওকে। অর্ডার দিয়ে বানানো কাঠের সিংহাসনে সে বসে। বেশ মানায় ওকে। পেটটা আরো বড় হয়েছে ওর। মহাদেব একটা টেপ রেকর্ড কিনেছে। পঙ্কজ উধাস, অনুপ জালোটার ভজন, সঙ্গে কুমার শানু-মহম্মদ আজিজ।

মহাদেবের বউ আগে অন্যের বাড়ি ধান সেদ্ধ করতে গিয়ে বা মুড়ি ভাজতে গিয়ে দাওয়ায় বসা গিন্নিদের গল্পোসল্পো উঠানে বসে শুনত। এখন মহাদেব-গিন্নি মুড়ি ভাজতে বা ধান সেদ্ধ করতে যায় না। তত্ত্বতাল্লাশ নিতে যায়। ও এখন বসতে পায়। কার স্বামী কী খেতে ভালবাসে, ডালের বড়া না হলে কার স্বামী খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়, এসব শোনে। কার স্বামীর রোজই চাই, নইলে ঘুম হয় না, শোনে। কার ননদের শহরে বিয়ে হয়েছে, খাট-আলমারি-ফিরিজ দেয়া হয়েছে, কার বোনের বিয়েতে সমস্ত ইন্সটিলের বাসন, প্রেসার কুকার, মশালাবাটার মেশিন, কার ভাসুর-ঝির বিয়েতে টিভি-সোফা-টেলিফোন...

-এ্যাই, এটা ভাই মিছ? টেলিফোন কেনা যায় না।

-কে বলল যায় না। আমি নিজে দেখলাম। মাইরি বলছি।

-আবার মিছ? আমার দেওরের বারাসাতে কাপড়ের দোকান, সে কিনা পাচ্ছে না টেলিফোন। কাঁড়ি পয়সা তার। টাকা দিয়ি কেনা যেত যদি, কবে কিনত।

গণেশের মা এসব শোনে। ওরও কথা বলতে ইচ্ছা করে। গণেশের স্কিমের টাকায় ঘরে টিন হয়েছে, বাকি টাকা ব্যাঙ্কে। গণেশের দক্ষিণার টাকায় টেপ রেকর্ড, গদিখাট, আলমারি, ঘর পাকা, লাল সিমেন্ট। ওর যদি মেয়ে হত, ও তবে দিতে পারত, বলতে পারত ওরকম আঠের ভরি সোনা, খাট-আলমারি-ফোঁস কুকার...।

কিন্তু নাড়ির জট খোলাবার জন্য হাসপাতালে যাবার সময় হয় না ওর। ও হাসপাতালে ভরতি হয়ে গেলে ভক্ত সামাল দেবে কে?

বারাসাত থেকে লাল শালুতে লিখিয়ে আনা হয়েছে ওঁ গণেশায় নমঃ। প্রতি সোম আর বুধবারটা মহাদেব বড় ব্যস্ত। ক্যালেন্ডারের এক-দুই-তিন-চার কেটে কেটে পিছনে পিস্‌বোর্ডের টুকরোয় আঠা দিয়ে সেটে কুপন করেছে। আগে এলে আগে নম্বর পাবে। কোনো নির্দিষ্ট দক্ষিণা রাখে নি মহাদেব। যে খুশি হয়ে যা দেয়। সবাই জানে এটা ইনজেকশন মারা শুড়। তবু আসে। এমনকি গাঁয়ের অন্য যাদের কান বড় ঠোট বড় হাত বড়, তারাও আসে। মহাদেবরা ভাবে সত্যিই ওর মধ্যে গণেশের অংশ আছে। মহাদেব ফিল্টার সিগারেট খায়। আজকাল মাটি কোপালে গা ব্যথা করে। সারিডন-টারিডন খেলে ব্যথা কমে।

একদিন রাতে গণেশ বলে, আজ কি বার!

কেন বাবা, রবিবার।

কাল ছোমবার?

হ্যাঁ বাবা।

গণেশ কাঁদতে থাকে। ওর চোখের জল শুঁড় বেয়ে পড়ে। বলে কালকে আমি গণেছ হব নি।

কেন বাবা?

না। গণেছ না। আমি ক্যাবলা হব আবার।

তা কি আর হয়? ওকে বলে কয়ে, শেষটায় জোর করে সিংহাসনে বসানো হয়। ও বেশি কথাবার্তা বলে না। কাউকে বরাভয় দেখায় না। জিলিপি, সন্দেশ কিছুই খায় না।

বুধবারও তাই করল।

ও আগে ওর শরীরে যা কুলতো সেইমত পাড়ার ছেলোপিলেদের সঙ্গে একটু-আধটু খেলত-টেলত। ও গণেশ হবার পর তা বন্ধ। ভগবান কখনো মানুষের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতে পারে না। গণেশ আজকাল নতুন বসানো জানালার দরজা ফাঁক করে বাইরের মাঠ দেখে। ছেলেদের দৌড়ঝাঁপ দেখে। নতুন বসানো লোহা শিকের শীতলতা লাগে ওর মুখে, কানে, শুঁড়ে।

নাপিতকে দিয়ে ওর বিশাল কানের লতিতে ফুটে করিয়ে ওখানে পরানো হয়েছিল দুলা। তখন গণেশ কেঁদেছে। ওর কানে সাদা পাথর চকচকায়। ওর শুঁড়ে উষ্ণি করানো হয়েছিল। উষ্ণির সূঁচ ফুটেছিল, গণেশ কেঁদেছে। আর এখন ওর সামনে কমলালেবু আপেল সন্দেশ। আর জানালার শিকের বাইরে মাঠের সবুজে বাচ্চারা খেলছে। গণেশ কাঁদে।

বিজয় হাজরা আসে। সঙ্গে ধনঞ্জয়। ওর বড় কানটা ছেঁড়া ফাটা। বর্ষার দরুন সার্কাস বন্ধ। ধনঞ্জয় আর গণেশ মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কোনো কথা বলে না। পরের বুধবার গণেশকে জোর করেই বসানো হল লাল ভেলভেট মোড়া ডানলোপিলোর কুশন বসানো সিংহাসনে। বাবা, বসো বাবা! ঝা চাইবি দেবানে।

মুখে শ্বেতি-দাগ ষোল বছরের মেয়েকে নিয়ে এসেছে ওর মা। হাত জোড় করে বলছে আমার মেয়ের শাদা দাগ ভাল করে দাও বাবা গণেশ।



গণেশ চিৎকার করে বলে, আলুও দাগ হয়ি যাক।

একজন সম্ভ্রান্ত চাষি, হাতে ঘড়ি, গায়ে টেরিকট, খবর কাগজের ব্যাক্সের বিজ্ঞাপনে আমরা সর্বদা চাষিভাইদের সেবায় আছি লেখার সঙ্গে ট্রাক্টরের পাশে যে চাষির মুখ থাকে, সেরকম একজন চাষিবাবু এসে বলে, বাবা গণেশ, গত বছর পাঁচ বিঘের আলু ধসা রোগে...

গণেশ ঘাড় কাত করে বলে, আমি গণেছ না, ক্যাবলা। মহাদেব বলল, এঁদের সব নানারকমের লীলাখেলা। গণেশ তখন টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে টগরফুলের মালা। জরির ফিতে। সিংহাসন থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। শুঁড় বেয়ে মুখের লালা নেমে আসে গোলাপি রেশমে।

আরো সোমবার আসে, বুধবার আসে। সিংহাসনের দারু-কারুকাজে ছোট মাকড়শা নিজস্ব কারুকাজ শুরু করে। মেঘের ফাঁক দিয়ে নেমে আসা রোদ্দুর কারুকাজ করে নিজের পাতায়, জলের ঢেউয়ে, গণেশ দেয়ালের চুনবালিতে নখচিহ্ন এঁকে এঁকে কী যে... বলতে চায়...

গণেশের শুঁড়ের ডগাটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ও ব্যথার কথা জানায়। কাঁদে।

মহাদেব বলে, কিছু কি কামড়েছিল? ভোমরা-টোমরা, ডাঁস-ডোমা। গণেশ মাথা নাড়ে। মহাদেব বলে নিগ্ঘাত কিছু কামড়েছিল। ভাল হয়ি যাবি। গণেশের মা সরষের তেল বুলিয়ে দেয়। বলে তাড়াতাড়ি ভাল হ বাবা। কিন্তু গণেশ ভাল হয় না। একদিন ধুম জ্বরে বলে, আমার ছুড় কেটি দ্যাও বাবা। আমি আবার আমি হব। খেলব, মাঠে যাব।

গণেশের শুঁড়ের ফোলা জায়গাটা অনেকটা বেড়ে গেছে। একটা মাংস পিণ্ড জেগে উঠেছে। গণেশ রোগা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কিছু খেতে চাইছে না। পেটটা ফুলে উঠছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের কপাল কুঁচকে ওঠে। বলে কলকাতা নিয়ে যান। ভাল ঠেকছে না।

গণেশের মা ভাবে তবে কি গণেশের মধ্যে সত্যিই গণেশ নেই। গণেশ কেন ওর নিজের রোগ ভাল করতে পারছে না? গণেশের মা একটা মাটির গণেশ কিনে নিয়ে আসে। জ্যাস্ত গণেশের সামনে মাটির গণেশকে বসিয়ে দিয়ে বলে, পাখনা কর বাবা, ভাল হয়ি যাবি। গণেশ মাটির মূর্তি ফেলে দেয় দূরে। মাটির গণেশের শুড় ভেঙে গেলে মাংসের গণেশ সেই মুখ দেখে। স্মিত হাসে।

একদিন গণেশের শুঁড়ে জেগে ওঠা মাংসপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরে; পুঁজ রক্ত ঝরে। কোথা থেকে এসে যায় নীল মাছি। মহাদেব ডাক্তার ডাকে। ডাক্তার বলে, কেটে ফেলতে হবে। গণেশ যেন খুশি হয়। বলে, তা হলি আমি আবার আমি হয়ি যাব।

মহাদেব গোপীবল্লভের কাছে যায়। বলে, কোম্পানিতে বলে শুঁড়টা কাটিয়ে দিতে। গোপীবল্লভ বলে, কন্ট্রাক্টে নেই। কোম্পানি ছোট করে না। শুধু বড় করে দেয়।

তারপর গণেশ মরে যায়। গণেশের নাকের ডগার গলিত মাংসপিণ্ডের মধ্যে দুটি গর্তের হু-হু শূন্যতার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে। একটি বালকের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো কিছু একটা ধরবে বলে কিলবিল করতে করতে ক্রমশ স্থির হয়ে যায়। চলে আসে নীল মাছি।

কোথা থেকে খবর পেয়ে চলে আসে ফটোগ্রাফার দল, বাণিজ্যিক টিভির। তোয়ালেতে ঘাম মুছে বলে, দেরি হয়ে গেল। তিন পায়ের উপর দাঁড়ায় ভিডিও ক্যামেরা-জাপান নির্মিত। ওয়াইড এঙ্গেল, জুম-টেলি

ইত্যাডি সহযোগে রঙিন ছবি রকমারি ইনসার্ট যোগে চলে যাবে মানচিত্রের লাল-নীল-সবুজ-হলুদ নানা দেশে। শ্মশান-বন্ধুরা মরা গণেশের, গণশার, ক্যাবলার মৃতদেহ ছেড়ে ঘিরে ধরে দেখছে ক্যামেরা যন্ত্র। দেখছে, যন্ত্রের মানুষ।

এ সময়ে কিভাবে ছুটে এল ধনঞ্জয়। ধনা। ওর বড় কানটার এখানে ওখানে অনেক গর্ত। এখানে ওখানে অনেক ছেঁড়া ফাটা। সে গণেশের মৃতদেহটার উপর উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে।

ছবি উঠছে এখন। ছবি উঠছে।

## মানুষ ও বেগুন

কামিনীফুলের গন্ধ মাখানো বাতাসে প্রফুল্লবাবু বেগুনি ভাজার গন্ধও পেলেন। অল্প বৃষ্টির পর ঝিলিকমারা রোদ্দুর। স্টিলের ব্রাইটনেস বিষয়ক একটা সেমিনার সেরে দুর্গাপুর থেকে কলকাতা ফেরার পথে বৃদ্ধ নামের এই গাঙ্গে একটু টি-ব্রেক। প্রফুল্লবাবু তো আসলে ডক্টর রায়চৌধুরী। প্রফেসর মেটালার্জি। বেগুনি-গন্ধে স্যালাইভেশন হতে থাকলেও উনি রায়চৌধুরীই।

বিস্কুট নেব স্যার? ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

না থাক। চায়ে চিনি দিতে না করো।

পেয়াজ কুচি ছড়ানো হলুদ হলুদ মটর সেদ্ধর স্তূপে চূড়া হয়ে আছে লাল টুকটুকে চকচকে পাকা লঙ্কা। গাড়ির বনেটে একটা ছোট পাখি এসে বসল। ফিঙে? ফিঙে কি এত ছোট? তবে কি বাবুই? টুনটুনি? ওদিকে বেগুনিগুলো ফুলে ফুলে উঠে তেলের মধ্যে ছোটোছুটি লাগিয়েছে যেন বাচ্চাদের ইস্কুলের টিফিনবেলা। আঃ কী গন্ধ। ঝাকরি হাতায় করে বুড়ির মধ্যে বেগুনিগুলো রাখল।

নগেন, দুটো নাও তো।

কী স্যার?

চোখ ছোট ছোট করে অল্প আওয়াজে প্রফুল্লবাবু বললেন, বেগুনি।

সে কী স্যার? বেগুনি খাবেন?

ইচ্ছে করছে। তুমি খাবে নগেন?

না স্যার, অ্যাসিড হয়।

প্রফুল্লবাবু বেগুনিটা দাঁতে মৃদু কামড়ে ভিতরের ঐ নরমে ফুঁ দিলে অতীত থেকে সেই অদ্ভুত গন্ধটা ভেসে আসে। ভীষণ আনন্দ হয়। জুল জুল করে বেগুনিটাকে দেখেন! আর তখনই লক্ষ করেন কী চকচকে শরীর।

এত চকচকে কেন হয় কেন? বেসন তো প্রোটিন-কারবোহাইড্রেট, আর তেল তো ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার। তবু কেন এত উজ্জ্বল? ঠাণ্ডা হলে এই উজ্জ্বলতা, এই লাশ্চার আর থাকে না। মৃত মানুষেরও না। বেগুনির কি প্রাণ আছে? প্রাণের বুঝি লাশ্চার থাকে? বার্নিশ থাকে? কিসের বার্নিশ ঐ মটর স্তূপে উঁচিয়ে ওঠা লঙ্কাটার গায়ে? একটু আগে গাড়ির বনেটে বসা পাখিটার পালক থেকে আলো ঝলকেছিল কিসের কারণে? সেটা কোন সারফেস কভারিং? পলিমার? পলিমার অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস্? ক্যারোটিনায়ডস্ নাকি স্ট্রেফ ওয়াক্স?

ছোটখাটো বাজার বসেছে। ছাপছাপ জামা, মুখে ছুলির দাগ, লালচে চুল, একটা ছেলে একটা লাল শার্ট কিনল, শার্টের গায়ে লেখা ব্লু ব্লাড।

এই বুঝি সেই কামিনীগাছটা? যার ফুল-সুবাসে বাতাস এমন ভারী। অ্যারোমা? কামিনীডালে বুলিয়ে রেখেছে ব্রা! উড়ছে। মাটির হাঁড়ি, কলসি। কতদিন মাটির কলসির জল খাননি পি.সি.আর.সি।

পোড়ামাটির ঐ মৃদু গন্ধটা জলের গভীরে গিয়ে মেশে। পোড়া মাটিতে অক্সাইড। ফেরাস আর ফেরিক। সেই গন্ধ। কালো কুচকুচে মেয়েটা বিক্রি করছে বেগুন। মেয়েটার গাটা শাইনিং, যেন বার্নিশ মেখেছে। মিসেস তো কত কী মাখেন। মেয়ে কুস্তলা। কত শিশি, কত কৌটো, কত টিউব। ডঃ রায়চৌধুরী মেয়েটার সামনে যান। সাঁওতাল? ঝলমল মেয়েটার বডি। মেয়েটা বিক্রি করছে বেগুন। ড্রাইভার হর্ন দেয়। একটা বেগুন হাতে তুলে নেন উনি। মুঠোর মধ্যে রেখে মৃদু চাপ দেন। কী নরম। কী তাজা। কী মসৃণ চক চক করছে।

কত করে মেয়ে?

এক টাকা।

কিলো?

হুঁ।

পাঁচ কিলো দাও।

মেয়েটা একটু অবাক হল। বলে, কিসে লিব্যান? একটা ফোলিও ব্যাগ ছিল প্রফুল্লবাবুর হাতে, গায়ে লেখা – সেমিনার অন ক্রেমিয়াম ম্যানেজমেন্ট ইন স্টিল ফর লাশ্চার অ্যাণ্ড ব্রাইটনেস। ওতে পাঁচ কিলো ধরবে না। দুই হাতে, কোটের পকেটে, সারা শরীরে বেগুন নিয়ে, বেগুনের অনুভব নিয়ে ডঃ রায়চৌধুরী গাড়ির দিকে চললেন, ড্রাইভার গাড়ি এগিয়ে এনে দরজা খুলে দেয়।

সারা সিট জুড়ে ছড়ানো বেগুনের মাঝখানে বসে আছেন ডঃ রায় চৌধুরী। হাতে একটা বেগুন। বেগুনের গায়ে হাত বুলোচ্ছেন উনি। হাতের মমতা বেগুনের গায়ে লাগে, আর বেগুনের মমতা প্রফুল্লবাবুর হাতে লাগে। কত করে নিল স্যার? ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে।

এক টাকা কেজি।

খুব চিপ স্যার।

তাজা, খুব তাজা। বোঁটার কাছটাতে এখনো কী উদ্ধত কাঁটা। কাঁটাটায় আঙুল দিলেন। কাঁটা ফোঁড়ার কষ্টের আহ্বাদ নিলেন শরীরে। এবার বেগুনটা দুহাতে ধরে মুখের সামনে ধরলেন। গন্ধ নিলেন। কত কী মাখে পূর্ণিমা। ক’বছর হল পূর্ণিমার সঙ্গে? ক’বছর হল বেগুনের? বেগুন তো মানুষেরও আগে। বেগুন আগে, নাকি মানুষ? হোমোসেপিয়েন্স, নাকি...

টমেটো ক্ষেত থেকে টমেটো তুলবার সময় গাছেদের গা থেকে একটা গন্ধ উঠে আসে, যা নাকি টমেটোর গায়ে নেই। সেই বুনো গন্ধটা মনে পড়ে গেল একবার। মনে পড়ছে শীতের ভোরের খেজুরতলা। খেজুর রসের গন্ধ, গাছের সাদা ফেনা, রস খেতে আসা পাখি। মনে পড়ছে ধান গাছের দেহ থেকে বার করে নেওয়া সাদা রঙের পাইপ যা দিয়ে সুড়সুড় করে টেনে নেয়া যেত খেজুর রস। বেগুন ক্ষেত? মনে নেই, সেই আঁচড়চিহ্ন মনে নেই? মামীমা বলছিলেন, ছুটিসনি পলু, বেগুন কাঁটা বিঁধবে। দশ বারো বছরের পলু ফড়িং-এর পিছনে ছুটছিল। বেগুনগুলো কেমন পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। চুপি চুপি থাকে। যেন টু-উ-কী।

খুব ভোরবেলা মামাবাড়ির উঠোনে কী সুবাস। শিশিরের তো নিজের গন্ধ নেই, কুয়াশারও নেই। লাল রোদুরের? প্রভাতী বাতাসের? ভোরবেলাকার একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে, তাই না? মনে আছে, মনে পড়ছে পলু, একদিন খুব ভোরবেলা উঠোনের বেগুন ঝোপ থেকে বেগুন তুলতে গিয়ে কী দেখেছিলি? – ঘন বেগুনি রঙ মসৃণতার গায়ে টলটল করছে দু ফোঁটা উজ্জ্বল শিশির, মনে আছে?

আয়নায় ড্রাইভারের মুখের ছায়া। তার মানে ড্রাইভারও দেখতে পাচ্ছে তাকে এই অবস্থায়, একটা বেগুনকে গালে ঘষতে। প্রফুল্লবাবু সরে যান! বেগুনটা নামিয়ে রাখেন পাশে। রোটারি ক্লাবের মেম্বার, রিসার্চ গাইড, ‘হু ইজ হু’-তে যার নাম আছে, ঘন ঘন বিদেশ যান, সে কিনা বেগুন নিয়ে...

নিউজ পেপারটা খোলেন ডঃ রায়চৌধুরী। দামোদরের জলে ফার্নেস অয়েল মিশে যাবার খবরটা আবার পড়েন। জল খারাপ হয়ে গেছে। ঐ জল এখন ব্যবহার করা যাবে না। দুর্গাপুরে জলকষ্ট।

সারা গায়ে বেগুন ধারণ করে লিফ্ট-এর সামনে দাঁড়ালে প্রফুল্লবাবু। ড্রাইভারও কিছুটা শেয়ার করেছে। সেভেস্থ ফ্লোর। মিসেস রায়চৌধুরী দরজা খুললেন। বেগুন সমারোহে বড়ই আশ্চর্য। একী? এত বেগুন? ডঃ রায়চৌধুরী সোফায় ঢেলে দিলেন বেগুনগুলি। দু একটা মোজাইক মেঝেয় পড়ে অল্প বা বাম্প করল। মিসেস রায়চৌধুরী উচ্ছাসে বললেন, কী তাজা! একটু পরেই মিসেস রায়চৌধুরীর ব্যস্ততা শুরু হল। ত্রিবেদী ভেজিটেরিয়ান, খুব খুশি হবেন। জয়শ্রী, সুভদ্রা, শান্তা, সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হল। সবাই খুব খুশি। গ্রাম থেকে আসা ফ্রেশ বেগুন।

বেগুন কোনো নতুন ব্যাপার নয়। বাজার থেকে প্রায়ই তো আসে। হয়তো এরকমই তাজা আসে মাঝে মাঝে। তবু গ্রাম শব্দটাতেই কী রকম ডাইমেনশন পেয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

মিঃ ত্রিবেদী টবে কাঁচা লঙ্কা ফলান। মাঝে মাঝে দুটো চারটে দিয়ে যান। ঐ কটা কাঁচা লঙ্কা আলাদা রাখা হয়, গরম ভাতের সঙ্গে ঘি মেখে খাওয়া হয়। খেতে খেতে হ্যাঁ তো, প্রফুল্লবাবু নিজেও বলেছেন, – অঃ কী সেন্ট, কেমিকাল ফার্টিলাইজার ছাড়া চাষ হয়েছে না? আর, এখন, পূর্ণিমা, মানে মিসেস রায়চৌধুরী উচ্ছাসে বললেন, আজ বেগুন পোড়া খাব।

কুন্তলা এল। আজ একটু রান্ধির হল। নিজেই কৈফিয়ত দিল – নাটক দেখতে গিয়েছিলাম বাপি। কুন্তলা যাদবপুরে এম.এ. পড়ে। পূর্ণিমা তখন খুবই ব্যস্ত। বেগুনে তেল মাখানো হয়েছে। গ্যাসে বেগুনপোড়া করা খুব ঝামেলার। কুন্তলা হেল্প করছে মাকে। কাজের মেয়েটা টি.ভি.-তে ন্যাশানাল প্রোগ্রাম শুরু হতেই চলে যায় বাড়িতে। গ্যাসের আঁচ কমিয়ে রুটি জালের উপর বেগুনটাকে শুইয়ে দিয়ে...

মানুষের চেয়ে বেগুনের বয়স বেশি। কিন্তু বেগুন বেগুনেই থেমে আছে বলে মানুষ। বেগুনকে পোড়াচ্ছে। যদি মানুষ এখানেই থেমে যায়, বেগুন এগোয়, একদিন বেগুন মানুষ পোড়াবে।

বেগুনপোড়ায় সরষের তেল মেখে খাওয়া হল।

মাঝে মাঝে এরকম আনলেই তো পারা...কুন্তলা বলল।

আনব তো, বৈচিফল আনব। কোথাও দেখলেই আনব। চেনা? বৈচিফল?

কীরকম আবার ওটা?

চেনা না। গাব চেনা, গাব?

গাব? কি আজব নাম।

ঢেউয়া?

এবার হেসে ফেলল কুন্তলা। কী সব যা-তা বলছ না বাপি আজ...

সেই সোনালি রঙের ফল, টক-মিষ্টি, ছোট ছোট কোয়া, নরম...জানো না, তোমরা জানো না। ল্যানোলিন জানো, ও.ডি. কোলন জনে, জনে দাঁতের ক্লোরাইড।

এসময় ফোন বাজে। ত্রিবেদী স্পিকিং...। বাইগন বহুত আচ্ছা। খুব ভালো। খুব মিঠা, সফট ভি। ফ্রেশ চীজ আছে না, নো ফার্টাইজার। মিসেসকে থ্যাঙ্কস জানিয়ে দিবেন।

নো ফার্টাইজার; অতএব টেস্টি। কি করে বুঝলেন ওরা, এই বেগুনে কেমিক্যাল ফার্টাইজার ইউজ করা হয়নি? ওঁরা দুজনেই ফার্টাইজার করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়াতে কাজ করেন বলেই বেগুন খেয়েই এ সত্যে পৌঁছনো যায় না। আসলে এটা উইশফুল থিংকিং। ক'দিনই বা এমন হল সিস্টেমিস করে ইউরিয়া বানাবার কায়দা মানুষ শিখেছে, আর এখনই ফার্টাইজার শুনলেই বমি পাচ্ছে মানুষের, ইনসেক্টিসাইট শুনলেই অ্যালার্জিতে গা চুলকোচ্ছে। প্রোটিন-নিউট্রন-ইলেক্ট্রন শুনলেই যেন হিরোসিমা হল্কা হাওয়া এসে গায়ে লাগে।

টিভিতে সে সময় চিত্তাক্রান্ত বৈজ্ঞানিকদের মুখ। তারা ভাবছেন। দামোদরের জলে মিশে যাওয়া ফার্নেস অয়েল এগিয়ে আসছে। পূর্ণিমা বলল, ফার্নেস অয়েল মেশা জল খেলে কি মানুষ মরে যায়? প্রফুল্লবাবু বললেন, না, ঠিক মরে না...কুন্তলা বলল, দামোদর কি আলটিমেটলি গঙ্গায় মিশেছে বাপি?

একটু বিব্রত হলেন প্রফুল্লবাবু। পশ্চিমবাংলার নদী-মানচিত্রটা ঠিক মনে গাঁথা নেই। বইয়ের তাক থেকে খুঁজে একটা বই খুললেন এবং বললেন, কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে পড়েছে, সেটা মরা দামোদর। কলকাতার ভয় নেই।

পূর্ণিমা আর কুন্তলা। একসঙ্গে বলল, যাক্!

প্রফুল্লবাবুর আজ কেন যে এরকম লাগছে নিজেই ঠিক বুঝতে পারছেন না। সোলানেসি ফ্যামিলির একটা নিরীহ প্রজাতি বেগুন মনটাকে এরকম করে দিল? রিলাকসনের নরম বিছানায় হাল্কা নীল আলোর ঘরে শুয়ে কেন যে ডঃ রায়চৌধুরীর মনে হল গুহাকন্দরে শুয়ে আছে একটা অস্ট্রালোপিথোকাস। চাঁদ উঠেছে আকাশে, সরোবরে জড়ো হয়েছে তৃষিত চিত্রল হরিণ। অস্ট্রালোপিথোকাসটাও জল খেতে ওঠে। ফ্রীজ খোলে, জল খায়। ফ্রীজের ভিতরের স্বল্পালোকে বেগুন-শরীর দেখে। সেই ওজ্জ্বল যেন নেই আর বেগুনগুলোর গায়ে। ফ্রীজের শৈত্যে? একটা বেগুন-দেহ বার করে আনেন ফ্রীজ থেকে। আলো জ্বালান। এবং দেখেন বেগুনের সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সূক্ষ্ম জলবিন্দু। বুকের মধ্যে অকস্মাৎ আনন্দভৈরবী। শিশির! শিশির! বেগুন-শরীরের মসৃণ চামড়ায় ফুটে উঠেছে বাল্যস্মৃতি।

কি গো, হলটা কি? ...পূর্ণিমার ঘুম ভেঙেছে টিউব আলোয়।

প্রফুল্লবাবু শুয়ে পড়েন। মানুষের জন্ম কত বছর হল? ক'লক্ষ বছর? কলমিলতা-শুশনিপাতার সঙ্গে, ছাগলছানার সঙ্গে, রাজহাস-টিয়া-বুলবুলির সঙ্গে, বৈচিফল, নারকোল পাতার ঝিরঝির এবং শিশিরসিক্ত ফল

নিয়ে, ফুল নিয়ে এই প্রজাতি গত দু লক্ষ বছর কাটিয়েছে। গত দুশো বছরের কী এমন শক্তি আছে যে গত দুলক্ষ বছর থেকে টেনে হিঁচড়ে আলাদা করে দেবে?

পরদিন সকালে উঠেই ফ্রীজ খুলে একটা বেগুন বার করে ব্যালকনিতে নিয়ে গেলেন প্রফুল্লবাবু। ফ্রীজের শিশির কিছুতেই ঐ আসল শিশিরের মতো নয়। প্রফুল্লবাবু দেখেন বেগুনটার সারা গায়ে বিন্দু জল। আকাশ বাতাসের শিশির হল গলানো মুক্তোর মতো দু ফোঁটা একফোঁটা টলটল। মেশিন শিশির কিছুতেই ওরকম নয়।

কলকাতায় কি শিশির পড়ে? কতদিন সেরকম প্রভাত দেখেননি প্রফুল্লবাবু। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর অভ্যেস। সাতটার আগে উঠতে পারেন না। এই ফ্ল্যাটের পূর্ব দিক বন্ধ। সদ্য সকালের আলোর ঝালর ঘরে আসে না। শীতকালে সকালে উঠে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কুয়াশা জড়ানো কলকাতা দেখতে দেখতে শিশির ভেজা কালো রাস্তার গায়ে টায়ারের জ্যামিতিক জলছবি।

প্রফুল্লবাবু ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে একটা গুলিসুতো কিনলেন।

এবং রাত্রিবেলা একটা বেগুন বার করে নিলেন ফ্রীজ থেকে। তোয়ালে দিয়ে হাল্কা করে মুছে নিলেন, সুতো দিয়ে বাঁধলেন বেগুনের বোঁটা এবং ব্যালকনিতে ঝুলিয়ে দিয়ে গ্রীলে বেঁধে নিলেন সুতোর অন্যপ্রান্ত।

পূর্ণিমা ঘুমোচ্ছে। গা থেকে হাল্কা জুঁই গন্ধ। পাউডারের। ওটা সিনথেটিক। ওটা বেনজইল অ্যাসিটেট। ভোরে উঠতে হবে। শুয়ে পড়েন। আজকাল ঘুম আসতেই চায় না। ভেড়া গোনেন, ঘুমের বড়িও খান। আজ ঘুমোতেই হবে, ভোরে উঠে সবাইকে দেখাবেন। দ্যাখ কুন্তলা দ্যাখ, শিশিরের আহ্লাদ দ্যাখ বেগুন শরীরে।

প্রফুল্লবাবু যেন স্বপ্ন দেখেন ওঁর পিঠ চড়কের ভক্তাদের মতন। শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে সেই আটকানো। আর একটা জ্যাস্ত বেগুন ধরে রেখেছে সেই দড়ির অন্যপ্রান্ত। প্রফুল্লবাবুকে নামানো হচ্ছে। নীচের সাদা ধোঁয়া মেঘে ডুবে গেলে প্রচণ্ড কাশি। কে যেন মেশিন গলায় বলল, মিক্ গ্যাস। ভূপালের। ভাল লাগছে তে বেশ? তারপর ঝলকানো আলোককুঞ্জে। মেশিন গলা বলল, যাও, শিব হও। সারা গায়ে মেখে নাও চেরেনোবিলের ছাই।

প্রফুল্লবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন। সাতটা। ব্যালকনিতে যান। সুতোটা টেনে বেগুন ওঠান। শুকনো। সাতটায় কি আর শিশির থাকে?

সেইদিনই ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময় অ্যালার্ম ঘড়ি কিনে ফেললেন একটা। কাণ্ডকারখানা কি একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে? একটা বেগুনের জন্য নাকি এক ড্রপ শিশিরের জন্য একটা অ্যালার্ম ঘড়ি কেনা?

কোনটা বেশি বেশি আর কোনটা কম কম তার কোনো ফর্মুলা আছে? দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া ‘কেন চেয়ে আছো গো মা’ শুনবার জন্য একদিন এমন ইচ্ছে হয়েছিল, ছ’লিটার তেল এবং একটা রবিবার খরচা করে বারাসাত ছুটেছিল সোমেশের বাড়ি, সেটা কি বেশি বেশি? মায়ে-মেয়েতে মিলে শুধু একটা কেকের জন্য সারা দুপুর ধরে ডিমের সঙ্গে ময়দা ফেটানোটা বুঝি বেশি বেশি নয়? – তা ছাড়া একটা অ্যালার্ম ঘড়ি তো দরকারই হয়। আগের ঘড়িটা সেই কবে নষ্ট হয়ে গেছে। ভোরে ওঠা তো ভালই। হাল্কা ফ্রি হ্যাণ্ড...

কলিং বেল বাজতেই দরজা খুলে দিল কুন্তলা। কুন্তলার মুখে দুটু দুটু হাসি, আর পূর্ণিমার মুখ গম্ভীর। কুন্তলা খুব মজ্জা করে বলল, তুমি বেগুন ঝুলিয়েছিলে বাপি?

হ্যাঁ।

জানো বাপি, মা যখন বলছিল, আমি বললাম, ভ্যাট। ও মা, তারপর দেখি তোমার টেবিলে খোলা সুতে, আর একটা সুতোর গুলি, গ্রীলে গিঁট।

প্রফুল্লবাবু হাসলেন, কুস্তলার কাছে হাঙ্কা চাপড় মারলেন। বললেন, আবার কাল, অ্যা?

পূর্ণিমা বলল, থামো। তুমি জানো মিসেস ত্রিবেদী তোমার ঐ বেগুন ঝোলানো নিয়ে কী যা-তা কमेंট করেছে? আচ্ছা, বল তে তুমি বুড়ো বয়সে এরকম বাচ্চাদের মতো খেলা করতে গেলে?

খেলা? না-না রিসার্চ! রিসার্চ নয়, খেলাই।

প্লীজ ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নাও। পূর্ণিমার গলায় ঝাঁঝ। আচ্ছা, একটু বলবে, বেগুন ঝোলানোর পারপাসটা কী ছিল?

শিশিরাটা পড়ত কিনা বেগুনটার গায়ে।

কী হত তাতে?

কত কী হ'ত। মানুষ তো তার পুরোন ভিটেতে ফিরে যেতে চায়। তুমি যাও না তোমার বাপের বাড়ি? তোমার বাবা নেই, মা নেই তবু। এই যে তুমি জংলা শাড়িটা পরেছ, সারা গায়ে লতাপাতার ছাপ, পিলোকভারে এমব্রয়ডারি ফুল, তুমি কিন্তু বনবালিকাই হতে চাইছ, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছ। জানালায় মানিপ্ল্যান্টের লতা, ঘরের কোনায় খয়রিপাতার রাবার গাছ, দেয়ালে প্লাস্টিকের প্রজাপতি, আর যখন চামর দোলাও ঠাকুরঘরে, তখন তো ঘোড়ার লেজের কথাই ভাবো...

থাক। খুব হয়েছে।

রাত্রে ক্রিম ঘষতে ঘষতে পূর্ণিমা বলছিল- এমন ছেলেমানুষি করো না, মাঝে মাঝে আমাদের খুব বাজে অবস্থায় পড়তে হয়, প্রেস্টিজ নিয়ে টানটানি হয়। জানোই তো মিসেস ত্রিবেদী কী রকম ন্যারো মাইণ্ডেড, তুমি এমন করে বেগুনটা ঝুলিয়েছিলে, ঠিক ত্রিবেদীদের ব্যালকনির সামনে ঝুলছিল।

তাতে কী হয়েছে?

কী আবার হবে, যা-তা কमेंট করতে তো কারুর আটকাচ্ছে না, এই তো সব এডুকেটেড মহিলা!

প্রফুল্লবাবু এখন ঐ বাক্যবিন্যাসে বুঝে নিতে পারেন ওটা ভূমিকা। পূর্ণিমা এখন অনেক কিছু বলে যাবে। এখন ও ঘরে কুস্তলা পড়ছে। কুস্তলা এখনো শব্দ করে পড়ে। পূর্ণিমা মাথা আঁচড়ে নিল। রোজই এই সময়ে বলে কীরকম চুল উঠে যাচ্ছে। আজ বলল না ওসব। প্রফুল্লবাবু টেবিলে ছিলেন, টেবিল ল্যাম্পও জ্বলছিল। ফটাস করে টিউবল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে পূর্ণিমা মশারিতে ঢুকে যায়, দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শোয় এবং বলে - অদ্ভুত ব্যাপার! কী? না বেগুন ঝুলছে। বেগুন। ডঃ রায়চৌধুরীর ফ্লাটে সুতো বাঁধা, আর ত্রিবেদীর ফ্লাটের সামনে ঝুলছে একটা বেগুন।

জয়শ্রীই প্রথম দেখেছিল মর্নিং ওয়াকে গিয়ে। ফেরার সময় মিসেস ত্রিবেদীকে বলে, কী ব্যাপার? তখনই ওরা নাকি দেখে বেগুনটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। মানে, তখন তুমি জাস্ট তুলে নিচ্ছ। মিসেস ত্রিবেদী তারপর কী বলেছে শুনবে? ওর নাকি সব মিস্ট্রি লাগছে - কী সব ব্যাপার-স্যাপার চলছে। কাঁচা বেগুন পাঠানো হল, তারপর আবার বেগুন ঝোলানো হল, নিশ্চয়ই কোনো তুকতাক চলছে। দেয়ার মাস্ট বি সামথিং। বেগুনে



কোনে মন্ত্র দেওয়া আছে। আরও শুনবে? মিসেস ত্রিবেদী বলেছে আমার নাকি মিষ্টার ত্রিবেদীর উপর উইকনেস আছে। আমি তাই এই সব তুকতাক চালাচ্ছি। আর জানো, সারা বাড়িতে এটা চাউর হয়ে গেছে...

পূর্ণিমা এইবার দেয়ালের দিক থেকে সরে আসে। বলে তোমার এই সব উদ্ভট খেয়ালের জন্য এই সবও শুনতে হচ্ছে আমাকে...

প্রফুল্লবাবু কোনো কথা বলেন না। টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় চলে যান। পূর্ণিমাকে কাছে টেনে নেন। ওর মাথার চুলে বিলি কেটে দেন। গালে হাত বুলোতে গেলে আঙুলের ডগা পায় জলের স্পর্শ। জলে কি বিদ্যুৎ খেলে? তখুনি আঙুল সরিয়ে নেন গাল থেকে।

প্রফুল্লবাবু তখন পালাতে থাকেন। লেকচার রুম থেকে, পি.সিআর.সি থেকে, ডঃ রায়চৌধুরী থেকে, সেমিনার, সিম্পোসিয়াম, আটশো দশ স্কোয়ারফুটের ফ্ল্যাট থেকে পালাতে পালাতে বিশাল বিশাল জেরা ক্রশিং পেরিয়ে অনেক দূর চলে যান। কচুরিপানা মাড়ানোর ফটাস ফটাস শব্দ টের পান। ফড়িং ডানার ভোঁ-ভোঁ, শুকনো ডুমুর পাতা, সাদা থান পরা দিদিমার কোল, ঘুম যায়রে ঘুম যায়রে ঘুমের লতাপাতা, দুই দুয়ারে ঘুম যায়রে দুটি ডুমুর পাতা। ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী...সেই কোন কবেকার...এখন ভ্রমরডানার ভোঁ-ভোঁ ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই। এখন ঘুম চাই, ঘুম। ঘুমের লতাপাতা, আমাকে জড়িয়ে নে, জড়িয়ে নে প্লিজ। তেষ্ঠা পায়। জল। ফ্রীজ খুললে আবার সেই বেগুন। ঘরে গিয়ে নীল মশারির ভিতরে পূর্ণিমার দুঃখ-ঘুম দেখে নিয়ে ফের চলে যান অপ্রতিরোধ্য বেগুনের কাছে। ফ্রীজ খুললে যেন মর্গ। কয়েকটা বেগুন স্তব্ধ শুয়ে আছে। একটা বেগুনের বোটা ধরে ঝুলিয়ে ফ্রীজ থেকে বার করে আনেন, মেঝেতে শুইয়ে দেন। বাইরের একটা হ্যালোজেন বাতির হলদে আভা কাচের শার্পির ভিতর দিয়ে ঐ নিস্তব্ধতার ভিতরে আসে। এখন সবই ঘুমোচ্ছে। আলো না জ্বালিয়ে ভীষণ সন্তর্পণে টেবিলে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সুতোর কুণ্ডলীটা মুঠোয় নেন। না, ঐ ব্যালকনি আর নয়, ডাইনিং স্পেসের জানালাটার কাছে যান, খোলেন। রাত সাড়ে বারোটার কলকাতা শহর তখনো জেগে আছে। সেভেষ্ট ফ্লোর থেকে নিচের সব খেলনা। দুজন খেলনা মানুষ খেলনা মারুতি থেকে নামল। পপ গান ভেসে আসছে কোনও ফ্ল্যাট থেকে। প্রফুল্লবাবু বেগুনটার গায়ের মেশিন শিশির তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে নিলেন। তারপর সুতোয় বেঁধে লম্বা করে ঝুলিয়ে দিলেন, যেন ত্রিবেদীদের ফিফ্থ ফ্লোরের ফ্ল্যাট ছাড়িয়ে আরও নিচে নেমে যায়। এরপর ঘরে গিয়ে অ্যালার্ম ঘড়িটা বের করে আনেন প্রফুল্লবাবু। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে ঘড়িতে চাবি দেন, যেন ঐ চাবির শব্দ চরাচরে কেউ না শুনতে পায়। অ্যালার্মের সময় দেন সাড়ে চারটে, তারপর কাঁটাটা আর একটু ঘুরিয়ে পোঁনে পাঁচটা করেন এবং ঘড়িটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েন। সারা রাত কটু কটু করতে করতে ঘড়িটা একসময় চিৎকার করে ওঠে, তক্ষুণি ঘড়িটাকে থামিয়ে দিয়ে প্রফুল্লবাবু বিছানা ছাড়েন। সোজা জানালাটার কাছে চলে যান। সুতোটা ধরে টানেন, সুতোটা হাল্কা। শুধু সুতোটাই, আর কিছু নয়। জানালার গ্রীলে মাথা চেপে প্রফুল্লবাবু দেখেন ভোরের বাতাসে ছিন্ন সুতোর অবোধ ওড়াউড়ি। প্রফুল্লবাবু তখন ঐ পা-জামা এবং গেঞ্জিপরা অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন এবং ছুটে যান রাস্তায়।

সূর্য ওঠার আগে আগে চরাচরে এক ধরনের নরম নীল আভা ব্যাপ্ত থাকে। ওরকম আলোয় বেগুনটাকে দেখতে পান প্রফুল্লবাবু। রাস্তায়।

বেগুনটার অর্ধেক পিষ্ট হয়ে গিয়ে ওর সাদা মাংস মিশে আছে রাস্তার কালোয়, আর তার উপরে ফুটে উঠেছে টায়ার-জ্যামিতি। আহত, রক্তাক্ত যে বাকিটা ছিল, বোঁটাটা তখনো আটকে আছে সেই বাকি শরীরে, আর, প্রফুল্লবাবু দেখেন সেইখানে, সেই বেগুনি মসৃণতার উপরে টলটল করছে, টলটল করছে একফোঁটা শিশির।

প্রফুল্লবাবুর হাতটা তখন ক্রেন। ধীরে, সন্তর্পণে তুলে নেয় ছিন্নভিন্ন বেগুন শরীর। ঢাক বাজে, উলুধ্বনি। হিরোজ্ঞা ছুটে গেল এইমাত্র পিছনে। মাথা উঁচু করে সামনে তাকালে মায়াবী পাহাড়। গুহা, গুহাকন্দর। ওখানে কে দাঁড়িয়ে? আদিমানবী? সি সিকসটিন, সেভেস্ট ফ্লোর, তবে কি পূর্ণিমা? পূর্ণিমা - দেখো দেখো...

প্রফুল্লবাবু দেখেন পূর্ণিমার হাতও তখন ক্রেন। চোখের দিকে যায়। ও চোখ মোছে...

শিশির! শিশির!

## উইশ

বুকুনের সামনে রচনা বই খোলা। ‘উইশ’ রচনা খুব ইম্পর্টেন্ট। বাবা বলেছে মুখস্থ কোরো না, নিজে লেখ। চোখের সামনেই তো দেখছ। উইশ রচনাটা দিয়েই বুকুনের রচনা লেখা শুরু, আগে যেমন গরু রচনা ছিল। বুকুন লিখতে লাগল উইশ আমাদের পরম উপকারী প্রাণী এরা না হলে আমরা বাঁচতাম না। এদের দুটি চোখ, চারটি পা, একটি মুখ, একটি নাক, একটি লেজ আছে। এদের গায়ে লোম নেই, গা বেশ চক্চক করে।

এই পর্যন্ত লিখে বুকুন বইটার দিকে দেখে। ও যা লিখেছে, আর বইয়ে যা লেখা আছে, তা মোটামুটি একই রকম। শুধু স্টারটিং-এ একটুটা আছে - ‘উইশ প্রাণীটি আধুনিক বিজ্ঞানের এক অসামান্য অবদান’। বুকুন পড়তে থাকে। একবার রীডিং পড়ে নেওয়াটা ভাল। বুকুন পড়ে - উইশ বা Wish কথাটির বৈজ্ঞানিক নাম হল Cordata WIS Hakita, সংক্ষেপে এটা এখন দাঁড়িয়েছে WISH. W.I এবং S হল তিনটি প্রাণীর আদ্যক্ষর যথা - W= উডচাক (Wordchuck) ইহা কাঠবেড়ালি জাতীয় বৃহৎ আমেরিকান তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী। দুই-আড়াই ফুট লম্বা। এরা ঘাস, পাতা, গাছের বাকল ইত্যাদি খায়। পাকস্থলীতে ঘন এ্যাসিড ক্ষরণ হয়।

I= ইগুয়ানা (Iguana) ইহা এক জাতীয় গিরগিটি। এরা স্থলেও থাকে, জলকাদাতেও থাকে। গ্যালাপাগাস দ্বীপে অনেক জাতের ইগুয়ানা বাস করে। এদের মাংস খুবই সুস্বাদু, ফলে শিকারিদের হাতে পড়ে ইগুয়ানা লুপ্ত হতে চলেছে। S= স্যালামাণ্ডার। ইহা অনেকটা উভচর প্রাণী। দেখতে অনেকটা গিরগিটির মতো। এরা কষ্টসহিষ্ণু। না খেয়ে এরা অনেকদিন থাকতে পারে। H= ইহা কোনো প্রাণী নামের আদ্যক্ষর নয়। আমেরিকান নাগরিক জাপান বংশোদ্ভূত বৈজ্ঞানিক ডাঃ হাপিকু। ডাঃ হাপিকুর স্মৃতি বহন করে H শব্দটি WIS এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

বায়োইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির একটি আলোচ্য উদাহরণ হ’ল এই Wish সালামাণ্ডার এবং ইগুয়ানার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন উডচাকের ভিতরে ঢুকিয়ে এই আশ্চর্য প্রাণীটিকে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রাণীটি মূলত প্লাস্টিকভোজী। পলিথিন, পলিপ্রপিলিন, পিভিসি, বেকেলাইট ইত্যাদি সবরকম প্লাস্টিক থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে। আমাদের সভ্যতার উপকরণ হিসেবে প্লাস্টিক অপরিহার্য কিন্তু মানুষ সব খেতে পারলেও প্লাস্টিক খেতে পারে না। এই প্রাণীটি মূলত প্লাস্টিক খায়, এবং মানুষ এদের খায়। পৃথিবীতে অন্যান্য প্রোটিনের আকালের মধ্যে এই WISH একটি আশীর্বাদ। এর মাংস অনেকক্ষণ আমাদের পেটে থাকে। এদের চর্বির পরিমাণ বেশি হওয়ায় ক্যালোরি মূল্যও অনেক বেশি। WISH বর্তমানে আমাদের জীবনযাপনের অঙ্গ...।

বুকুনের আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। একটু রিল্যাক্স করতে ইচ্ছে করছে। একটু ব্যালকনিতে গিয়ে WISH হান্টিং দেখবে। আজ বুকুনদের উইশ শিকারের ডেট। বাবা ব্যালকনিতে। বড়শিতে সিনথেটিক টোপ লাগিয়ে, সামনের আবর্জনায় ফেলে, বসে আছে।

বুকুন বাবার পাশের চেয়ারটাতে বসেছে। বসে বসে উইশ হান্টিং দেখছে। চারিপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্ল্যাটগুলি। মাঝখানে জঞ্জাল ফেলার জায়গা। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে একটা গোল আবর্জনা ফেলার জায়গাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিরিশটি ফ্ল্যাট বাড়ি। প্রতিটি পাঁচতল বাড়িতে দশটি করে ফ্ল্যাট। তাহলে তিনশোটা ফ্ল্যাটের আবর্জনা পড়ে মাঝখানটায়। প্রতিটি হাউসিং'ই এই কায়দায় গড়ে ওঠে। বুকুন বুঝতে পারছে ওর বাবা খুব টেন্সড। একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। বাবা ছাড়াও আরও ক'জন বড়শি নিয়ে বসে আছে। প্রতিদিন দশজনকে হান্টিংয়ে পারমিশন দেয়া হয়। তার মানে প্রত্যেকেই মাসে একদিন করে চান্স পায়। হাউসিং কমিটি এটা ঠিক করে দিয়েছে। আজ যে দশজন হান্টিং-এ বসেছে, ঠিক তিরিশ দিনের মাথায় এই দশজন চান্স পাবে আবার। সকলে আটটা থেকে বেলা দুটো, এই ছ'ঘন্টা টাইম। এর মধ্যে যে যেকটা ওঠাতে পারে। বুকুনের বাবা হাইয়েস্ট উঠিয়েছিল পাঁচটা। সাধারণত একটা বা দুটোই ওঠে। বুকুন দেখছে জঞ্জাল ঘিরে গোল হয়ে থাকা ফ্ল্যাটগুলির দশটা ব্যালকনিতে দশটা চিন্তা ক্লিষ্ট মুখ। কেউ শিকার পাচ্ছে না। বেলা বারোটা বাজতে চলল। দুটোর সময় কেয়ারটেকার ঘন্টা বাজিয়ে দেবে, মানে শেষ। বুকুন ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, একজনও পায়নি? বুকুনের বাবা বলল E-10 আর C-16 একটা করে পেয়েছে। বুকুনেরা হ'ল B-3, মনে রাখা খুব সহজ। রিবোফ্লোভিন। রিবোফ্লোভিন মানে ভিটামিন B-3। বুকুন দেখল ওর বাবা সিগারেটে লম্বা টান দিচ্ছে। বুকুন বলল চিন্তা করোনা, ঠিক পেয়ে যাবে। বুকুন দেখল সামনের ফ্ল্যাটের তিনতলা থেকে কিছু আবর্জনা পড়ল। নতুন আবর্জনা না পেলে জঞ্জালের ভিতর থেকে উঠে আসে আবর্জনায় নতুন কী আছে দেখতে চায়। বুকুনের মা একটু আগেই আবর্জনা ফেলেছে। কিন্তু উইশ ধরা পড়েনি। বুকুনের বাবা চেয়ারে বসে, ছিপটা ব্যালকনির লোহার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। হাতলটা ধরে আছে বুকুনের বাবা। লম্বা নাইলনের সুতোর গোড়ায় বড়শি। বড়শিতে পচা হাঁদুরের টোপ। টোপটা রাখা আছে পড়ে থাকা জঞ্জালের উপরে। নিশ্চুপ পড়ে আছে, উইশ আসছেন।

গত মাসেও বুকুনের একটাও জোটেনি। খুব কষ্ট হয়েছে। এমাসেও জুটবে না? বুকুন আবার নিজের পড়ার টেবিলে চলে যায়, রচনাটা শেষ করতে হবে।

একটি প্রাপ্তবয়স্ক উইশের ওজন দুই-আড়াই কিলোগ্রাম। এর মাংস অতি পুষ্টিকর। চর্বি'র পরিমাণ খুব বেশি থাকায় এই মাংসের ক্যালোরিমূল্য অত্যন্ত বেশি। একটি স্ত্রী উইশ প্রতি মাসে একবার একসঙ্গে পনের কুড়িটি ডিম পাড়ে। উইশের ডিম অতীব সুস্বাদু কিন্তু খাওয়া বেআইনি।

বুকুন উইশের ডিম খুব ভালোবাসে। খেতে নয় দেখতে। কী সুন্দর সাদা ফুটফুটে ডিম। কয়েকবার দেখেছে বুকুন। একবার উইশ ধরা পড়ার পর প্লাস্টিকের বাস্কেটে রেখে ছিল। একটু পরেই ডিম পেড়েছিল উইশ। উইশের ডিম আবর্জনায় রেখে আসাটাই নিয়ম। কিন্তু বুকুনের মা কয়েকটা রান্না করেছিল। বুকুনকে বলেছিল, কাউকে বলিস না। বুকুনের ইচ্ছে উইশকে ঘরেই পোষে। কিন্তু ঘরে বেশিক্ষণ বাঁচে না। ওদের বাঁচতে হলে আবর্জনা চাই। বুকুন চেয়েছিল ওর শোবার ঘরেই আবর্জনা জড়ো করা হোক। ওই আবর্জনার মধ্যে এই উইশ বড় হবে, ডিম পাড়বে...। আবর্জনায় বুকুনের কিছু অসুবিধা হয় না। ছোট বেলাতে গন্ধ না পাবার ইনজেকশন দিয়ে রাখা হয়েছে। ল্যাংটা জীবনে এই ইনজেকশনটা খুব জরুরি। বুকুনের একটা কিরকম যেন দিদি আছে, অনেক দূরে থাকে। ওখানে এরকম G.R.S মানে গ্যারেজ কাম রেসিডেনসিয়াল

স্কিম নেই। ও এই ইনজেকশন নেয়নি। সেই দিদি এ বাড়িতে এসেছিল বড় হাসপাতালে চোখ দেখাবে বলে। প্রথমেই ওকে গন্ধ না পাবার ইনজেকশন দিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওর চোখটা ভালো হয়নি। গন্ধটাও এখন পায়না। আঁকাবাঁকা অক্ষরে একটা চিঠিতে লিখেছিল, তবু শেফালি ফোটে, মিছি মিছি। বৃষ্টিও হয়। আগে প্রথম বৃষ্টির হলে মাটির পারফিউম পেতাম। এখন শব্দ শুনি। শুধু শব্দ। বুকুন গন্ধ ব্যাপারটা কী অতো বোঝে না। যখন চিঠিটা বাবা পড়ল, মা জিভ দিয়ে চুপচুক শব্দ করল, যেমন দুঃখ হলে করে।

গন্ধ নিয়ে এখন বেশ অশান্তি। একদল বলছে দুমুখো নীতি চলবেনা। ওরা বলছে একই দেশের নাগরিক, তাদের কেউ কেউ গন্ধ পাচ্ছে, আবার কেউ কেউ পাচ্ছে না-এরকম চলবে না। তারা দল করেছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, টিভিতে অ্যাড দিচ্ছে, নানারকম হ্যাণ্ডবিল ছেপে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দিচ্ছে। হ্যাণ্ডবিলগুলোতে এরকম লেখা -

আমাদের দেশে শতকরা পঁচিশ ভাগ মানুষ G.R.Sএর আওতায় আছে। বাঁচবার এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য এই স্কিম নিতে হয়েছে আমাদের। এবং বারবার বমনক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ঘ্রানেন্দ্রিয় অকেজো করার ইনজেকশনও বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হয় জন্মবার দশ দিনের মধ্যেই। আমাদের দেশে যাবতীয় জজ ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্মস্টার-সবাই G.R.S স্কিমেই আছেন। অথচ এদের কারোরই ঘ্রাণশক্তি নেই। অথচ এই জি.আর.এস. এর আওতার বাইরে বসবাসকারী মানুষেরা তাদের রক্ষা করার অধিকার পাচ্ছেন। ফলে আমাদের দেশে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাভস্ এবং হ্যাভ নটস। কেউ গন্ধ পাচ্ছেন, এবং কেউ পাচ্ছেন না। দুটো শ্রেণী তৈরি হয়ে গেছে। দেশের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে। অনৈক্য এসেছে। দেশের সংহতির পক্ষে যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এজন্য আমাদের দাবি বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকের ঘ্রানেন্দ্রিয় কেটে দেয়া হোক। এছাড়া আরো কয়েকটি দাবির মধ্যে অন্যতম হল পাঠ্যপুস্তক সংশোধন। এখানে মাস্কাতার আমলের কায়দায় কেমিস্ট্রি বই পড়ানো হচ্ছে। কোনো পদার্থের ফিজিকাল প্রপার্টি পড়ানোর সময় গন্ধের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন এমোনিয়ার গন্ধ বাঁঝালো, হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পচা ডিমের মতো, মিথাইল অ্যাসিটেটের গন্ধ, জুঁই ফুলের মতে-এসব আবার কী? কেন জি.আর.এস. এলাকায় রেডিও, টিভিতে গান হবে ‘আজি গন্ধ বিধুর সমীরণে’, ‘মধুগন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া’, ‘মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে’ - এ সব কী? এই গানগুলি সংশোধন করে প্রচার করতে হবে...

বুকুনের রচনা লেখা শেষ হয়ে গেছে। রচনার শেষে লিখেছে মানব জাতির স্বার্থে, পরিবেশের স্বার্থে উইশ জন্তুটিকে টিকিয়ে রাখা খুবই জরুরি। এবার আবার ও বাবার কাছে গেল। ওর বাবা একটাও পায়নি। দশজন আজ ছিপ নিয়ে বসেছে, মাত্র দুজন পেয়েছে। আগে আগে সবাই তো একটা দুটো তো পেতই, তিন চারটে করেও পাওয়া যেত। বুকুনের বাবা দুশ্চিন্তায় ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছেন। বুকুনের বাবার ঐ ঘনঘন সিগারেট খাওয়া, অস্থিরতা এবং দুশ্চিন্তা শুধু বুকুনের বাবার দুশ্চিন্তা হয়েই থাকলনা। ক্রমে এটা আন্তর্জাতিক দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। সারা পৃথিবীতেই উইশ কমে যাচ্ছে। দ্রুত বংশবৃদ্ধির জন্য যে উইশ বিখ্যাত হয়েছিল, তাদের পেটে আর ডিমই আসছে না। আমাদের দেশেও একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, যার নাম হ’ল এস.ডবল্যু.এন.ই। যার পুরো মানে হচ্ছে সেভ উইশ অ্যাণ্ড ইনব্রিড ফর দি নেশন অ্যাণ্ড এনভায়রমেন্ট।

ওরা উইশের অবক্ষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণাও করেছে। কিছু সুপারিশ করেছিল ওরা। যেগুলো মেনে চলবার জন্য আইনও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যেমন পেটে ডিম আছে এমন উইশ ধরা পড়লেও সঙ্গে সঙ্গেই এদের গারবেজে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে ইত্যাদি। আরও জঞ্জাল বাড়াতে হবে এরকম সুপারিশের ফলে পরিবেশবাদীরা আরও জঞ্জাল চাই আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছু। উইশের সংখ্যা কমতে লাগল এবং কিছুদিনের মধ্যেই উইশ শিকার বন্ধ করে দেওয়া হল। খাদ্য হিসেবেও নিষিদ্ধ করা হল।

উইশের জন্ম হয়েছিল আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ জিনেটিকসে। পেটেন্ট ওদেরই। সারা পৃথিবীর উইশ জন্মের উপর ওরা রয়ালটি পায়। জন্মহার কমে যাওয়ায় রয়ালটিও কমে গেছে। ওরাও জন্মহার বাড়ানোর গবেষণার জন্য এস্তার টাকা ঢেলেছে। শেষ পর্যন্ত ওদের ল্যাবরেটরিই আবিষ্কার করেছে উইশ বাঁচবার অন্য এক তত্ত্ব। ঐ ল্যাবরেটরির রিসার্চ টিমের অন্যতম ছিলেন ডঃ হুই। প্রভাত কুমার হুই। যৌথ ভাবে ডঃ হুইও নোবেল বিজ্ঞেতাদের মধ্যে ছিলেন। যদিও হুই আমেরিকার নাগরিক। কিন্তু জন্মসূত্রে ভারতীয় তথা বাঙালি। উত্তরপাড়ার ছেলে। এজন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত। WISH এর, এবরিবিশেশনের H যেটা, হাপিকু থেকে এসেছে, আমরা মনে মনে ভাবতে শিখেছি ওটা ডঃ হুই। হালআমলের কয়েকটা ইন্টারভিউতে ‘উইশ’ পুরো কথাটি কী বলুন তো – প্রশ্নের জবাবে যারা H ফর ডঃ হুই বলেছে, তারাও পুরো নম্বর পেয়েছে। ডঃ হুই এবং তার সহযোগীরা যে আবিষ্কারটির ফলে নোবেল প্রাইজ পেলেন, তা মূলত উইশ এর মেটাবলিজম সংক্রান্ত। ওরা দেখালেন প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস থেকে প্রোটিন এবং গ্লুকোজ তৈরির বিভিন্ন ধাপ। প্লাস্টিকের কার্বোহাইড্রেট পলিমার গুলি ভাঙছে এবং ভেঙে তৈরি হচ্ছে মূলত অ্যাসিড। এবং বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় গ্লুটারিক এ্যাসিড পরিবর্তিত হচ্ছে গ্লুকোজে। আবার অন্য এক ধরনের এনজাইমের ক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে নাইট্রোজেন যোগযুক্ত হয়ে প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে। উইশের স্টমাকে শুধু নানা ধরনের প্লাস্টিক গেলেই হয় না ক্যাটালিটিক এজেন্ট হিসেবে অন্য কিছুও চাই। সেলুলোজ, স্টার্চ, সোডিয়াম ইত্যাদি। এজন্যই চাই মাছের আঁশ, তরকারির খোসা, সাবানের প্যাকেট। জঞ্জাল চাই, বাঁচবার ও বাঁচবার জন্য। জঞ্জালের মধ্যে দিব্যি বাড়ছিল ওরা। জীবনযাত্রাই পাল্টে দিয়েছিল এই উইশ। কিন্তু ঝামেলা বাঁধাল নতুন একটা সমস্যা। অতিরিক্ত পলিথিন আহার ক্ষতি করে দিল তাদের প্রজনন প্রক্রিয়ায়। গার্বের পঞ্চাশ ভাগই পলিথিন। পলিথিন হটাৎ আন্দোলন করে কোনো লাভ নেই। এমন সময় ডঃ হুই এবং তাঁর সহযোগীরা এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। তারা প্রমাণ করলেন একমাত্র মানুষের মাংসেই আছে এমন এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা পলিথিন হ্যাজার্ডকে প্রশমিত করতে পারে এবং প্রজনন শক্তিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এখন মানুষ কিনছে।

বুকুনদের কমপ্লেক্সে আজ লটারি হল। লটারীতে উঠেছে B-3। তার মানে হল বুকুনদের ফ্যামিলি থেকেই একটি দেহ এই সমবেত জঞ্জালস্তুপের মধ্যে উৎসর্গ করে দিতে হবে। তিনদিন সময় আছে।

পরিবেশবাদীদের স্বেচ্ছাসেবীরা বুকুনদের ফ্ল্যাট ঘিরে রেখেছে যাতে ওরা কেউ পালাতে না পারে। বুকুনদের ঘরে ঘনঘন ফোন আসছে। B-6, A-12, C-8 ইত্যাদিরা টেলিফোনে সমবেদনা জানাচ্ছে। কেউ বলছে কি আর করবেন সবই তো নিয়তি, কেউ বলছে আজ লটারিতে B-3 উঠেছে। এরপরে আমাদের নম্বরও তো উঠবে। কেউ বলছে মানবজাতির স্বার্থে আপনাদের এই আত্মদান। কেউ কিন্তু জিজ্ঞাসা করেননি আপনাদের মধ্যে কার বডিটা জঞ্জাল হচ্ছে? কারণ এই প্রশ্নটা এটিকেট বিরোধী। এটা B-3-র নিজস্ব ব্যাপার। B-3-র সাতশো স্কেয়ারফুটে ওরা তিনজন। হাতে তিনদিন সময়। গতমাসে D9 লটারিতে উঠেছিল। ওদের বাড়ি থেকে ও বাড়ির সবচেয়ে বড়ো লোকটি ভলান্টিয়ার করেছে। এর আগে অন্যফ্ল্যাটে একটি অটিস্টিক বালিকাকে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

বুকুন বলল, তোমরা আমাকেই ফেলে দাও ওই জঞ্জালে। আমার আই কিউ খুব কম। উইশ রচনা আমার আজও মুখস্থ হয়নি।

## কাকায়ন

বিকাশ বাগটির বাড়িতে সর্বদাই কা-কা রব। বারান্দার খাঁচায় এখন ডজন খানেক কাক রয়েছে। মিসেস বাগটি কাকের খাঁচার সামনে বসে আছেন আরাম চেয়ারে, হাতে কাকচরিত্র। বাঁদিকে গিল, গিলের বাইরে অনন্ত অ্যাপার্টমেন্ট। দু বছর আগে অনন্ত আকাশ ছিল ওখানে। অনন্ত অ্যাপার্টমেন্টের চারিপাশে অনন্ত পাঁচিল, পাঁচিলে অনন্ত ঘুঁটে। সব বাড়িতেই গ্যাস, অথচ এত ঘুঁটে কী যে হয়...। কাক ডাকে কা-কা, আগে অ পরে আ। কাক ডাকে যা-যা...। নাইস। ‘যদি কাক উত্তর দিকে যা যা রব করে তবে বিদেশ হইতে সুসংবাদ আসিবার লক্ষণ বলিয়া জানিবে...।’ ওগো, শুনছো, ইউ উইল গेट ইয়ার গ্র্যান্ট ফ্রম সুইডেন...। খাঁচার মধ্যে যে-কাকটা যা-যা রব করছে সেটা নর্থই ছিল, নর্থই তো।

সখা দেখা দাও আমায়

নইলে এ জীবন যায়

ত্রিতাপ তাপিত তৃষিত এই চিত

তোমারই ভাবনায় বিমুগ্ধ সতত

কবে কাছে এসে দেখা দিবে হেসে

হেরিব মধুর অধর হায়

অনন্ত অ্যাপার্টমেন্টের ছাতে শামিয়ানা। লাউড স্পিকার চালু হ’ল। কারুর গুরুদের এসেছেন। হায়। হেরিব কি মধুর অধর হায়। কাক যদি দক্ষিণ দিকে বসিয়া হায় হায় রব করে তবে তুমি শুভ সংবাদ জানিবে। এই কাকটা কি সাউথে নেই? ইয়েস্। দক্ষিণেই তো হায় হায় টাইপের একটা সাউণ্ড করল না ব্যাটা? ...খুব কনফিউসিং। যে-কাকটা এখন খাঁচার নর্থ-এ বসে একটা সাউণ্ড দিল, সেটা যে একটু পরেই সাউথে চলে যাবে না, তার কোনো মানে নেই। যাচ্ছেও। ওমনি কিন্তু মানেটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শুভটা অশুভ আর অশুভটা হয়ে যাচ্ছে শুভ।

গিলের উপর কয়েকটা কাক বসেছে। এরা বাইরের কাক। খাঁচার কাক দেখতে এরা এসেছে। এসেই কা-কা করছে। কাক জাতির বড় ঐক্য। আগে অনেক বেশি বেশি কাক আসত। খাঁচার বাইরে বসে, খাঁচার দিকে চেয়ে চ্যাঁচাত। এসে মুগ্ধ কর বলত। তখন কাকতাড়ুয়া রাখা হ’ত। মাটির হাঁড়ি, মানে টেরাকোটা, পোড়ামাটি আর কি, তাতে চুনের বড় বড় সাদা চোখ। মিস্টার বাগটির একটা ছেড়া কোটও ছিল। কয়েকটা দিন কাক কম এসেছিল। তারপর একদিন একটা কাক হাঁড়ির মাথায় বসল, একটা কাক ভয় কীরে পাগল, আমি তো আছি, বলে কোটের হাতায় হেগে দিল। এরপর থেকে কাকেরা আবার আসতে লাগল খাঁচার সামনে। কাকতাড়ুয়ার মডেল চেঞ্জ করতে হয়েছে কয়েকবার। হাঁড়ির গায়ে চক্ষুস্থানে গর্ত করে তাতে বাণ্ড ফিট করা হ’ল। তাতে লাল আলো, জ্বলছে নিবছে জ্বলছে। ক’দিন কম ছিল। আবার কাক করে কা-কা আগে অ পরে আ। এরপর আরও সফিসটিকেটেড কাকতাড়ুয়া বানানো হ’ল। হাঁড়ির মুখের জায়গায় গর্ত



করে ওখানে ফিট করা হ'ল একটা স্পীকার। রেডিওর কারেন্ট অ্যাফেয়ার অনুষ্ঠানের গ্যাট চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে বিশেষজ্ঞদের ভীষণ ভাষণ টু-ইন-ওয়ানে রেকর্ড করে ঐ ক্যাসেট চালানো হল। কিছু জীবনমুখী বাংলা র্যাপ চালানো হ'ল। কিছুদিন স্বাধীন কাকেদের উপদ্রব কম। এরপর আবার ছাপিয়ে, কারও বুকে মাথা রাখা কোনো নীলাঞ্জনার জন্য ইকো সমন্বিত জীবনমুখী হায় হায় ছাপিয়ে, স্বাধীন কাকের খাঁচার কাকেদের জন্য সমবেত হায় হায় করে ওদের প্রাচীন কা-কা শব্দ। শেষকালে ভল্টুকেই কাকতাড়ুয়া করা হ'ল। কাকতাড়ুয়া লাইভ।

ভল্টু এখন থিলের সামনেই বসে থাকে। হাতে এলুমিনিয়ামের বন্দুক। ক্যাপও থাকে। ফটাস্ ফটাস্। ফাটালে কাকেরা চলে যায়। তাই বলে যখন তখন ফটাস্ ফটাস্ ক্যাপ ফাটাতে পারে না ভল্টু। কারণ, হয়ত মিঃ বাগচি রিসার্চ করছেন। বিকাশ বাগচি হলেন একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি ল্যাবরেটরিতে কাকের পাকযন্ত্র নিয়ে রিসার্চে মগ্ন। তখন তো আর ফটাস্ ফটাস্ ক্যাপ ফাটানো চলে না। কিংবা থিলের বাইরে লালগাড়ি, নীলগাড়ি, গণ্যমান্য মানুষেরা এসেছেন সব, তখন তো আর ফটাস্-ফটাস্ চলে না। তাই, হাতে যদিও বন্দুক ও বারুদ, বন্দুকটা শুধুই সামনে উঁচিয়ে হুস্ হুস্ করে প্রাচীন কায়দায় কাক তাড়াতে হয়। বাগচি বলছিলেন- এটাই শাস্ত্র ভারত। টেকনোলজি আসে, কিন্তু প্রিমিটিভিটি থেকেই যায়। মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ভল্টুর হাতে যখন বন্দুক তুলে দেওয়া হয়েছিল, ভল্টুর খুব আনন্দ হয়েছিল। ভেবেছিল...

কাকের খাঁচাটাকে বারান্দা থেকে সরিয়ে ঘরের ভিতরে যে নিয়ে যাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু কাক সম্পর্কে যা-যা জানা গেছে তাতে মনে হচ্ছে স্বাধীন কাকেরা ঘরের ভিতরেও ঢুকে যেতে পারে। ঘরের ভিতরে কা কা রব কি ভালো? কাকের রবে বেডরুমে বেদনা আসে। কাকস্য পরিবেদনা বলে একটা কথা আছে। ঘরের ভিতরে কা-কা রব হলে কী হয়? - কাকচরিত্রে লেখেনি। কাকচরিত্র ব্যাপারটাই ফালতু। ওটায় কি খুব একটা বিশ্বাস করেন নাকি মিসেস বাগচি? এটা একটা ফান্! মজা।

গড়াই এল। নো গড়াই, নো মোর। আর কাক দরকার নেই এখন।

-আর কাগ লাগবেনে? গড়াই তবুও বলে। না, দেখছে তো আছে। মিসেস বাগচি বলেন।

গড়াই দুঃখ পায়। গত এক বছর ধরে কাক সাপ্লাই করছে গড়াই। বাগচি বহুল প্রচারিত বাংলা কাগজে জ্যাস্ত কাক চাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। চিঠিপত্র এসেছিল। বেশির ভাগই দালাল। দালাল নিঃ প্রঃ কথাটা লেখা হয়নি বিজ্ঞাপনে। দালালরা ভেবেছিল বোধ হয় মোটা কোনো দাঁও। ফরেনে কাক যাবে। একজন দালালের সঙ্গে এরকম কথাবার্তা।

-আপনার এডভাটাইজ দেখে ফোন লাগাচ্ছি। কোত মাল চাই।

-বেশি না, মাসে দেড় ডজন।

-ব্যাস! এতো কোম এক্সপোর্ট করে আপনার কি ফয়দা হোবে!

-এক্সপোর্ট করব কে বলল!

-তোবে কী কোরবেন?

-আছে, কাজ আছে।

-ও, তান্ত্রিক কিরিয়া কোরবেন। ওসব কাজে আমি হার্গিস ক্রো সাপ্লাই কোরি না।

আর একজন কম বয়সী সাপ্লায়ার ঠিকানা জোগাড় করে এল।

-কাক চাইছেন?

-হ্যাঁ।

-কটা?

-মাসে দশ বারোটা।

-দাম কী রকম দেবেন?

-কত চান?

-আপনিই একটা রেট দিন না আগে।

-কুড়ি টাকা পিস্।

-মাত্র?

-একটা কাক আবার কত? প্লেন্টি অ্যাভেইল্বেল।

-ধরাটা যে মুশকিল। এ জন্যই রেট বেশি, পায়রা সস্তা।

-আপনি কীভাবে ধরবেন?

-আমি ধরতে যাব কেন? গৌতম ঘোষের ফ্লিমটা দেখেননি?

-কোনটা?

-ঐ যে একটা আর্ট ফ্লিম। টিভিতে দেখিয়েছিল। কাকমারাদের নিয়ে। যদি বাস্ক নিতেন, শ হিসেবে, ওদের সঙ্গে কন্ট্রাস্ট করতাম।

-কীভাবে?

-যে ভাবেই হোক। আমি হলুম সাপ্লায়ার। করতেই হ'ত। তবে মাসে দশ বিশটার অর্ডারে কোনোও ডীলই চলে না।

মাসে দশটার বেশি কাক কোন কাজে লাগবে ডক্টর বাগচির? ওঁর দরকার কাকের পাকযন্ত্রের। ডিসেকশন করে ঈসোফ্যাগাস থেকে অ্যানাল হোল পর্যন্ত ইনট্যাক্ট বার করে নেবেন তিনি। তারপর পুরো সিস্টেমটাকে বড় করবেন, লম্বা করবেন, বৃহৎ করবেন, তারপর মানুষের মধ্যে রিপ্লেস্ করবেন। এই হচ্ছে তাঁর কাজ। আগামী প্রজন্মকে সুখী করবার মহৎ প্রকল্পনা। সমাজসেবা।

আইডিয়াটার জন্য জ্বর কাছে ওবলাইজ্‌ড মিঃ বাগচি। একদিন একটা শার্ট পরেছিলেন মিঃ বাগচি, ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, এমন সময় মিসেস বাগচি চিৎকার করে উঠেছিলেন - পোরো না, পোরো না ওটা। ওখানে কাক পটি করেছে। বাগচি দেখলেন বাঁ হাতের কাফলিংকের পাশে একটা গুটলি পাকানো ইয়োলোইশ সলিড মাস। ডান হাতের দু আঙুলের মৃদু টুক্কিতে ওটা ফেলে দিলেও একটা হাঙ্কা দাগ রয়ে গেল। মিসেস বাগচি বলেছিলেন, এঁ ম্যাঁ... ডান হাতে ধরলেন! কিঁ করে খাঁবেঁ...। মিঃ বাগচি বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বলেছিলেন, ধুৎ, কাকের গুয়ে কি জার্ম থাকে নাকি? কিছু না ভেবেই কথাটা বলেছিলেন। এমনই। গাড়িতে যেতে যেতে ঐ কথাটা মিঃ বাগচিকে চেপে ধরল। আচ্ছা, সত্যিই কি কাকের ষ্টুলে জার্ম নেই! অথচ কাক কী না খায়। কফ, পুঁজ, রক্ত, পচাগলা আবর্জনা, সব খায়। কোনো কক্সাস, কোনো

কোলাই, কোনো... ইনফেক্শন হয় না কেন? হতেই তো পারে। স্ট্রং ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কিন্তু মানুষের হয় এমন কেন! অল্পেই অসুখ।

রতনবাবু ওর শালার দশ হাজার টাকা চুরি করে পাগল হয়ে গেল। হজম হয়নি। উইক ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। অথচ মানসবাবু দিব্বি সিমেণ্টে মাটি মিশিয়ে চলেছে। স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মেয়ে পড়ে লোরেটোতে, নিজে রোটারি ক্লাবের মেম্বর হয়েছেন। স্ট্রং ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। কাকের। এটা অবশ্য অন্য কথা। তবে এটা ঠিক, যে কাকের বডিতে জীবাণু মারার কল সাটানো রয়েছে।

ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে বাঁ হাতের হাতা থেকে হলুদাভ সাদা গুঁড়ো, যা কিনা কাকমল, কাচের স্লাইডে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন ব্যাকটেরিয়া নেই। বৈজ্ঞানিক বিকাশ বাগচি নতুন গবেষণার একটা যুগান্তকারী বিষয় পেলেন। এখন দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, কাকের পাকস্থলীতে কী আছে। কী এনজাইম বেরচ্ছে প্যাংক্রিয়াস থেকে, স্ট্রমাকের অ্যাসিডের পি.এইচ. কত, বিলিরুবিনে ঘনত্ব কত: এজন্যই দরকার কাক।

ভল্টুকেই বলেছিলেন মিঃ বাগচি। ভল্টু প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। প্রথমত ধামার গায়ে দড়ি বেঁধে সেই দড়ির এক মাথা হাতে নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত, ধামার তলায় কুচো নিমকি। কাক এলেই দড়িতে টান। কিন্তু ধামাটা স্থিতাবস্থার সামান্যতম বিঘ্ন ঘটানোর আগেই কাক পালায় প্রতিবার। এ ভাবে কাক ধরা যায় না। অন্যান্য কিছু পাখি অবশ্য এভাবে ধরা যায়। কাকের বুদ্ধি কি বেশি! সে আবার অন্য গবেষণার ব্যাপার।

ধামাকে বিভিন্ন অ্যাপ্রোচে রেখে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করল ভল্টু। হ'ল না। নতুন বুদ্ধি করল ছোট পিচকিরিতে ক্লোরোফর্ম ভরে কাকের নাক টিপ করে মেরে দেখেছে, ক্লোরোফর্ম কখনই কাকের নাকের আশেপাশে লাগেনি। এই বুদ্ধিটা মিসেস বাগচির। উনি গৃহিণী সচিব জায়া। কিন্তু কাকেরা মিসেস বাগচিকে নয়, ভল্টুকেই ঠোকরাত, দেখলেই। এর পরই বিজ্ঞাপন। এখন কাক দেয় গড়াই। ও অদ্ভুত কায়দায় কাক ধরে। ও থাকে হাওড়া জেলায় আমতার কাছে। একটা গর্ত করে নেয়। ফুট তিনেকের। গর্তের ভিতরে ছিটিয়ে দেয় ছেড়া রুটি। রুটির লোভে কাক গর্তে নেমে গেলেই গর্তের উপরে বিছিয়ে দেয় জাল। পলিটিকাল মাতব্বররা এ ভাবেই মানুষ ধরে।

এখন গড়াই এসেছে। কিন্তু ও কাকের নতুন অর্ডার পায় না। ওর কাঁধে ঘা। কাকেরা ঠোকরায়।

-কেন, স্যারের রিচার্স কি বন্ধ!

মিসেস বাগচি বললেন - না, বন্ধ কেন হবে, এখন আর লাগছে না।

-কবে লাগাদ খপর করব?

-দিন পনের পরে এসো।

-বাবু যদি লোবেল প্রাইজটা পেয়েই যায়, আমি কিন্তু মোটা টাকা বকশিস লোবো, বলে রাখলুম, হ্যাঁ।

গড়াই ওর কাঁধের ক্ষতের উপর হাত বুলোয়। যাবার সময় ল্যাবরেটরির কোনায় রাখা কাকের পালকগুলি পলিথিনে নেয়। ওগুলো পাচলায় বেচে দেবে। ওসব দিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার শাটল কক্ হয়। কালো কক্ কম দামি। ছেলে পিলেরা খেলে। শাটল কক্ ওড়ে, কাকও ওড়ে।

গড়াই এখন যাচ্ছে। পাঁচিলে, ইলেকট্রিক তারে, ঝোলানো ব্যালকনিতে ঝুলে থাকা দোলনায় বসে থাকা উদাস কাকেরা গড়াইকে দেখে কিংবা দেখে না। কাকেরা জানে না, খেলা হবে বলে ওদের পালক বন্দি আছে পলিথিন ব্যাগে।

কাকদের খিদে পেয়েছে। খেতে দে ভল্টু... মিসেস বাগচি স্তিরিও ছাপিয়ে বললেন। ভল্টু রুটি দেয় ছিড়ে ছিড়ে। কাকেরা ঝাপিয়ে পড়ে। রুটি ছো মারে। নাচে। আহা নাচে নাচে। এইসব কাকেরা একে একে মরবে।

এখন খুব একটা কাক দরকার হচ্ছে না মিস্টার বাগচির। আগে প্রতিদিন তিন চারটে করে লাগত। আলাদা আলাদা করে স্ট্রমাক, লিভার, গলব্লাডার, স্প্লিন (spleen), প্যাংক্রিয়াসের টিস্যু, এনজাইম অ্যানালিসিস করতে হয়েছে, DNA সংস্থান জানতে হয়েছে, এরকম কত কঠিন কঠিন কাজ। ভল্টু ছিল এ্যাসিস্ট্যান্ট। কনুই পর্যন্ত ঢাকা গ্লাভস্ পরে খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে খপ্ করে কাক ধরে নিত। তারপর নিয়ে যেত স্যারের কাছে। স্যার ক্লোরোফর্ম মাখা রুমাল চেপে ধরতেন কাকের মুখে। কাক কা বলারও সুযোগ পেত না। মানব কল্যাণে শহিদ হয়ে যেত।

মিঃ বাগচি ভেবেছিলেন পুরো সিস্টেমটাকেই ক্লোনিং করাবেন। কোষ যেভাবে বাড়ে, একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে... আটটা... ষোলটা... সেই ভাবেই এক কঠিন কৃত্রিম উপায়ে কাকের পুরো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে বাড়িয়ে বড় করে মনুষ্যোপযোগী করে তুলবেন। আর একেবারে গলনালী থেকে পায়ু পর্যন্ত মানুষের সিস্টেম টাকে উপড়ে ফেলে ওখানে ল্যাবরেটরির কাকদের এনলার্জড সিস্টেমটাকে ফিট করে দেবেন। মানুষের সব কিছু হজম হয়ে যাবে এর পর। ব্যাপারটা খুবই গোপন। মিসেস বাগচি ছাড়া আর কেউ জানে না। ভল্টুও নয়। ভল্টু শুধু জানে কাকদের নাড়ি থেকে ওষুধ তৈরি হচ্ছে। বেশি জানাজানি হয়ে গেলে বিদেশের কে কখন পেটেন্ট করে নেবে ঠিক আছে! জগদীশ বসু - মার্কনির কেস্ কে না জানে।

এই ব্যাপারটা সাকসেসফুল হ'লে মানুষের কোনো পৈটিক রোগ থাকবে না। আন্ত্রিক-ট্রান্স্রিক হবে না। যেমন কাকদের হয় না। হাসপাতালগুলিতে কাজের চাপ কমে যাবে। জল ফুটিয়ে খেতে হবে না। ফলে প্রচুর ফুয়েল সাশ্রয় হবে।

কীগো, ব্যাপারটা দারুণ হবে না? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিকাশ বাগচি। স্ত্রী বলেছিলেন, দারুণ! দারুণ! এবং চুপন। সে সময় বৈজ্ঞানিকের বাঁধানো দাঁত খুলে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা প্রচুর ভোগালো। কাকের ঈসোফ্যাগাস, মানে গলনালীর সেলগুলো মরে যাচ্ছিল, কিন্তু লিভারের সেলগুলো বেঁচে থাকছিল। কাকদের লিভার বড় ঝুং। তখন সেলগুলো বাঁচাবার জন্য একট সল্যুশন দিতেই গলনালীর সেল বেঁচে যায় তো লিভারের সেল মরে যায়। কারণ লিভারের সেল-এর পক্ষে সেটা আবার ওভার ডোজ। এইভাবেই কালো পাথরের টেবিলতলে কত কাক হ'ল বলিদান। এর কোনো স্মারকস্তু নেই। শুধু কালো শাটল কক্।

শেষকালে অনেক কৌশলে সেলগুলো বাঁচাবার একটা কায়দা করা গেল তো বেশি বাড়ানো গেল না। মানুষের ইনটেস্টিন বাইশ ফুট, কাকের নয় ইঞ্চি। মানে, ইনটেস্টিনটা বড় করতে হবে উনত্রিশ গুণ। অথচ গলব্লাডারটা ষোল গুণ বড় হ'লেই চলবে। লিভার আঠের গুণ! কাকের প্যাংক্রিয়াস্ ছোট। কারণ গ্লুকোজ পোড়াবার জন্য ইনসুলিন বেশি দরকার হয় না কাকের। ওড়াউড়িতেই গ্লুকোজ শেষ হয়ে যায়। ফলে

কাকের প্যাংক্রিয়াসকে চল্লিশ গুণ বড় করতে হবে। ব্যাপারটা একদম হোমোজিনিয়াস নয়। মোস্ট হেট্রোজিনিয়াস। সেল বাড়াবার জন্য স্টিমুলাস দেওয়া হয়। আটগুণ বাড়ার পর লিভার বেড়ে যায় তো প্যাংক্রিয়াস ছিড়ে যায়। এরকম আর কি।

ব্যাপারটা ছেড়ে দেবার কথা ভাবলেন মিঃ বাগচি। ইতিমধ্যে হাজারটা কাক মরে গেছে, তাতে পাঁচ হাজার শাটল কক্ তৈরি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিকাশ বাগচি সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। উনি প্রবাদ বাক্য জানেন। মহম্মদ পবর্তের কাছে না গেলে পর্বত মহম্মদের কাছে যায়। উনি ভাবলেন কাকের পরিপাক যন্ত্র যদি বড় না-ই করা যায় তো মানুষকে কি কাকের সাইজে আনা যায় না, কাকের মতো না হোক, কিছুটা ছোট? মানুষকে যদি একের চার বা একের পাঁচ করে দেওয়া যায়, আর কাকের পাকযন্ত্রকে পাঁচগুণ বড় করে দেওয়া যায়, তা হলেই তো ব্যাপারটা মিটে যাবে। একেই তো বলে অ্যাডজাস্টমেন্ট।

আমি কিছু ছোট হই, তুমি কিছু বড় হও, তাই না? – মিসেস বাগচিকে বলেছিলেন বৈজ্ঞানিক। আবার তুমি রিসার্চ কর, আমি তোমার পাশে আছি, মিসেস বাগচি বলেছিলেন মিস্টারকে। এরপর আবার দাঁত খুলে গিয়েছিল।

আবার রিসার্চ। নাড়ানাড়ি, ঘাটাঘাটি, পরিশ্রম, মাইক্রোস্কোপ, চা-কফি, সিগারেট। কী একটা ইনজেকশন আবিষ্কার করলেন মিঃ বাগচি।

একদিন ভল্টুকে ডাকলেন। ওর গায়ে হাত বুলোলেন। মাথায় হাত বুলোলেন ইঞ্জেকশন্ দিলেন। বললেন কিছু না, ভিটামিন। হাত বুলোলেন আবার, স্পিরিট-তুলোর হাত। একমাস পর ভল্টুকে মাপা হ'ল। ওজন নেওয়া হল। ওজন দু কেজি কমেছে। হাইট কমেছে দেড় সেন্টিমিটার। ওটা কিছু প্রমাণ করে না। ওজন এমনতেও কমতে পারে। আর হাইটের ক্ষেত্রে দেড় সেন্টিমিটার কোনো ব্যাপারই নয়। সুতরাং আবার পরিশ্রম। কফি, সিগারেট।

দিন সাতেক পর আবার ভল্টুর ডাক পড়ল বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে। আবার হাত বোলালেন। ইঞ্জেকশন্। হাত বোলালেন। এখন কাকের খাঁচার সামনে ভল্টু। ভল্টু রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাককে দিচ্ছে। কাকেরা খায় আর নাচে। আহা নাচে নাচে।

সখা দেখা দাও আমায়

নইলে এ জীবন যায়।

গুরুবন্দনা চলছে অনন্ত অ্যাপার্টমেন্টে। অনন্ত পাঁচিলের গায়ে অনন্ত ঘুঁটে। একে চিলতে আকাশে একটা কাক। ল্যাবরেটরির দরজা ঠেলে বার হলেন মিঃ বাগচি।

-কী করছিস ভল্টু! খাওয়াচ্ছিস? বাঃ। আয়। ওঘরে চল। ঠিক সাতদিন আগেই ইঞ্জেকশন্ দিয়েছিলাম না?

-হ্যাঁ। আজও আবার? না। উহঁ।

-না, আজ আর নয়। আজ তোর ওজন নোবো।

-ভিটামিনের কাজ দেখাবেন বুঝি?

-হুঁ।

ওজন নিলেন। উচ্চতাও। দ্রুত চলে গেলেন বেডরুমে।

ওগো শুনছ? ইউরেকা। ভল্টুর হাইট চার সেন্টিমিটার কমে গেছে। ওজন তিন কেজি।

বাঁধানো দাঁত নড়ে গেল।

বাইরে এসে ভল্টুকে ডাকলেন ডঃ বাগচি। মাথায় হাত বুলোলেন।

গান চালালেন ডঃ বাগচি। কলের ট্যাপ খুলে দিলেন, ডানলোপিলোয় ঝাপ মারলেন, কাচের শার্সি ভাঙলেন একটা লাথি মেরে। ভল্টু অবাক দেখতে লাগল। কী লজ্জা! ভল্টুর পায়ে হাত দিয়ে ফেললেন ডঃ বাগচি। তারপর হঠাৎ কাকের খাঁচার দরজা খুলে হাত পুরে দিয়ে খপাৎ ধরলেন একটা কাক। তারপর জওহরলাল নেহেরুর পায়রা ওড়ানোর ছবি যেমন, সেই কায়দায় কাক ছেড়ে দিলেন একটা। বললেন, ছুটি। কাকটা গিলের ফাঁক দিয়ে মেঘ ছিটানো আকাশের দিকে বের হবার আগে ভল্টুর মাথায়, হ্যাঁ, ভল্টুরই মাথায় ঠুকরে গেল একবার।

তখন গোধূলি।

গোধূলি লগনে কাকে ঠোকরাইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

## যন্ত্রপাতি

প্রদীপ আর পৃথার দারুণ মিল। আশ্চর্য সমঝোতা, সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। বউ বলেই স্বামীকে চা খাইয়ে জাগাতে হবে প্রদীপ সেটা বিশ্বাস করে না। পৃথা সপ্তাহে চারদিন সকালে উঠে চা বানিয়ে প্রদীপের মাথার কাছে ছোট টেবিলটায় আলতো রেখে, প্রদীপের প্রায় ঢাক-পড়া মাথায় আঙুলের নরম চিরুনি বুলিয়ে বলে, ওগো, চা। আবার প্রদীপও সপ্তাহে তিন দিন সকালে উঠে চা বানিয়ে পৃথার মাথার কাছের ছোট টেবিলটায় প্লেট সমেত ঠক করে রাখে এবং ঠক শব্দেই পৃথা উঠে যায়। বউ বলেই স্বামীর গেঞ্জি-জাম্বিয়া-আগারওয়ার-রুমাল ইত্যাদি কাচাকুচি করে দিতে হবে এরকম সূত্রে প্রদীপের বিশ্বাস নেই। কই, প্রদীপ তো পৃথার সায়া-ব্লাউজ-ব্রা কেচে-টেচে দেয় না। এ জন্য ওরা একটা ওয়াশিং মেশিন কিনেছে। সেমি অটোমেটিক। ওর মধ্যে গেঞ্জি-ব্রা-জামা-শাড়ি একই সঙ্গে বেশ ঘোরে। মেশিনটা অবশ্য পৃথাই হ্যাণ্ডেল করে, অপারেট করে, যত্ন করে।

ওদের শিশু সন্তানটি ঘন ঘন হিসি করে বিছানায়। বারবার ন্যাপকিন পাল্টাতে হয়। ফলে রাতে ঘুম হয় না ভাল। প্রদীপ ও পৃথা রাত জাগা ভাগ করে নিয়েছিল, ভুল বলা হল, প্রদীপ ভাগ করে দিয়েছিল। তোমার চার, আমার তিন। মানে প্রদীপ সপ্তাহে তিন দিন রাতে বাচ্চার ভিজে কাঁথা পাল্টানোর দায়িত্ব নেবে, এ ব্যাপারে পৃথার কোনও হেডেক্ থাকবে না। আর বাকি চারদিন ওইসব পৃথাই করবে। এই তিন দিন চার দিন ভাগটা প্রদীপ ঠিক করার সময় শনিবার রাতের ঘুমটা নিজের ভাগেই রেখেছে এবং রবিবার সকালের চা-টা পৃথার। এইসব ভাগাভাগির জন্য একটা গর্ব প্রদীপের বুকের মধ্যে সকালের পকেট ঘড়ির মতো টিকটিক করে বাজে। এ নিয়ে ঘরে কোনোও ঝামেলা হয়নি। মানে সাংসারিক ঝামেলা। সংসারে ওরা খুব ডিসিপ্লিন্ড। যন্ত্রের মতো। খুচরো ঝামেলাটা হয়েছিল অফিসে।

প্রদীপের শিফ্ট ডিউটি। বাচ্চাটা হবার পর বস্কে বলে-করে নাইট ডিউটিটা অ্যাভয়েড করছে ও। তা একদিন এমারজেন্সি নাইট ডিউটি পড়ে গেল। রাত দুটো আড়াইটা নাগাদ ওদের কাজ শেষ হয়ে গেলে ওরা শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাচ্চা হিসি করেছে কিনা দেখার অভ্যেস ইতিমধ্যেই রিফ্লেক্স হয়ে গেছে। প্রদীপের ঠিক পাশেই শুয়েছিল ওর সিনিয়ার সহকর্মী দ্বিজেনদা। দ্বিজেনের সঙ্গে প্রদীপের আবার খারাখারি। দ্বিজেনদা সেই রাতে অন্তত তিনবার এই, এ সব কী হচ্ছে বলেছিলেন। অফিসে চাউর হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ পারভারটেড হয়ে গেছে, প্রদীপকে ফিস ফিস করে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, কী, ঘটনাটা কি সত্যি? শেষ পর্যন্ত প্রদীপকে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ হেডিং দিয়ে কুড়ি কপি স্টেটমেন্ট জেরক্স করতে হয়েছিল।

এই ঘটনার পর বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল প্রদীপ। পর পর কদিন ভীষণ মাথা ধরেছিল। পৃথা কোলের উপর প্রদীপের মাথাটা নিয়ে টিপে দিতে দিতে বলেছিল, থাক বরং আমাদের সোনার কাঁথা-টাখা আমিই পালটাব। আবার হঠাৎ হঠাৎ কখন নাইট ডিউটি পড়ে যাবে তখন আবার বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। তুমি বরং ঘুমিও। প্রদীপ বলল, তা কি হয় নাকি। দু-জনের মেয়ে। যা কিছু কষ্ট-টস্ট ফিফ্টি ফিফ্টি ভাগাভাগি করে নিতে

হবে। এ কথা ভাবতে ভাবতে প্রদীপের মনে হল পৃথার কোলে মাথা রেখে ওকে দিয়ে এভাবে মাথা টেপানোটা কি ঠিক হচ্ছে? এবং মাথা যখন আছে যখন-তখন ধরতেই পারে। প্রদীপ পরদিনই একটা মাথা টেপার মেশিন কিনে নিয়ে এসেছিল। ভাইব্রেটার। প্লাগে লাগিয়ে দিলেই কাঁপতে থাকে, কাঁপতেই থাকে। একটু চায়ের জল চাপিয়ে আসি কিংবা গ্যাসটা অফ করে আসি বলে থেমে যায় না। কাঁপতেই থাকে। রেগুলেটর আছে। বাড়ানো যায়, কমানো যায়...।

পৃথা বলেছিল, কার কাছে ভাল লাগে তোমার? নিশ্চই পৃথার কোলে মাথা রেখে পৃথার কাছেই প্রদীপের বেশি ভাল লাগে। কিন্তু প্রদীপের মনে হল মেশিন কী ভাববে। প্রদীপ মেশিনটার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদু বলেছিল। পৃথা একবার তীব্র তাকাল মেশিনটার দিকে। জটিল ভুরু ভঙ্গি। এবার প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাবে। এটাকে কি অভিমান বলা যায়? সেদিন কী হয়েছিল, ছুটির সকালে ধোসা করেছিল পৃথা। প্রদীপের একজন বন্ধুও এসে গিয়েছিল। মিস্ত্রিটা নতুন কেনা হয়েছে বলা যায়। মিস্ত্রিতে বাটা হয়েছিল ধোসার জিনিসপত্তর। প্রদীপের বন্ধু বলেছিল দারুণ হাত পৃথার। খুব ভাল হয়েছে। প্রদীপ বলেছিল, হাত নয়, হাত নয়, মেশিনে, মেশিনে, মানে মিস্ত্রিতে বাটা হয়েছে। প্রদীপ তখন পৃথাকে বলেছিল, হাতে বাটলে এত মিহি হত না, বল।

পৃথা নতমুখে বলেছিল, হুঁ।

তখন কি পৃথার কণ্ঠস্বরে পরাজয় ছিল? হেরে যাওয়া ছিল? প্রদীপ বোঝেনি। প্রদীপ এর কিছুদিন পরে এক গ্রীষ্মের বিকেলে মিস্ত্রিটার মধ্যে ঘুটিয়ে ওঠা ঘুরে যাওয়া দই ঘোলের ক্রমশ লসিয় হয়ে যাওয়া লাস্যময় হ্লাদিত ফেনিল তীব্র বুটবুটির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, পারতে পারতে তুমি এরকম? পৃথা তখন কেন যে হঠাৎ সুইচ অফ করে দিয়ে মুখ ঢেকেছিল দু-হাতে, প্রদীপ বোঝেনি। মিস্ত্রি মেশিনটা নিয়ে আরও কথা আছে। অনেক কথা আছে। অবশ্য মিস্ত্রি মেশিনটারও কিছু নিজস্ব কথা আছে। সব মেশিনেরই কথা থাকে। যারা মেশিনের ভাষা বোঝে তারা ওইসব কথা মানুষের ভাষায় অনুবাদ করে নিতে পারে। পৃথাও ক্রমশ মেশিনের ভাষা বুঝতে পারছে, বুঝতে শিখছে। পৃথা তাই মেশিনের সঙ্গে কথা বলে। মিস্ত্রি চালাতে চালাতে পৃথার মাঝে মাঝে কপালে সরু রেখার ভাজ পড়ে। ছদ্ম হাসির দাগ পড়ে। প্রদীপ লক্ষ করে, আজকাল ঠিক লক্ষ করে। কখনও দেখে দাঁতে চাপা চোঁট, কপালের ঘাম, ঘামের অভিমান।

এরকম ছদ্ম হাসির রেখা, কপাল ও কপালের ঢেউ, ঘাম বিন্দু তৈরি হয় পৃথার শরীরে যখন চৈতালী আসে।

চৈতালীর খবর হঠাৎই পেয়েছিল প্রদীপ অন্য এক বন্ধু মারফত। এই মাইরি, চৈতালী না, ডাক্তার হয়েছে, হোমিওপ্যাথ। দমদমে বসে, হনুমান মন্দিরের উলটো দিকে... প্রদীপ মজা করবে বলে গিয়েছিল। বাইরে কম্পাউণ্ডার। ওষুধ বানায়, নাম লেখে। প্রদীপ ওর নাম লেখাল রমণীরমণ ঘোড়েল। নামটা পড়েই চৈতালী হয়তো হেসে উঠবে। খুব হাসত চৈতালী। সবসময়। প্রদীপের টোকেন নম্বর দশ। বেঞ্চিতে বাচ্চা কোলে বউ-ঝি রাই বেশি। পাঁচ নম্বর চলছে। প্রদীপ চঞ্চল। পর্দার ফাঁক দিয়ে চৈতালীকে একবার দেখল প্রদীপ পনেরো বছর পর।



সাদা শাড়ি পরে এসেছিল সেদিন। টিকিট ও কেটে রেখেছিল। শেষ মুহূর্তে প্রদীপ বলেছিল, যাব না। থিয়েটারের বেল পড়ে গেল দমকল ঘণ্টার মতো। টিকিট দুটো ছিড়ে ফেলে দিয়েছিল চৈতালী। পনেরো বছর আগে। কখনও বলতে পারেনি সুযোগ হয়নি বলার, প্রদীপ কেন সেদিন থিয়েটারে যায়নি। পনেরো বছর হয়ে গেল। এর মধ্যে প্রদীপ মোটা হয়েছে, ভুড়ি হয়েছে, টাক হয়েছে, কাচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট হয়েছে। প্রদীপ ভাবছিল ওকে হয়ত চিনতে পারবে না চৈতালী। যখন জিজ্ঞেস করবে, কী হয়েছে আপনার, প্রদীপ বলবে, গোপন রোগ। কিন্তু সব ভেসে গেল। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চৈতালী চিৎকার করল; ডাক্তার-ডাক্তাররা এরকম চিৎকার করে না। বলল, আরিঝাস। কীরে প্রদীপ, তুই?

তারপর কী খবর কেমন আছিস কবে বিয়ে করেছিস ইত্যাদি থোরবড়ি, এবং শেষকালে ঠিকানা দেওয়া নেওয়া। যাব তার বাড়ি যাব। তোর বউকে দেখে আসব।

প্রদীপ চৈতালীর হাত এবং মাথার দিকে লক্ষ্য করেছিল কয়েকবার। বিয়ে করিসনি?

না।

কেন?

এমনি।

তা হলে নতুন ঠিকানা কেন!

পালটেছি।

দু-তিনবার এসেছে চৈতালী। পৃথা ওর সঙ্গে কথা বলেছে, চা করেছে, আবার আসবেন বলেছে, হাসির রেখা ঝাঁকিয়ে এবং আশ্চর্য ভুরু বক্ররেখা।

মিক্সি মেশিনের সঙ্গে পৃথা এরকমই কথা বলে, এরকমই ভুরু কুণ্ঠিত হয় ওর। হাসির রেখাও এরকমই।

সে দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। পৃথা রান্নাঘর থেকে ডাকল, এই, এদিকে দেখে যাও। বেশ উচ্ছ্বাস, বেশ আহ্লাদ। প্রদীপ গেল রান্নাঘরে। পৃথা বলল, এই দেখো। ওর মুখে যেন প্রেশারকুকারের পুলক শব্দ। মিক্সির সুইচটা অন করল পৃথা টক করে একট শব্দমাত্র হল। তারপর শূন্যতা। স্টিলের চক্রকাঁটা স্থির। পৃথার মুখ স্থির এবং মুখের মধ্যে স্থির পাতলা হাসির প্রলেপ।

প্রদীপ মিক্সির শরীর থেকে পৃথার সরিয়ে দিয়ে নিজে সুইচ ঘোরালো। ওয়ান-টু-থ্রি। লো-মিডিয়াম হাই। মিক্সি স্থির। হাসপাতালের বিছানায় অসুস্থ বন্ধুর কপালে হাত রাখার মতো মিক্সির শরীরে হাত রেখে প্রদীপ পৃথার চোখে চোখ রাখল। আর তক্ষুনি পৃথার চোখের রঙ পালটে গেল। হাসির রেখা পালটে গেল। কপালের ভাঁজ পালটে গেল।

পৃথা বলল, ইশশ্...জিনিসটা।

প্রদীপের তক্ষুনি মনে হল- আটশো পঞ্চাশ টাকা। মনে হল গ্যারান্টি পিরিওড এক্সপায়ার্ড। মনে হল ভোগে।

প্রদীপ বলল, উল্টো-পাল্টা চালিয়েছিলে?

পৃথা বলল, উল্টো-পাল্টা চালাবার কী আছে?

প্রদীপ বলল, না না এসব খুব ডেলিকেট।

পৃথা বলল, আমি আরও ডেলিকেট জিনিস হ্যাণ্ডেল করেছি।

প্রদীপ বলল, তা হলে হঠাৎ থেমে গেল কেন?

পৃথা - এদের কিছু বিশ্বাস নেই।

এভাবেই প্রাণ আরোপ হয়ে যায় মেশিনে। প্রদীপ বলে, ওকে তাহলে গজেনের দোকানে নিয়ে যাই?

গজেনের ইলেকট্রিক জিনিসপত্রের সারাইয়ের দোকান আছে।

প্রদীপের পরিচিত। আবার ওর বন্ধু শিবব্রতর হোমিওপ্যাথি চেম্বার আছে। ও ডাক্তার। কাশতে থাকা সন্তানটিকে তা হলে শিবব্রতর কাছে নিয়ে যাই? বলার মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা থাকে প্রদীপের, প্রায় ততটাই যেন ঘনত্ব প্রদীপের গলায়।

নেবার ইচ্ছে হলে নাও...।

প্রদীপ পৃথার এই অদ্ভুত ঔদাসীন্য লক্ষ করল। ও তো পৃথার কাছেই থাকে।ওকে পৃথাইতো স্নান করায়, তেল মাখায়, গ্রিজ মাখায়, পরিষ্কার করে, মোছে। ওর কিছু হলে পৃথারই তো মন খারাপ হবার কথা। তা ছাড়া ও তো পৃথার কাজগুলোই করে দেয়। সংসারের কাজকর্মের যে সব ভাগাভাগি হয়েছে, বরং বলা ভাল যে ভাগাভাগি প্রদীপ করে দিয়েছে তার মধ্যে রান্না করা, মশলা বাটা পৃথার ভাগেই ছিল, ন্যাচারালি। সুতরাং সারাই করতে নেবার প্রস্তাবে পৃথার কি উচ্ছসিত হয়ে উঠবার কথা ছিল না? ওর কি বলা উচিত ছিল না এফুনি যাও! এবং তখন কি পৃথার ঘাড়ের কাছের চুলপুঞ্জ খলবল করে ওঠার কথা ছিল না? তা হলে পৃথার মধ্যে এতটাই নিরুদ্দেশ কেন! মেশিনটার সঙ্গে এতদিন থেকেও কি বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি হয়নি?

অথচ অন্য মেশিনগুলোর সঙ্গে পৃথার তো ভালই বন্ধুত্ব। গ্যাসের সঙ্গে, ওভেনের সঙ্গে, ফ্যানের সঙ্গে। ফ্রিজের সঙ্গে পৃথার বন্ধুত্বের তো জবাব নেই। প্রতি রবিবার ওর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটায় পৃথা। সখীভাবে থাকে বেশ। ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গেও ভাল সম্পর্ক পৃথার। যেন কিছুটা বয়ফ্রেণ্ড। টিন এজার। সিনেমার টিকিট কেটে দেয়, ট্যাক্সি ডেকে দেয়। টিভি, ভি সি পি-ও সম্ভবত বয়ফ্রেণ্ড। একটু বয়স্ক। ফ্রিজ ট্রিজ সবই বান্ধব! স্টিরিও সিস্টেমটাও বোধ হয় তাই। ওলো সখীর সঙ্গে কিছুটা কুচুটেপনা। ঈর্ষা। কিন্তু সবচেয়ে জটিল সম্পর্ক মিক্সি মেশিনটার সঙ্গে। পৃথা টিভি কিংবা ভিসিপির নির্জন সঙ্গ চায় মনে মনে প্রদীপ কি বোঝে না : চৈতালী যেমন বলে থাকে আসিস রে প্রদীপ তোর বউকে নিয়ে...। ‘বউ’ শব্দটা যে এখানে আবরণ মাত্র প্রদীপ কি সেটা বোঝে না? পৃথার সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলোর সব অদ্ভুত অদ্ভুত সম্পর্ক। বাৎসল্য ভাব আছে অদ্ভুত একটা যন্ত্রের সঙ্গে। কলিং বেল। এই কলিং বেলটা কিন্তু সাধারণ কলিং বেল নয়। সেই যে ওদের বাচ্চাটার কথা বলা হয়েছিল, ওর কাঁথা ভেজানো এবং আনুষঙ্গিক সমস্যার কথা। এর ক-দিন পর একটা অদ্ভুত যন্ত্র কিনে এনেছিল প্রদীপ। প্রদীপের অফিসের এক মহিলা সহকর্মী ওই যন্ত্রটির হৃদিশ দিয়েছিল। একটি প্লাস্টিকের চাদরের গায়ে সূক্ষ্ম তারের কারুজাল লাগানো। এক পাশে ব্যাটারি। বাচ্চা কাঁথার তলায় প্লাস্টিকের মায়াজাল ঢুকিয়ে দিতে হয়। কাঁথা ভিজে গেলেই বেল বাজবে। প্রদীপ বেল সিস্টেম কেনেনি। বেল বাজলে দু-জনেরই ঘুম ভেঙে যাবে। ওদের তো দিন ভাগ আছে, সপ্তাহে চারদিন-তিনদিন। তাই স্পিকার সিসটেম কিনেছিল। স্পিকারের সঙ্গে একটা ছোট ছিপি হেডফোন কানে গোঁজা থাকে। কাঁথা ভিজে গেলেই পিঁপিঁ শব্দ কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। পৃথার যে একে খুব ভাল লাগ প্রদীপ বুঝতে পারে। পৃথা ওকে

গুটিয়ে রাখে। গায়ে হাত বুলোয়, আদর করে। প্রদীপেরও ভাল লাগে ওকে। প্রদীপরা যখন বাচ্চাকে বেড়াতে নিয়ে যায়, যন্ত্রটাকেও নিয়ে যায়। প্যারাম্বুলেটারে বাচ্চাটার তলায় যন্ত্রটা থাকে। কানে ছিপি থাকে না তখন। হিসি হলেই স্পিকারে পিঁপিঁ শব্দ হয়।

পৃথার একটা হেয়ার ড্রায়ার আছে। ওর সঙ্গে পৃথার এরকম কথাবার্তা হয়।

এই হচ্ছেটা কী, পাজি কোথাকার।

সই, কী আবার হচ্ছে।

কোনও কন্সমার না। একদম জানলা দিয়ে ফেলে দেবো।

ফেলুন, দেখিতো...

যেন পার্বতী। কাজের বাচ্চা মেয়েটা। বাচ্চার দুধ গরম করতে বললে একা একা লুডো খেলে। তখন -

এই হচ্ছে কী, পাজি কোথাকার।

কী আবার হচ্ছে -

একদম অব্যাহত তুই। একদম তাড়িয়ে দেবো বলেছিলাম -

দিন না দেখি...

হেয়ার ড্রায়ারটা এরকমই করে। সুইচ অন করলে কখনও চলে, কখনও চলে না। কখনও গরম হাওয়া বয়, কখনও ঠাণ্ডা। অথচ ওকে ফেলে দিতে পারে না। ফ্রিজের সঙ্গে একেবারে দাস্য ভাব।

সখীভাবের সঙ্গে দাস্য ভাব মিশে গেলে কী একটা হয়। বৈষ্ণব কাব্যে আছে। এর সঙ্গে একেবারে বিগলিত থাকে পৃথা। কখনও তর্ক করে না। কটু কথা বলে না। ওর দিকে অপলক চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে হাসে। করস্পর্শ দেয়। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। যত্ন করে ডি-ফ্রস্ট করে দেয়। যত রকমের সেবা আছে পৃথা করে যাবে।

কিন্তু স্টিরিওটার সঙ্গে একটু কেমন যেন। যদিও ওটার ঢাকনি বানিয়ে দিয়েছে পৃথা, ঢাকনিতে ফুল, ধুলোও ঝাড়ে, মাঝে মাঝে ওর দিকে চেয়েও থাকে, কিন্তু ওর প্রশংসা খুব একটা করে না। প্রদীপ কিন্তু স্টিরিওটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হয়তো প্রদীপ বলল, মালটা দারুণ।

কী এমন দারুণ।

বেশ স্মার্ট, স্লিম দেখতে।

দেখতে দিয়ে কী হবে -

কালারটাও ভাল।

তোমাদের খালি ফিগার, কালার...

কেন পারফরমেন্স কি খারাপ?

এমন কিছু নয়।

কেন এমন কিছু নয়? ওর সাউণ্ড বেশ ভাল...

এমন কিছু ভাল নয়...

কেন এমন কিছু ভাল নয়?

আমি এক্সপ্লেন করতে পারব না। তবে এমন কিছু ভাল নয়, ব্যস।

সেই ঈর্ষা ভাব। পৃথাও গান করে একটু আধটু। প্রদীপ ওর প্রথম গান শুনেছিল প্রাক-বিবাহপ্রেম চলাকালীন। আউটরাম ঘাটের সিমেন্টের চেয়ারে মস্তান আসার আগের মুহূর্তে ‘সখি ভাবনা কাহারে বলে’র ভালবাসার ভা’তে এসে থেমে যেতে হয়েছিল। এরপর হনিমুনে অনেক গানের হাফ শুনেছে পুরীতে। হাফ এর পর পৃথা হয় ভুলে গেছি বলে থেমে গেছে, আর যে গান পৃথা পুরো করতে পারত, প্রদীপ এমন কাণ্ড-কারখানা করছিল যে, গান থামিয়ে দিতে হয়েছিল। ও, হ্যাঁ। বিয়ের পর বাথরুম বা রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা হামিং শুনেছে প্রদীপ। লাস্ট শুনেছে সেই মাথা ধরার সময়। যখন পৃথা মাথা টিপে দিচ্ছিল।

তারপর তো বলাই হয়ে গেছে যে প্রদীপ একটা মাথা টেপার যন্ত্র কিনে নিয়ে এসেছিল। টেপার যন্ত্রটা টিপে ও পৃথার প্রিয় গান কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গলায় ‘সখি ভাবনা কাহারে বলে’র ক্যাসেটটা চালিয়ে দিয়েছিল লো ভল্যুমে। প্রদীপের মানে ফানের দরকার নেই, গান হলেই হল: পৃথা এসে একবার ব্যাপারটা দেখে গিয়েছিল। হেসেছিল। ঘাড়ের ঝটকায় চুল নড়ে উঠেছিল। কোনোও কথা বলেনি। একটু পরেই লোডশেডিং হলে পৃথা বলেছিল, বেশ হয়েছে। সঙ্গে একটি হাততালি ছিল। মিস্ত্রিটা খারাপ হয়ে যাবার পর প্রদীপ বলেছিল, ওকে তা হলে গজেনের কাছে নিয়ে যাই।

পৃথা বলেছিল, তোমার ইচ্ছে হলে নাও...।

প্রদীপ মিস্ত্রিটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। সামান্য ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, থাক। যন্ত্রটা নড়ে উঠেছিল। আর তখন কী আশ্চর্য পৃথা হামিং শুরু করেছিল শ্যামল মিত্রের ওই গানটা... ‘যাক্, যা গেছে তা যাক্’।

সেই থেকে মিস্ত্রির দেহখণ্ডগুলি রান্নাঘরের উঁচু তাকটায় পড়ে আছে। মেশিনটা, পাশে দুটো জার। ধুলো পড়ছে। আজ রবিবার। রবিবার পৃথা ও প্রদীপ খুব ব্যস্ত। ওরা খুব ব্যস্ত বলেই ওদের অনেক মেশিন। আর মেশিনের জন্যও ওরা ব্যস্ত। সকালবেলা উঠে চা খেয়েই কাজে লেগে পড়তে হয়। আগেই তো বলেছি ওদের দারুণ মিল। আশ্চর্য সমঝোতা। তাই ওরা সব যন্ত্রপাতিগুলি ভাগাভাগি করে যত্ন করে। অডিও সিস্টেমটাকে প্রদীপই দেখে। হেড পরিষ্কার করে। বই আলমারির ব্যাপারটাও প্রদীপের। বইগুলোকে একবার চোখে দেখা, এই একটু আধটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেয়, দু-চারবার ফুঁ দেয়া, এইসব। ওয়াশিং মেশিনটা পৃথা দেখে। তেল দেয়। কানাটোনায় লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। ফ্রিজটাও পৃথার। ওর জন্য অনেকটা সময় রেখে দেয়। সাপ্তাহিক আলাপ।

টিভি, ভিসিপিও পৃথার। সেলাই মেশিন আছে একটা, ব্যবহার হয় না, তবু আছে। মাঝে মাঝে তেল-টেল দিতে হয়, চাকা-টাকা একটু ঘুরিয়ে দিতে হয়। ওরাও তো ব্যবহার চায়। পৃথাই করে এটা। ওদের বাচ্চাটার কানের ফুটোয় জমে থাকা নরম তুলোয় পরিষ্কার করতে হয়, পৃথাই করে। বাচ্চাটার কানের লতির পিছনে কিংবা উরুসন্ধিতে লেগে থাকা হালকা ময়লা পরিষ্কার করতে হয়, পৃথাই করে। এছাড়া গ্যাসের বার্নারের ছিদ্রগুলিকে পরিষ্কার করা, ব্যাটারি চার্জারে ব্যাটারি ঢুকিয়ে চার্জ করে রাখা, প্রদীপের পিঠে পাউডার মাখিয়ে দেয়া, একটু আধটু খুনসুটি, চুষন-টুষন বা আরও...। টোস্টারের কয়েলের ওপর কার্বনের গুঁড়ো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা, অ্যাস্ট্রে পরিষ্কার করা, এরকম কত শত কাজ। এগুলো পৃথার।

শহরে শহরে রবিবারের সকালের একটি পৃথক শব্দ লহরী থাকে। টিভি সিরিয়ালের শব্দ, প্রেশার কুকারের ফস্ শব্দ, মিস্ত্রির ভোঁ শব্দ... পাশের ফ্লাটে মিস্ত্রির একটানা ভোঁ শব্দ শুনতে লাগল প্রদীপ।

প্রদীপ বলল, বাগচীদের ধোসা টোসা হচ্ছে।

পৃথা বলল, ইচ্ছে করছে? ভেজাব?

প্রদীপ বলল, মিস্ত্রি?

পৃথা বলল, হাত নেই!

মাঝে মাঝে হাতের কথা ভুলেই যায় প্রদীপ। প্রদীপরা। লিফটা বন্ধ হলে পায়ের কথা মনে পড়ে। চোদ্দর সঙ্গে বারো যোগ করার সময় ড্রয়ারের ক্যালকুলেটর হাতড়ায় প্রদীপ, প্রদীপরা। মাঝে মাঝে যেন কীরকম ভুল হয়ে যায়, ভুলে যায় হাত থাকার কথা, পা থাকার কথা, মাথা থাকার কথা।

তবু পাশের বাড়ির একটানা যান্ত্রিক শব্দ প্রদীপকে ক্রমাগত আহত করতে থাকে। আওয়াজটা প্রদীপের বুকের গভীরে ধাক্কা মারতে থাকে। প্রদীপ রান্নাঘরে ঢুকে যায়। হাত বাড়িয়ে মিস্ত্রির হলুদ শরীরটা আঁকড়ে ধরে। শরীরটাকে পলিথিন প্যাকেটে জড়িয়ে নেয়, এবং বলে আমি গজেনের কাছে চললাম।

গজেনের দোকানটা ভারি অডুত। ও সব কিছু সারাই করে। রেডিও, টেপ রেকর্ড, হিটার, টোস্টার, মিস্ত্রি সব। সোয়া ন-টার খবর হচ্ছে। বিহারে হরিজন খুন।

দেখুন দেখুন কেমন গাঁক গাঁক করে বাজছে। তিনটি গ্রাম পুড়ে ছাই। গাঁক গাঁক করে বাজছে। গাঁক গাঁক করে বাজছে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। খন্দের বলল, ভেরি গুড। ভালো সাউণ্ড হচ্ছে। গজেন ধরে আছে রেডিওটা। কাঁটা ঘোরায়। জিস্কি বিবি মোটি।

প্রদীপ মিস্ত্রিটাকে ঠক করে টেবিলের উপর রাখে। পলিথিনের চাদর সরিয়ে দেয়। চৈতালীর কথা মনে হয়। কেন যে মনে হয়। চৈতালী খুব হাসে, পৃথা হাসে না। চৈতালী খুব কথা বলে, পৃথা গম্ভীর। পৃথার যা নেই, তা চৈতালীর আছে। প্রদীপ বলে, একে ঠিক করে দিন। গজেন একবার দেখল ওটাকে। কীরকম তাক্ষিল্য। সে রকম বড় কোম্পানির ছাপ নেই এর শরীরে। বলল, রেখে যান। দেখি কী হয়েছে। এসব মালের কোনও গ্যারান্টি নেই।

মেশিনরাও কি মানুষদের মাল বলে?

পৃথা জিজ্ঞাসা করল, কী খবর?

প্রদীপ বলল, দিন সাতেক পর যেতে বলেছে।

ঠিক হবে?

হতে পারে।

যদি না হয়?

তবে আবার কো-অপারেটিভ থেকে টাকা তুলতে হবে।

টাকা তুলে?

আর একটা নতুন কিনতে হবে।

নতুন কেনার কথা শুনে খুব কিছু খুশি হল না পৃথা। অথচ নতুন মেশিন এলে পৃথা তো খুশিই হয়। এই তো, গত রবিবারই তো যন্ত্র যন্ত্র করার সময় সমবেত যন্ত্র সম্ভারের মধ্যে উৎফুল্ল বসে ছিল পৃথা। সোফার চারিপাশে তা তা থই থই। পৃথা বলেছিল এরা সব আমার। প্রদীপ বলেছিল, আমাদের। পৃথা বলেছিল, সরি, সরি, আমাদের। পৃথা তখন বই আলমারির দ্বিতীয় তাকের দিকে তাকিয়ে ছিল। চাইলড্ কেয়ার। মেনটেনেন্স্ অফ ইলেকট্রিকাল গ্যাজেটস...। পৃথা বলেছিল, এদের না, এ রকম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নামে ডাকতে ইচ্ছে করে না। একটা করে ডাকনাম দিলে কেমন হয়!

প্রদীপ বলেছিল, যেমন!

ওয়াশিং মেশিনটার নাম চাংকি।

প্রেসার কুকারটা?

ফচকে।

ওভেন?

অগ্নিভ।

বড্ড ভারি।

তাহলে দাহ।

যাঃ এ নামে ডাকা যায় নাকি?

তা হলে তুমি বল।

হিটু।

যাঃ, টিভিটা?

ফিলিপস্।

তা তো জানি।

একটু ছোট করে ফিলিপ?

বাঃ।

ভি সি পি?

অঞ্জন।

কেন?

এমনি।

স্তিরিও?

সোহাগী।

হেয়ার ড্রায়ার?

পার্বতী, না পারুল... পরু, পারু।

আমাদের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নেই।

ইশ্ নেই।

প্রদীপ তখন বলল, মিস্ত্রি? ওটার নাম?

ওটাতো হ্যান্ডিক্যাপড। বিকলাঙ্গ।

তবুতো আছে, আমাদেরই আছে।

ওটার নাম তুমিই দিও।

প্রদীপ বলল, চৈ চৈ চৈ...

কবে কোন্ পাড়াগাঁয়ে ধূসর সন্ধ্যায় প্রদীপ দেখেছিল জলের ধারে দাঁড়িয়ে এক গ্রাম্য কিশোরী জলভরা হাঁসদের ঘরে ডাকছে, আয় আয় আয় চৈ চৈ...।

প্রদীপ ডাকে। মনে মনে ডাকে।

জন্মদিন। বন্ধুবান্ধবরা থাকে। পৃথা চিংড়ির মালাইকারি খুব ভাল রাঁধে। নারকোল চাই। তারপর নারকোল থেকে নারকোল দুধ। এ জন্য মিস্ত্রি চাই।

গজেন বড্ড ঘোরাচ্ছে। কেবলই হয়নি হয়নি। প্রদীপ বলেছিল, অন্তত বলে দিন ওটা রিপেয়ার হবে কিনা। গজেন বলেছিল, আমি কি যন্ত্র? প্রদীপ বলেছিল, আমার মেয়ের জন্মদিন। আমায় ডিসিশন নিতে হবে। ঠিক না হলে নতুন কিনতে হবে। এই আমি দাঁড়ালুম। আপনি ওটা খুলুন।

অগত্যা খোলে। গজেন যন্ত্রের মতোই যন্ত্রটা খোলে।

বলে কয়েলটা পুড়ে গেস্‌ল। কয়েলটা ঠিক করে দিলুম। একবারে দু-মিনিটের বেশি চালাবেন না। চালিয়ে দেখিয়ে দিল গজেন, ঘুরছে।

প্রদীপ বলল, ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু...

গজেন বলল, দেখে নিতে চান তো? ঠিক আছে। গজেন ওর স্টিলের টিফিন বাস্কেট খুলে একটা রুটি ছিড়ে দিল মিস্ত্রির জার-এ। একটা কলা, একটু তরকারি। চালিয়ে দিল। এবং কয়েক সেকেন্ডেই পুরো জিনিসটা মগু হয়ে গেল।

ঠিক আছে?

মাথা নাড়ল প্রদীপ।

আপনার কাছে কিছু আছে? দেবেন?

প্রদীপ বলল, উঁহু।

প্রদীপের হঠাৎ মনে হল ওর কাছে এখন কিছুই নেই। ভালবাসা, শোক, অভিমান কিছুই আর তেমনভাবে গোটা গোটা নেই। মগু হয়ে গেছে।

মেশিনটা নিয়ে বাড়ি ফিরল প্রদীপ।

পৃথা! পৃথা! ঠিক হয়ে গেছে।

পৃথা বলল, যাক্!

তারপর ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।

ফ্রিজ থেকে বার করা হল চিংড়ি।

কোরানো হল নারকোল।

নারকোল ঢোকানো হল মিস্ত্রিতে। ঘুরতে লাগল চাকা। চলতে লাগল শব্দ।

প্রদীপ বলল, চলছে চলছে।

কয়েক মুহূর্ত পরই একটা নীল স্ফুলিঙ্গ।

সাদা ধোঁয়া। থেমে গেল।

পৃথা বলল, থেমে গেছে।

প্রদীপ বলল, গজেনটা একটা মাল। ও একটা যন্ত্র। পুরো টুপি দিল। এখন কী হবে?

পৃথা হাসছে। নারকোল দুধ কীভাবে হবে!

কেন হাত?

দুটো হাত ছড়িয়ে দিল পৃথা।

আলিঙ্গন?

প্রদীপ যন্ত্রের মতো এগিয়ে গেল পৃথার দিকে।



## এ জীবন লইয়া কী করিব?

বৃষ্টি পড়ে ট্রাটোর ম্যাটোর সাবওয়ায়েতে জল। মেট্রো বন্ধ গাড়ি কাৎ টেলিফোন বিকল। জানালার শার্সিকে খামচাচ্ছে হাওয়া। হাওয়ায় মেশানো জলরেণু। কাচের শরীরে নাচে জলের কথক।

লোকটা এসব কিছু দেখেনা। লোকটা বসে আছে বেশ আরাম চেয়ারে। আরাম চেয়ারে এখন বিরাম যদিও নেই, তবুও বসেছে। একটু আগে শুয়ে ছিল চিং। দেখছিল ফ্যানের ঘূর্ণন। আর.পি.এম. কত গুণছিল। এখন বসেছে। দেয়ালে অনেক সুইচ। আলো জ্বলে লাল সাদা নীল। সব আলো বন্ধ করে লোকটা বসেছে। এপাশে গদীর চেয়ার খালি। ও পাশে গদীর চেয়ারে গুঁড়ো গুঁড়ো বালি। বাথরুমে বালতিতে জলের ফোঁটারা পড়ে টুপ টুপ টুপ। এ ছাড়া এখন সবকিছু চুপ। লোকটা উঠে বসে। লাল আলো নীল আলো জ্বলে। বন্ধ করে ফের। একা একা জ্বালায় নেভায়। স্তিরিওতে ভরল ক্যাসেট। কী ক্যাসেট দেখেও দেখেনা। অবশেষে বাজল বেহালা। ভুল স্পীড টিপে দিয়ে বেহালাকে বেসুরো বানায়। বেসুরো বাজনার খেলা। নিজের সঙ্গে বেসুরো-বেসুরো এই বেশ খেলা। এইভাবে বেশ বেলা যায় তার। এইবার টি.ভি. চালায়। বিভিন্ন ছবি আসে বিভিন্ন চ্যানেলে। রিমোট কন্ট্রোলে সে অল্প অল্প দেখে। টমেটোর সস্ ও কিচাপ মেখে স্নান করে পাহাড়ি বালিকা। নাট, স্কু ও বন্টুর মালা গায়ে জংলি যুবক গান গায় গুম গুম গুম। রঙিন প্যাকেট ছিড়ে দু'হাতে ওড়াচ্ছে সাদা পপকর্ন। স্যানিটারি ন্যাপকিন আর দরকার নেই বিজ্ঞাপিত করে এক রোবট কিশোরী। সাজানো শ্মশানে মৃতদেহ ঢেকে দিচ্ছে ভিমলের শাড়ি। এই সব পুরোনো পুরোনো লাগে। একটাও ভাল নয়। লোকটা রিমোট কন্ট্রোলে বলে, তিন চার পাঁচ ছয়... অবশেষে আটের নম্বরে আসে সাদার মূর্ছনা। সাদার ভিতরে আসে কালো কালো ঢেউ। ঢেউ-এর ভিতরে আসে স্পট। বেশ লাগে। যন্ত্র শব্দ শোঁ-শোঁ-শোঁ...প্রট্ প্রট্ প্রট্। তারপর উঠে যায় ফের। পায়ের পাতার নিচে মৃদু মোলায়েম ঘাস রঙ পিভিসি কার্পেট ঠিক যেন উইম্বলডন টেনিসের মাঠ। ধীরপায়ে লোকটা বেসিনের সামনে দাঁড়ায়। একটি বেসিন আছে তার, দুধ সাদা রং, প্রিয় স্থান। ওখানে দাঁড়ায় প্রিয় বেসিনের কাছে। একটি আরশোলা আছে। পোষা আরশোলা। বেসিনেই থাকে। কারণ বেসিন থেকে সে বেরুতে পারে না। বেসিনের মসৃণতা বেয়ে চেষ্টা করে উপরে ওঠার। চেষ্টা করে বেসিনের বাইরে যাবার। বারবার পড়ে যায় চামর চিক্কে। লোকটা এর জীবন দেখে। কবে তার পূর্ব পুরুষ কলোসিয়ামে দেখেছিল খেলা। গ্লাডিয়েটার দেখেছিল। এখন আরশোলা দেখে। মাথার ভিতরে এক আনন্দ পিংপং। কী দেখে আনন্দ তার। বারবার ব্যর্থতা-রগড়। বারবার ফস্কাচ্ছে মাইরি, হি-হি, নাকি তার অবিরাম ওঠার প্রচেষ্টা। নাকি এসব কিছুই নয়। লোকটা রোজ রোজ দেখে ঐ প্রিয় আরশোলাটিকে। এখনো দেখছে।

কিছুক্ষণ আরশোলা দেখা হয়ে গেলে লোকটা আবার নতুন খোঁজে। ঘরের ভিতরে তার নতুনের সংখ্যা বড় কম। বড় তাড়াতাড়ি অ-নতুন হয়ে যায় যে কোন নতুন। ব্যবহৃত শুয়োরের মাংসের মতো পুরোনো নতুন। সুখের জন্য আনা যন্ত্রপাতিগুলি যার যার নিজস্ব দুঃখের কথাও জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আবার বিষাদ। তখন প্রাঙ্গণ ভাবে। প্রাঙ্গণের সঙ্গে ভাবে শিশু। প্রাঙ্গণ মানে হল ডাইনিং-এর সামনে স্থান।

একাদোকা হতে পারে মোজাইক নকশায়। লেমম্যান কিংবা রাজা একটি বালিকা চাইল...। এখানেই খেলা হতে পারে। ক্যাবিনেট থেকে নামে খেলার শিশুরা। খেলা হয়, খেলা জমে। পুরো খেলা নয়, খেলাদের মিনি। শিশুরা খেলেনা, শিশুদের পুতুলেরা খেলে।

শিশুদের খেলা মানে সি.ডি. সেভেন সিক্স। বাস্কো যন্ত্র টিপে দিলে আলোর অক্ষর আসে জোছনা-বিষাদ সাদা স্ক্রিনে। চোর চোর... দাড়িয়াবান্ধা... ভলিবল... টেবিল টেনিস...। দাড়িয়াবান্ধা হয়নি বহুকাল। আজ হোক। ফোর ডি টিপে দিলে দাড়িয়াবান্ধা হয়। দাড়িয়া-বান্ধার হৈ হৈ হয়। হিপ হিপ হয়। একদিন ভালবাসা টিপে দেবে নাইন নাইন থ্রি। তৃপ্ত সঙ্গম ফোর লাইন টু। অভিমান, বিরহ, দুঃখ, কাছে পাওয়া, সমস্ত নম্বর আছে কোডে ফেলা। পুতুলেরা খেলে।

যে কোনো খেলার শুরু আছে বলে ভেঙে যাওয়া আছে। পুতুল রেফারি ইশারায় বলে খেলা ভেঙে গেল। পুতুলেরা নতুন নম্বর পাবে বলে বসে থাকে। এই পুতুলেরা আলাদা আলাদা। অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বে পৃথক সবাই। এদের আলাদা নাম ছিল একদিন। এমন অনেক নাম জানা আছে, সেই নাম এখনো কোনো পুতুল পায়নি। সুতরাং বলা চলে এখনো অনেক নাম পুতুল প্রজাতির জন্য বাকি রয়ে গেছে। পৃথিবীতে আরও পুতুলের জন্ম হলে আরও আরও নাম দেয়া যেতে পারে। টেলিস্কোপ নাম দেয়া যেতে পারে, ডাকনাম টিলু। এন্টিমনি দেয়া যেতে পারে, ছোট করে মনি, এরকম পোর্সিলেন, আর্সেনিক, হিলিয়াম, কত নাম পড়ে আছে বাকি। কিন্তু অসুবিধে হ'ল ঐ সাদা রং বাস্কোমেশিন গ্রহণ করে না কোনো নাম। অক্ষর জানে না সে, শব্দমালা মানে না, ইলেকট্রনস্রোত ভালবেসে সংখ্যার বিদ্যুৎস্পর্শ শুধু জানে। পুতুলেরা তাই সব সংখ্যা হয়েছে। সংখ্যামালা নামী সেই প্রাচীনা পুতুল সংখ্যামালা। নাইন নাইন নাইন।

লোকটা এখন এঘর খোঁজে ওঘর খোঁজে। অন্যরকম কিছু পায় না। এ-দেয়াল দেখে, ও-দেয়াল দেখে। অন্যরকম কিছু দেখে না। এই কোনা দেখে, ঐ কোনা দেখে, তখন ঘরের কোনায় আটকে গেল চোখ। এখানে পড়ে আছে প্রজেক্টর মেশিন। একা একা আদুর গায়ে ধুলো মেখে চুপচাপ।

ইস্‌স।

মানুষটার দুঃখ হ'ল।

মানুষটা মেশিনটাকে বললো :

ওঃ স্যাড ভেরী স্যাড ইউ লোনলি এলোন।

মেশিনটা মানুষটাকে বললো :

নট লোনলি, আই সি ইউ ওনলি অল ডে লং

মানুষটা মেশিনটাকে বললো :

হাউ ফানি নাই জানি কি করিয়া হয়।

মেশিনটা মানুষটাকে বললো :

মাইলেন্স গুড পারফরমেন্স জানিও নিশ্চয়।

মানুষটা মেশিনটাকে বললো :

থ্যাংক ইউ মাই ফ্রেন্ড উই উইল সিং অ্যা সং।

মেশিনটা মানুষটাকে বললো :

উই উইল বি গুড ফ্রেন্ডস অল লাইফ লং।

লোকটা এবার প্রজেক্টরের চোখ মুছল। গা মুছল খুব যত্ন করে। তারপর টেবিলে বসাল। উল্টো দিকের দেয়ালের সাদার দিকে মুখ। প্লাগটা লাগাতেই দেয়ালের গায়ে লাগে আলোর চাদর। লেন্সের সামনে মানুষটার আঙুলগুলো নেচে উঠল। ওমনি নাচল ছায়ারা। ছায়া দেখতে বড় ভাল লাগছিল মানুষটার। এখন ছায়ারাও সেভাবে আসে না। টিউবলাইটের আলো ছায়াটায় দেয় না তেমন। হ্যালোজেনের ছায়ায় কেমন মনমরা মনমরা ভাব। শার্সির ভিতর দিয়ে চুইয়ে পড়া চাঁদ কখনো গা ছুঁলে যে করুণ ছায়া হয়, তার সাথে একদিন লোকটির কথা হয়েছিল। শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছিল। আবার আসব বলেছিল ছায়াটি। কিন্তু আর আসেনি এখনো। এদের দয়া হলে, পারমিশন পেলে চাঁদের চূর্ণক কিছু অ্যাডমিশন পায়।

লোকটা এবার প্রজেক্টরকে কী যেন বললো। সাস্তনা দেবার মতো ওর গায়ে বুলিয়ে দিল হাত। বললো, ওল্ডিজ ইজ গোল্ডিজ। তারপর একটা ড্রয়ার টানল। ড্রয়ারের ভিতরের লাল মখমল মোড়া একটা বাক্স। বাক্স খুললেই রঙিন ফিল্মের স্লাইডস। লোকটা প্রজেক্টরে একটা স্লাইড ভরে দিল। দেয়ালে রং ভরা মেঘ, সূর্য ডুবুডুবু। একটা একটা স্লাইড -

দেয়ালে সবুজ ঝিলে কতশত পদ্ম ফুটিয়েছে।

দেয়ালে কদমতলে ময়ূর ময়ূরী নাচে।

দেয়ালে আম্রশাখে গাহিছে বুলবুলি

দেয়ালে যুবতী নারী পরনে কাঁচুলি।

এবার ঘটল এক মজার ব্যাপার।

দেয়ালের ছবির নারী, ঐ আলোর নারী মূর্তিমতী হল। রক্তবতী, মাংসবতী হল, মানুষের শরীর পেল। দেয়াল থেকে বেরিয়ে এল। আর ওমা! কী কাণ্ড, মেয়েটার চোখ থেকে ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা জল। বললো, শাপমুক্ত হলাম। লোকটা ভাবল, এ কী ব্যাপার! মেড ইন হল্যান্ড, এত ভাল, এত দামি প্রজেক্টর, এমন বিগড়লো; লোকটা স্লাইডটা টেনে বার করল। দেখল সাদা।

মেয়েটা বললো আপনি বাঁচালেন আমায় প্রিয়, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম। আমার ফিল্ম জন্ম শেষ, মানুষ জন্ম পেলাম। খিঁদে পেয়েছে, খাব।

লোকটার চোখে মুখে কোনো 'একী হল' ভাব নেই। লোকটা মেয়েটার দিকে সোজা চোখে চায়। মেয়েটা আবার বলে, খাব। লোকটা বলে, আছেতো টিনড মাশরুম। বহুক্ষণ পরে, বহুদিন পরে লোকটা কোনো কোনো প্রকৃত প্রাকৃত কথা বলে। মেয়েটি বলে, মুড়ি-ফুলুরি নেই? লোকটা বলে, এসব হয় না এখন। বাড়ির তলার ম্যাক বারে হটডগ পেতে পার। খাবে? মেয়েটা অবাক হয়ে তাকালে লোকটা বলে, জানোনা, হটডগ! নামও শোননি! কী নাম তোমার? মেয়েটা বললে, বাবা নাম রেখেছিল সাবিত্রী। সিনেমায় যখন নামলাম, সবিতারাণী কিছুদিন পরে মিস স্যাবি।

তারপর?

তারপর নাচি। সেই নাচ সিনেমায় হয়। সতীবেহুলায় নাচি অমরায়, ইন্ডের সভায়, পদ্মাবতী নাচি পুরীর সভায়, জয়দেব সিনেমার নাম, মিস কিটির এক্সট্রা হয়ে নাচি রাতের কলকাতা বইয়ে, সিঁথির সিঁদুরে নাচি ধূপকাঠি হাতে নিয়ে মন্দির চাতালে।

তারপর?

তারপর ভুল হল। প্রেমে পড়লাম। ধুতির উপর হাফশার্ট। গান গাইত যমুনা কিনারে শাজাহানের স্বপ্নের শতদল। কাচি সিগারেট খেতো, মুড়ি-ফুলুরি ভালবাসত, রথের দিনে পাঁপের ভাজা খেত, হাতে থাকত উল্টোরথ বই। মেকাপম্যান। কিগো, শুনছো তো?

গো অ্যাহেড...

তখন এল যে বরষা সহসা মনে রিমঝিম রিমঝিম গান গেয়ে যাই। সতীনাথ। সতীনাথ গো। তখন নাচে ভুল হয়। ছন্দে ভুল হয়। ছেনালির ভিতরে ঢুকে যায় ফুলতোলা। একদিন ক্যাবারের নাচে ভুল করে আরতির ছন্দ চলে আসে।

হ্যাঁগো, শুনছো তো...

এ্যাহেড...

ঐ বইয়ের যে ডিরেক্টর ছিল, ভারী হিংসুটে। ভারী যাদুকর। আসলে সে একা চাইত আমায়। কিন্তু আমার জীবনে যে আরেকটা বই চলছে তখন; মেকাপম্যান গো...। একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললো, প্রেম পাগলিনী তুই ফিল্ম হয়ে যা। সেই থেকে আমি ফিল্ম।

ভারী অদ্ভুত তো, শরীরটা সেলুলয়েডে মিশে গেল? মিশে যেতে কতটা সময়? লোকটা বলে। মেয়েটা বললো, কতক্ষণ জানিনা। শুধু মনে আছে জোড়হাতে কী যেন বলতে চেয়েছি। তক্ষুণি শোনা গেল - একহাজার আটবার প্রজেকশন হলে পরে মনুষ্যজন্ম পাবি ফের। তার মানে একহাজার সাতবার দেয়ালে পড়েছি। তুমিই বাঁচালে। কীগো...শুনছো না...।

গো...।

কি গো!

গো অ্যাহেড।

ক্ষিদে পেয়েছে। কতবছর খাইনি কিছুই। ক্ষিদে? দেখ, ফ্রীজে দেখ, কি রয়েছে দেখ...। মেয়েটা অল্প হাসে। বৌ নেই বুঝি আপনার! এবার এগুল। সামনেই আয়না রয়েছে। এইবার লজ্জা পেল। দু'হাতে ঢাকল দেহ। ছুটে গেল সামনের ঘরে। ওখানেও দর্পণ রয়েছে। দরজায় খিল দিয়ে দর্পণে নিজেকে দেখে। ব্রা ও প্যান্টিতে সেই কবেকার ক্যাবারে কালের। তাড়াতাড়ি বিছানার চাদরে নিজেকে জড়াল। চাদরে পুরুষ গন্ধ। মেয়েটি ঋতুমতী হল বছকাল পরে। এই যে মেয়েটি, সাবি, মিস স্যাবি, যে কিনা এখন আবার সাবিত্রী হয়েছে, গান গায়...। সাত ভাই চম্পা জাগোরে জাগোরে। তুড়ি দেয়। খুশিতে ভরেছে মন। লোকটার কাছে যায়। বলে, মুড়ির টিন কই, মুড়ির টিন?

লোকটার কথা নেই কোনো। অপলক মেয়েটিকে দেখে। মেয়েটির হাসি দেখে। হাসলে যেন মেয়েটির মুখ থেকে রেডিয়াম ঝরে। লোকটা নিয়ে আসে তিনটে প্যাকেট। বলে খাবে যদি খাও...। লাল প্যাকেট হাতে

নিয়ে মেয়েটা বলে, কী আছে এতে?

স্পঞ্জ। স্পঞ্জের গুঁড়ো। ক্ষিদে মরে যায়। নীল প্যাকেটে হাত দিয়ে মেয়েটা বলে, কী এতে? চিনি ও চর্বি। হাই ক্যালোরি। শক্তি। হলুদ প্যাকেট মেয়েটি বলে, আর এই মুখপোড়া প্যাকেটে?

বিস্কুট! বিস্কুট! জিভে টেস্ট লাগে।

বিস্কুট, শুনেই হাত হল থাবা। চিরলো প্যাকেট। বিস্কুট খেয়ে বললে আঃ। ‘আঃ’ শব্দের বিসর্গ দুটি কাচের বল হয়ে ঝড়লগুনে ঝুলতে লাগল সুখে। মেয়েটি বললো ইচ্ছেক দানা বিচ্ছেক দানা দানার উপর দানা। বললো কুমকা গিরা রে। বললো মন ডোলেরে... মেরা তন...।

লোকটাকে বললো হ্যাগা, মানুষ, কর কী?

কিছুই করি না।

মানে! বেকার নাকি? ঘরদোর দেখে তো মনে হয়না। আপিস নেই?

আছে।

আজ যাওনি?

ছুটি।

তবে আমার জন্য শাড়ি কিনে আনো গে যাও। সায়া, ব্লাউজ। ছত্তিরিশ সাইজ। এবেলা খেয়ে খাইয়ে ওবেলা চলে যাব। জ্বালাব না বেশি।

কোথায় যাবে?

বাড়ি। তেঘড়িয়া গ্রাম। এরোপ্লেন নামার শব্দ শোনা যায়। হাঁস আছে, আয় আয় আয় চৈ চৈ...। এখনো আছে তো? বুলুদির বাড়ি, পাকা ছাদ, বাড়িতে রেডিও। শুক্রবারে নাটকের ভিড় ওদের বারান্দার সামনে। আমাদের বাড়িতেও এল তারপর। জয়দেবে পদ্মাবতী নেচে রেডিও আনলাম মার্ফি কোম্পানির। এখনো আছে তো, নিয়ে যাবে? বিদ্যেধরী খালে নিয়ে যাবে, সোঁদর বনের ইন্সটিমারের তো, খড়ের নৌকা, শিউলি তলায় যাব খুব ভোরে, একটিও ফুল মাড়াব না পাবে... যাব। আমি আর প্লাস্টিকে নেই, রক্তের হয়েছি আমি, মাংসের হয়েছি। মেয়েছেলে। তোমরা যাকে বল নারী।

লোকটা হাসে। বলে, ঐ সব কবে চুকেবুকে গেছে। তেঘড়িয়া নাম আছে শুধু। ফ্ল্যাটের জঙ্গল। হাঁসটাস, পুকুরটুকুর এইসব চাও যদি দেয়ালে দেখ। প্রজেক্টর আলোকে দেখ, ইউম্যাটিক দেখ...। নারীটা বললো, তোমার ওসব অংবং মানেই বুঝি না। বলগো কী করি উপায়? কী আর করবে তুমি, থাকো।

রিল্যাক্সন পালঙ্কে থাক। রাতের বেলায় সোনার রড ছুঁইয়ে দেব, ঘুমবে। ওটা ভাইব্রেটার। সকালে রুপালি এলার্মে জেগে উঠবে ফের। তারপর?

বল তুমি বল তারপর?

নানা, তুমিই বল!

আমি আবার কী বলব?

তারপর ভাত রাঁধব।

সে তো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে হয়।

বাটনা বাটবো।

মিক্সি আছে।

ফুল তুলব।

প্লাস্টিক পিভিসির ফুল।

তোমার জামা কাচব, গেঞ্জি কাচব।

ওয়াশিং মেশিন।

ঘর ঝাড়ু দেব।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার।

তোমায় ঘুম পাড়াব।

ভাইব্রেটার।

গান শোনাব। গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি।

স্তিরিও।

কানে কানে কথা কব।

হেডফোন।

মেয়েটা হঠাৎ দু'হাতে আঁকড়ে ধরল ওর মেঘবরণ চুল। ডুকরে উঠল। বললো, এ জীবন লইয়া তবে কী করিব, কী করিতে হয়?

লোকটা বললো, সফটওয়ার শেখো। কোবল, জিপসি, সিপিসি...।

মেয়েটা কাঁদতে লাগল। ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না। লোকটা ধীরে ধীরে বেসিনের কাছে গেল। সেই সাদা বেসিন। শ্বেত মসৃণ। মসৃণ দেয়ালে সেই প্রিয় আরশোলা। লোকটা ডাকে বলে, দুঃখ কোরো না, এদিকে এসো, মজা দেখবে এসো।

এ মজা দেখব না আমি। আমি দেখব আকাশের মজা। বক দেখব, চিল দেখব। ছেলের হাতের লাটাই দেখব। আমি দেখব নারকোল কুঁচি দেয়া ঝালমুড়ি রুপ। চাল ধোবো। গা ভিজিয়ে স্নান করব শাপলাপুকুরে। নতুন বৃষ্টির গন্ধ নেব, পুরুষের ঘামগন্ধ বুকের ভিতরে। লোকটা তবু হাতছানি দেয়। ডাকে। সাবিত্রীর পা নড়ে। জল এগোয় না, তৃষ্ণা এগোয়। সাবিত্রী মানুষটার পাশেই দাঁড়ায়। লোকটা বলে, দেখ দেখ দেখ। সাবিত্রী দেখে দুধবরণ সাদা তেল চিকচিক বেসিন দেয়ালে বেচারা আরশোলা বারবার পড়ে যায়, তবু সে তার সরু সরু পায়ে মসৃণতা আঁকড়ে ধরে বেসিন রাজ্যের বাইরে যেতে চায়। সাবিত্রীর আরশোলাটাকে ভাল লেগে যায়। ওরা দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরশোলা দেখে। মুক্তির প্রচেষ্টা দেখে। দেখতে দেখতে সাবিত্রী এক সময় ক্লান্ত হয়। লোকটার ধরে। বিছানার চাদর জড়ানো আদি মানবী লোকটার হাত ও বাহুমূল ধরে। হাওয়া বয় শন্থন, তারারা কাঁপে। লোকটা হাত ছিটকে চলে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে পালঙ্ক নরমে। পালঙ্কে ওঠে স্পঞ্জ ডেউ। লোকটা সোনার কাঠি বের করে। সোনালি রড। বললো, ঘুমোবো। মেয়েটা ছুটে যায়। লোকটার হাত থেকে কেড়ে নেয় ঐ সোনার কাঠি। বলে এখন ঘুমিও না ওগো, আমার সঙ্গে জেগে থাকো।

এখনো তারা আকাশে জ্বলে, মনে যে আমার কথাটি বলে। লোকটা কিন্তু রাগে না। সাবিত্রীকে বকে না, মারে না। স্থিরিতে কী একটা মিউজিক চালিয়ে দিয়ে বেসিনটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

সাবিত্রী পালঙ্কে বসে। দু'হাত হাওয়ায়। গা থেকে খসে যায় চাদর বন্ধল। গান গেয়ে ওঠে, আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, হারিয়ে যাব আমি তোমার কাছে... লোকটা ওদিকে চায় না, আরশোলায় দিকে চায়...।

সাবিত্রী সে সময় আরশোলাটার দিকে ধেয়ে যায়। উথাল পাথাল পা। আরশোলাকে ছুইয়ে দেয় ঐ সোনার কাঠি। আরশোলাটা কিন্তু ঘুমোয় না। সাবিত্রী তখন লোকটাকে হঠাৎ আলিঙ্গন করে। লোকটা হ্যাঁ-ও করল না, নাও করল না। আস্তে আস্তে ওয়াশিং মেশিনটার কাছে গেল। সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, এটা নতুন কিনেছি, নতুন মডেল। মেশিনটাকে বললো, হ্যালো,ভালো? মেশিনটার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। লোকটা মেশিনটাকে চুমো খেল একটা। তারপর শুয়ে পড়ল সানমাইকা লাগানো রঙিন পালঙ্কে। সাবিত্রীর চোখে তাকিয়ে মৃদু হাতছানি দিল হাতে। সাবিত্রীর মুখে টগর ফুটল, হাসনুহানা ফুটল। সাবিত্রী পায়ে পায়ে এগুলো। লোকটা বললো, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সাবিত্রী তখন পদ্মপাতা ডান হাতটা খুলেছে সবে, শুরু করেছে ঘুমপাড়ানি গান। লোকটা তখন ওর বাম হাত থেকে কেড়ে নেয় সোনার কাঠি। নিজেই নিজের মাথায় ছোঁয়ায়, আর লোকটা ঘুমিয়ে পড়ে।

সাবিত্রীর পদ্মপাতা হাত গুটিয়ে যায়। মুঠি হয়। সেই মুঠিটা শক্ত করে ধরে ঐ রড। ওটাকে মুষলের মতো ধরে। ভীষণ জোরে বাড়ি মারে ঐ ওয়াশিং মেশিনে। - ওলাউঠো। তক্ষুণি রডটা ভেঙে যায়। ছোট ছোট স্প্রিং ও ব্যাটারি, ট্রানজিস্টার, এইসব মাটিতে পড়ে থাকে। আপদ ভেঙেছে, এই ভেবে এইবার শ্বেতকমল বেসিনের কাছে যায়। ওখানে দুধ ধবল দেয়ালে ঐ আরশোলা একই কাজ করে যায়। বলে, আরশোলায় আরশোলা, তুই ওকে যাদু করেছিস। শঠের মায়া তালের ছায়া। বলে, তুই থাকিস জলে আর আমি থাকি ডালে, মোর সাথে দেখা হল মরণের কালে। সাবিত্রী তখন আরশোলাটাকে মুঠো করে ধরতে যায়। গা থমথম গা থমথম গা থমথম করে। আরশোলাটার পা ধরে দু'আঙুলে তীব্র টান দেয়। তখন আরশোলাটার গা থেকে স্প্রিং-এর পা, ধাতব পা খুলে আসে, প্লাস্টিকের ডানা খুলে আসে, কাচের চোখ পড়ে যায়, আর সানমাইকার পালঙ্কে শুয়ে থাকা লোকটা। ছটফট করে ওঠে। স্পঞ্জ খাট কেঁপে ওঠে। আর আরশোলাটার, স্প্রিং-এর আরশোলাটার বুকের ভিতরে জল থলথল ছোট্ট একটা নরম মটর দানা। ঐ নরম মটর দানাটাও ওর গা থেকে পড়ে যায়। সাবিত্রীর মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে সোহাগে রয়েছে ছোট্ট মটর দানার মতো ছোট্ট নরম একটা প্রাণ পুঁটুলি। ওটা টিপে দিলেই লোকটা মরে যাবে। সাবিত্রী ওর আঙুল প্রসারিত করে পদ্মপাতা করে। তার ঠিক মধ্যিখানে শিশির ফোঁটার মতো টলটল করছে প্রাণবিন্দু। জীবন। মানুষটার জীবন।

এ জীবন লইয়া কী করিব, কী করিতে হয়?

## আবর্জনা হইতে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের আশ্চর্য প্রযুক্তি

পঞ্চাননের বয়স যখন ছ'মাস মাত্র, কান্নার মধ্যে বলেছিল নাকি পিড়িং পিড়িং। আসলে বলতে চেয়েছিল ইসপিরিং, শুদ্ধ বাংলায় যা স্প্রিং। পঞ্চানন দু বছর বয়সে একটা হাত ঘড়ি ভেঙে ফেলে ঘড়ির ভিতরের নাড়ি ভুঁড়ি পর্যবেক্ষণ করেছিল, পাঁচ বছর বয়সে রেডিওর ভিতর থেকে চুম্বক সমন্বিত স্পিকারটি ডিসেকশন করে ফেলে। কিন্তু তখন সে জগদীশচন্দ্র বসুর নাম জানত না, সুতরাং ওকে আরও বারো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল যখন ও রেডিওর স্পিকারটি মুখে লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বলে বেড়াতে পারছে আই অ্যাম জে. সি. বোস। আরও কিছুদিন পরে ও আইনস্টাইনের নাম শোনে, ছবিও দেখে। জগদীশ বোসের চেয়ে ওর আইনস্টাইনকেই পছন্দ হয়। ও তখন আইনস্টাইনের মতো গোঁপ রাখার চেষ্টা শুরু করে কিন্তু ওরকম হয়নি। ওর গোঁপ পাতলা। এবং এই সময় ও গ্যালিলিও, নিউটন, এঁদের ভুল ধরতে শুরু করে। প্রথমে যে ভুলটি ধরেছিল সেটা হ'ল জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত তত্ত্বের। ও হাটে মাঠে বক্তৃতা করে বেড়াত চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে নদী-সমুদ্রের জল ফুলে গিয়ে জোয়ার ভাটা হয় এটা পুরো গাঁজা। চাঁদ যদি সমুদ্রের জলকেই টানবে, তার আগে মেঘকে টেনে নিত। কারণ মেঘ চাঁদের আরও কাছে। তা হলে আকাশে মেঘ থাকত না, সব মেঘ চলে যেত চাঁদে।

পঞ্চানন প্রথাগত শিক্ষা বেশিদূর নিতে পারেনি। স্কুলের গণ্ডি পেরুনো হয়নি ওর। অনেক মহাপুরুষেরই তা হয়নি।

স্কুলের বাংলার স্যার অসীমবাবুর একটা কথা পঞ্চাননের বারবার মনে হয়। অসীমবাবু বলেছিলেন জন্মেছিস যখন একটা দাগ রেখে যা। পরে জেনেছিল আসলে ওটা রামকৃষ্ণের বাণী। আর পঞ্চানন তো জানেই পৃথিবীতে বহু বড় বড় আবিষ্কারের অনেকগুলিই অ্যাক্সিডেন্ট। নিউটন যদি তখন মন খারাপ করে বাগানে না বসে একটু লুডো খেলতেন, দেখতেন আপেল? আর আপেল না হ'লে কি অভিকর্ষ আবিষ্কার হ'ত? এক্সরের আবিষ্কারও একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আরবের বণিকরা বালির উপর এক ধরনের কাঠ দিয়ে রান্না করতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন বালির উপর কাচের জন্ম। অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পিছনেও একটা অ্যাক্সিডেন্ট। পঞ্চাননও একটি অ্যাকসিডেন্টের অপেক্ষায় থাকতে লাগল।

পঞ্চানন সর্বদাই এটার সঙ্গে ওটা মেশায়। ছাগমূত্রের সঙ্গে কোকাকোলা, তার মধ্যে ডিজেল; ভিটামিন A ও D সমৃদ্ধ শিশুর মালিশের সঙ্গে দেখো আমি বাড়ছি মাম্মির গুঁড়ো মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করেছে, গিনিপিগের অভাবে ঝুপড়ির বাচ্চাদের গায়ে মালিশ করতে গিয়ে পেটাই খেয়েছে, তবু দমে যায়নি। মাছের একোরিয়ামে মাছের বাচ্চাদের কমপ্লানের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে মন্ত্র পড়েছে বাড়ন্ত বাচ্চার জামা গেঞ্জি ছোট হয়...। পঞ্চানন হাতিবাগান থেকে কেনা খরগোশের বাচ্চাকে উজালাতে চুবিয়ে দেখেছে আরও সাদা হয় কিনা। এরপর অন্য ধরনের পরীক্ষা শুরু করেছে। দাঁত মাজে না। বাঘ কি দাঁত মাজে? অথচ বাঘের দাঁত মানুষের চেয়ে অনেক শক্ত, অনেক সাদা, সাবানও মাখে না। খরগোশ সাবান মাখে? হরিণ মাখে? আর নিজের পোশাকে প্রয়োগ



করেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব। ধরা যাক একটা পরিষ্কার জামা পরে চলেছে পঞ্চানন, আস্তে আস্তে জানাটা হ'ল। তখন ঐ এক নম্বর জামাটা রেখে দু নম্বর পরিষ্কার জামাটা পরতে থাকল। ক্রমে ক্রমে দু নম্বর জামাটাও নোংরা হ'য়ে গেল। এবার এক নম্বর এবং দু নম্বর জামা দুটোর মধ্যে যেটা পরিষ্কার সেটা পরতে থাকল এবং এটা বেশি নোংরা হয়ে গেলে ওটা। কারণ আপেক্ষিক ভাবে ওটা তখনো পরিষ্কার। এইভাবে সে কোনদিনও না কেচেও পরিষ্কার জামাটাই পরে থাকে। পঞ্চানন এখন পাঁচু। পাঁচু পাগলা ডাকলেও উত্তর দেয়, আইনস্টাইন ডাকলেও।

পরিবেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হল বিশ্বজুড়ে। পঞ্চাননও সেই চিন্তা ভাবনার শরিক হল। পঞ্চানন গাছ লাগাল। গরু গাছ খেয়ে নিল বলে গরুকে প্যাডাল, গো-ভক্তেরা পেটাই খেল। এরকম নানারকম পেটাইয়ের ফলস্বরূপ শরীরে বেশ কিছু দাগ। 'এসেছিস যখন একটা দাগ রেখে যা' - এ ভাবেই পঞ্চাননের জীবনে সত্য হয়েছে।

পঞ্চানন একদিন খবর কাগজে দেখল আবর্জনার সদ্যবহার করার জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আসছেন। আবর্জনা থেকে জ্বালানি উৎপাদন হতে পারে, সার হতে পারে, এমনকি কাগজ, পিসবোর্ড, বা প্লাস্টিকও হ'তে পারে। এই খবরটা যেন পঞ্চাননের চোখ খুলে দিল। পঞ্চাননের ডেইলি লাইফের অনেকটাই কাটে আবর্জনার পাশে পাশে। ফুটপাতে শোয়। পাশেই আবর্জনা, আবর্জনাকে তেমনভাবে কখনো দেখেনি পঞ্চানন। নদীর কিনারে যারা থাকে তারা নদীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় না। পঞ্চানন এবার আবর্জনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি দিল। 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখিও তাই, পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন' - ছোটবেলায় শেখা ঐ লাইনটায় সুর সংযোগ করল পঞ্চানন, এবং এই গানটা ওর জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠল। জঞ্জালগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পরম শ্রদ্ধায় এই গানটা গায় পঞ্চানন। পঞ্চানন ক্রমশ আবর্জনা এক্সপার্ট হয়ে উঠল। পঞ্চানন লক্ষ করতে থাকল এক এক জায়গার আবর্জনার চরিত্র এক এক রকম। দমদম প্রফুল্লনগর কলোনির সামনের আবর্জনায় লটে মাছের মাথা, কাঁঠালের ভূতি, কয়লার ছাই, এসব পাওয়া যায় - সন্টলেক, লেক গার্ডেনস বা গল্ফ গ্রীনের আবর্জনায় এই দ্রব্যগুলি একেবারেই পাওয়া যায় না। এখানে ম্যাগির প্যাকেট, পলিথিনের ব্যাগ, চকোলেটের রাংতা। গোল, চ্যাপ্টা ইত্যাদি বোতল, নানা ধরনের প্যাকিং কাগজ ইত্যাদি প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। বড়বাজার অঞ্চলে শালপাতা, ফলের টুকরো এসব বেশি, কিন্তু খিদিরপুর রাজাবাজারে মাংসের হাড়গোড় বেশি। অনেকদিন আগে শুনেছিল আমেরিকার আবর্জনায় নাকি পুরোন রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ওয়াশিংমেশিন এমনকি গাড়িও পাওয়া যায়। সন্টলেক এলাকার আবর্জনায় দু একটা ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি পেয়েছিল পঞ্চানন, দু একটা স্প্রিংয়ের খেলনা, ব্যাগ, অন্য যন্ত্রপাতি তেমন পায়নি। পঞ্চানন ঘুরতে ঘুরতে ইস্টার্ন বাইপাসে 'শিল্পে ভরিয়ে দাও' উপনিবেশে একটু নতুন ধরনের আবর্জনার সন্ধান পেল। 'শিল্পে ভরিয়ে দাও' আবাসনে শিল্পোদ্যোগীরা থাকেন। বিদেশী এক্সপার্টরাও আছেন। ঘন ঘন বিদেশে যান, এবং দেশী সাহেবরাও প্রচুর পরিমাণে বসবাস করেন সেখানে। সেখানে প্রতিটি বাড়ির ছাদে ডিশ এন্টেনা, প্রতিটি বাড়ির নিচে গাড়ি, প্রতিটি বারান্দায় ক্যাকটাস, পাতাবাহার, বাহারি শাড়ি, ম্যাক্সি, স্কার্ট, সন্দের সময় হরি ওঁ! এই উপনিবেশের পাশেই কয়েকটা কারখানা, কারখানায় বিদেশী প্রযুক্তি, বিদেশী পেটেন্ট - কী ডিসেন্ট। এখানে যে আবর্জনা, তা কিন্তু অন্যধরন, অন্যবরণ, অন্যরকম সেন্ট। এখানে

আবর্জনা স্তুপে একদিন ভাঙা টেলিভিশন পেয়ে গেল পঞ্চানন, টেবিল ল্যাম্প, ফিউজ আর্ক লাইট, পিভিসি টিউব, স্পঞ্জ, কনভেয়ার বেল্ট, এটা ওটা কলকজা, নানান জিনিস। তা ছাড়াও গল্ফ গ্রীন সল্টলেক লেক গার্ডেনস- এ যা পাওয়া যায়, তা তো আছেই।

পঞ্চানন একদিন ঐ জঞ্জালের স্তুপ থেকে মেশিনপত্রগুলি আলাদা করে বাছতে লাগল। একটা বড় চুম্বক পেয়ে গেল, বাচ্চার ছবি আঁকা ফোটোটা কেবলই ঐ চুম্বকের গায়ে লেপ্টে থাকে। একটা ভাঙা টেবিল ফ্যান পেল। পেয়ে গেল একবাক্সো সিলিকন চিপস। আরও আরও নানা ধরনের কলকজা পেল। ভাঙা টেলিভিশনটা খুলে কলকজাগুলি সব আলাদা আলাদা করল। এত টেকনিকাল জিনিস ও জীবনে একসঙ্গে দেখেনি। ঐ জঞ্জাল স্তুপকে মনে হ'ল একটা বিশাল ওপেন এয়ার ল্যাবরেটরি, এবং ও নিজে ঐ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর, ওর মনে হ'ল এত সুন্দর ল্যাবরেটরি পেয়ে ওর কিছু নিশ্চয়ই আবিষ্কার করা উচিত। ও আবিষ্কার করতে শুরু করল।

পঞ্চানন একটা আশ্চর্য মা কালীর মূর্তি পেয়েছিল, দম দিয়ে দিলে জিভটা নড়ে, চোখের তারা ঘোরে, একটা পা পদতলের মহাদেবের বুকে পড়ে, আবার পা উঠে যায়। মহাদেবের বুকে পা পড়লেই মহাদেব বলে ওঠে - আঃ। যন্ত্র একটু খারাপ ছিল, পঞ্চানন নিজ গুণে এটা ঠিকঠাক করে নিয়েছিল। কালীমাতার পায়ে তার পৌঁচিয়ে সেই তার টিভির পিকচার টিউবে, তারপর সেই তারে নানারকম বাতিল বিদেশী টুকরো-টাকরা যন্ত্রপাতির অংশ, ট্রানজিস্টার, সিলিকন চিপস, মদের বোতল, অসভ্য বইয়ের ছেড়া পাতা, এইসবের সঙ্গে কানেকশন করতে লাগল। এক একটা কানেকশন করেই প্রত্যাশা করছে একটা অ্যাক্সিডেন্টের। অ্যাক্সিডেন্ট মানেই আবিষ্কার। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট কিছুতেই হচ্ছিল না। এমনি করে অনেক দিন গেল। পঞ্চানন আবিষ্কারের নেশায় মশগুল। তারপর পঞ্চানন কে জানে কী ভেবে আটফুট লম্বা, পিভিসি পাইপটার মাঝখানে একটা গর্ত করল। পাইপটার দু ফুট মতো ব্যাস। মাঝখানের গর্তে একটা গাড়ির ভাঙা স্টিয়ারিং ফিট করে দিল। নানা জিনিস পৌঁচিয়ে তারের নেগেটিভ পাইপের এক প্রান্তে আর পজিটিভ আর এক প্রান্তে যোগ করে দিল, আর অমনি বহু প্রতীক্ষিত অ্যাক্সিডেন্ট। মা কালীর জিভ মুখের ভিতরে ঢুকে গেল। মহাদেব উঠে দাঁড়ালেন, টিভির পর্দায় কী যেন আঁকি-বুকি -পাইপটা কাঁপছে।

আর্কিমিডিস ইউরেকা ইউরেকা বলেছিল। উদ্ভেজনায় পঞ্চাননের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'জয় হিন্দ'।

এই পিভিসি পাইপটা প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু এটার কী নাম দেয়া যায়? নিজের নামটা অক্ষয় করে রাখা যায়, ও একটা চক দিয়ে পি ভি সি পাইপের গায়ে নাম লিখবে ভাবে। কী লিখবে - পঞ্চানলোগ্রাফ? পাঁচুস্কোপ? ও চিন্তা করতে থাকে। নাম রাখবার আগে তো জানা দরকার এই যন্ত্রটা মানুষের কোন কাজে আসবে, কী উপকারে লাগবে। সেসব পরে হবে। যন্ত্রের হল যন্ত্র। সব যন্ত্রই কি মানুষের উপকারে লাগে। অনেক যন্ত্রের আছে ফর শো। শুধু ঘর সাজানোর জন্য। অনেক যন্ত্রের আছে, সভ্যতা সাজানোর জন্য। সেসব পরে ভাবা যাবে। ও চক দিয়ে নাম লিখল PANCH, পাঁচুর হুস্ব উকারটুকু বাদ দিল। ও উচ্চারণ করবে পঞ্চ। অনেকে পড়ল প্যানচ। দেশি বাঙালি যদি পড়ে এটা, উচ্চারণ করল প্যাঁচ। পাঁচু কিছুই না ভেবে জ্যান্ত পাইপের একধারে কিছু জঞ্জাল পুরে দিয়ে হাতল ঘোরাল, পাইপের অন্য প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এল জিনের প্যান্ট। কী আশ্চর্য রে ভাই, আবার জঞ্জাল পুরে দিয়ে একই রকম হাতল ঘোরাল, বেরিয়ে এল মোটা

হিলের জুতো। পঞ্চাননের বুক ধুকপুক করতে লাগল। অন্ধকার দেখতে লাগল। জঞ্জালের মধ্যে শুয়ে পড়ল পঞ্চানন। কিন্তু জঞ্জালের গোপনে লুকিয়ে থাকা স্পিঞ্জ ওকে আবার উঠিয়ে দিল। পঞ্চানন কিছু পুরোন খবরের কাগজ, নতুনের প্যাকেট, জুতোর বাক্সো, মুরগির হাড়, ঢুকিয়ে দিল-বেরিয়ে এল একটা স্যাণ্ডউইচ টোস্টার। ছেঁড়া ব্রেসিয়ার, ন্যাপকিন, গিট বাঁধা রবার ঢুকিয়ে দিয়ে হাতল ঘোরাল, গ্লসি পর্ণোগ্রাফির বই বেরিয়ে এল। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে উঠেছে পঞ্চানন। আবর্জনা থেকে তৈরি হচ্ছে জিনিসপত্র। এইসব গরীবদের বিলোবে ও, বিলি বন্দোবস্ত করবে। পঞ্চানন এবার হর্ষবর্ধন, দাতাকর্ণ, রবিনছড। অসীমবাবু, অসীমবাবু গো, দ্যাখো দাগ রাখলাম। ওরে ওই ভেঁপু, পল্টু, ছাকু, পল্টি, বাণ্টু, আমায় টিল মারতিস না, এবার নোবেল প্রাইজের টাকাটা একবার পেতে দে, দুনিয়ার সব কাকদের ডেকে ঝালমুড়ি খাওয়াব, তোদের দেবনা। পঞ্চানন পাইপের ওপাশের প্রোডাক্টগুলির দিকে মায়াদৃষ্টিতে দেখে। নেকটাই, ব্লু জিনস, স্পোর্টস সু, গীটার, সেলুলার ফোন, ফ্যাক্স পেপার, মোটর সাইকেলের সীট...এসবে ভরে উঠেছে। এইসব কাকে বিলোবে পঞ্চা! হারু জ্যাঠা কী করবে নেক টাই? জটিবুড়ি কী করবে ব্লু জিনস? এসব ভিথিরিদের কোন কাজে লাগবে। দিলেও নেবে না। ওই ভেঁপু পল্টু পল্টি বাণ্টুদেরই এসব দিয়ে দিতে হবে। পঞ্চানন কিন্তু তুলো, ব্যাণ্ডেজ, প্যাড এসব খুঁজে মেশিনে পুরে হাতল চালান-জয় মা কালী, মা কালী হে-একটা গামছা, একটা গামছা যেন আসে, মাইরি, একটা শক্তপোক্ত গামছা...।বেরিয়ে এল সুইমিং কস্টিউম।

জঞ্জাল কমে আসছে, জড়ো হচ্ছে জিনিসপত্র। পশ্ লোকজন সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে এই আজব কল। এই ঘটনাটা এরকম ‘শিল্প বাড়াও’ উপনিবেশে না হয়ে যদি আহিরিটোলা বা বৌবাজারে ঘটত, এতক্ষণে সব প্রোডাক্ট লুট হয়ে যেত।

‘শিল্প বাড়াও’ প্রজেক্টের মহানির্দেশক কী করে যেন খবর পেলেন। উনি এলেন। উনি বিদেশী। কোট, সুট, মাথায় টুপি। সঙ্গে দোভাষী ও চামচে। সবার হাতে কোকের ক্যান।

-এই প্যানচ মেশিনটা তুমি তৈরি করেছ?

-ইয়েস স্যার।

-এর থিয়োরিটা কী?

-দেখে নাও।

-কী ভাবে ডিভাইস করেছ?

-দেখে নাও।

-মেশিনটা আমাদের বিক্রি কর।

-না।

-এইসব জিনিসপত্র কিন্তু একটাও তোমার নয়। এসব আমাদের র’ মেটেরিয়াল থেকে তৈরি হয়েছে।

-আমার দরকার নেই এসব জিনিসে।

-তোমার প্রযুক্তি আমাদেরই কাছে বেচতে হবে, অন্য কারুর কাছে নয়। কারণ ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট ল সেকশন নাইনটিটু...।

-ধুর, কী সব বলছেন-ভাল্লগেনা।

-তবে তুমি এসব করছ কেন?

-অসীমবাবু স্যার ছিলেন না? উনি বলেছিলেন পৃথিবীতে এলি যখন একটা দাগ রেখে যা।

-খুব ভাল কথা! তাহ'লে এক কাজ করা যাক। তোমার এই মেশিনটাই আমরা বরং কিনে নি। আমরা এটা অন্য জায়গায় বসাব। কারণ-এখানে জঞ্জাল তো বেশি হয়না, আবার অন্য জায়গা থেকে ভাল জাতের জঞ্জাল যদি এখানে নিয়ে আসি তবে আমাদের এলাকায় হেলথ হ্যাজার্ড হবে। তোমাকে এই মেশিনটা দিয়ে দিতে হবে। তোমাকে আমরা অনেক টাকা দেব।

-আমি নিজের হাতে তৈরি করব স্যার, ম্যাশিন ছাড়বনি।

-তোমাকে সুইজারল্যান্ডে বাংলা কিং দেব।

-বাংলাল্যান্ড ছাড়া অন্য কোথাও যাবনি।

-তা হলে পুরো প্রজেক্টটা অন্য জায়গায় শিফট করে দিচ্ছি।

-ম্যাসিন লড়চড় করা যাবেনি। অনেক ভাবনা চিন্তা করে কালেকশন করা হয়েছে, লড়চড় হলে সব গুবলেট হয়ে যাবে। পঞ্চাননের কথার মধ্যে কেমন যেন কমাণ্ড এসে গেছে। ও হাত নেড়ে কথা বলছে। মহানির্দেশকের চামচে বলল-ও হয়তো ঠিকই বলেছে। ওর তো কোনো রুশিট নেই, ও হচ্ছে একজন কোয়াক সায়েন্টিস্ট। বরং এক কাজ করা যাক। আমরা গারবেজ এরিয়াটাকে একটু বাড়িয়ে দি। কলকাতার বড়বাজার, রাজাবাজার, বৌবাজার থেকে গারবেজ নিয়ে আসি। বাংলাদেশ-টিউনেশিয়া-তানজানিয়াতে ভাল জাতের গারবেজ পাওয়া যাবে, আমরা ইমপোর্ট করতে পারি। জঞ্জালে ভ্যারাইটি হলে প্রডাক্টও ভাল হবে। মহানির্দেশক মাথা নাড়লেন।

মহানির্দেশকের চামচে বললেন-একটু প্রলম্বও আছে স্যার। গারবেজ এরিয়াটা এভাবে বাড়িয়ে দিলে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় হেলথ হ্যাজার্ড হতে পারে। এজন্যই ভাবছিলাম পুরো ইউনিটটা যদি শিফট করে অন্য কোথাও নেয়া যায়...মহানির্দেশক বলল-এরিয়া বাড়ানোর দরকার নেই। গারবেজ যেমন যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, প্রসেসিংটা এখানে করলেই হবে। আর জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেয়া হোক, এবং পাঁচিলের চারিপাশে ডিজাইনফ্যাকট্যান্ট-এর সনিটিফিকেশন স্প্রে থাকুক।

ইয়েস স্যার!

এবার ডিলটা করে নি। কিন্তু তার আগে একটু ক্রস চেক করে নেয়া উচিত।

ক্রস চেক মানে?

যেমন দ্যাখো, বাঁ দিকের মুখে ছেঁড়া কাপড় চোপড় দিচ্ছে, হাতল ঘোরানোর পর ডান দিকের মুখ থেকে নেকটাই বেরুচ্ছে। এবার এক কাজ কর। ডান দিকের মুখে নেকটাই গুঁজে উল্টো দিকে হাতল ঘোরাও দেখি, কী হয়।

পঞ্চাননকে বলা হল এরকম করতে। উল্টো দিকে হাতল ঘোরালো পঞ্চানন, নেকটাইগুলো আবার নেকড়া হয়ে গেল।

কয়েকটা আধ খাওয়া ভুট্টাকে বাঁদিকের মুখে ভরে হাতল ঘুরিয়ে কর্নফ্লেক্স-এর প্যাকেট বানিয়েছিল পঞ্চানন, প্যাকেটের গায়ের লেখা পড়ে পঞ্চানন জেনেছিল কর্নফ্লেক্স খেতে দুধ দরকার। ও তখন

ভেবেছিল ধুস। এখন কর্নফ্লেকসগুলোকে উল্টো ঘুরিয়ে আবার পোকাখাওয়া ভুট্টা বানাল।

কয়েকটা প্যাকেটে কী যেন লেখা ছিল পড়তে পারেনি। খায় না মাথায় দেয় পঞ্চানন জানেনা। সেই প্যাকেটগুলি ডানদিকের মুখে ঢুকিয়ে উল্টো হাতল চালালো পঞ্চানন, বাঁদিকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকডোনাল্ড নাম লেখা আধ খাওয়া, চোবানো ফ্রাইড চিকেনের প্যাকেট। করো কী করো কী বলে উত্তেজিত হাত নাড়তে থাকেন মহানির্দেশক। ওর মাথার টুপি হাওয়ায় উড়ে গিয়ে জঞ্জালের স্তুপে পড়ে। পঞ্চানন ওর আশ্চর্য কলের ডানদিকে টুপিটা ঢুকিয়ে উল্টো হাতল ঘুরিয়ে দেয়, বাঁদিক দিয়ে বেরুতে থাকে রোগা রোগা শিশু। হ্যাঁ, শিশু। হাত পা নড়া ক্রন্দনরত। কালো কালো।

বসনিয়ার? ইয়েমেনের? কালাহাণ্ডির?

মহানির্দেশক বলতে থাকেন-রি-সাইকেল,রি-সাইকেল, রি-সাইকেল...।

পঞ্চানন শিশুদের কোলে তুলে নেয়।

ওরে আমার সোনা মনা ধনা। আমার লব কুশ, নাড়ুগোপাল-

জঞ্জাল স্তুপে টুপ টুপ যোগ হ'ল আধখাওয়া কোকের ক্যান। মহানির্দেশক উত্তেজিত।

শিশুরা কাঁদছে।

মহানির্দেশক ভীষণ উত্তেজিত। চাঁচালেন-রি-সাইকেল ইমিডিয়েটলি।

পঞ্চা শোনেনা। বলে আর টুপি আছে?

এরপর আরো লোক জড়ো হ'ল। পরনে খাঁকি উর্দি, হাতে বন্দুক। বন্দুকে সাইলেন্সার আছে। বুলেট বমি হল নিঃশব্দে।

উৎপাদন ইউনিটটি নিঃশব্দে দখল হয়ে গেল। মহানির্দেশক টুপি ফিরে পেলেন ফের, নিঃশব্দে লাগালেন শিরোদেশে।

আর পঞ্চানন-পলিমারের জঞ্জালের তলায়, চকোলেটের রাংতা, ছেঁড়া মোজা-প্লাভস-স্পিৎ-নাটবন্টু সিলিকন চিপস্-এর ভিতরে নিঃশব্দে জঞ্জাল হয়ে গেল।

## তুরতুরির ডিম

বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিরাট বিশ্বাস ব্যাবিলনে বাঁদর সম্পর্কিত একটি সেমিনারে বক্তৃতা সেরে বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী ব্যাজার মুখে চুপচাপ! বিরাট বিশ্বাস বললেন কিগো, দেখবে না, ব্যাবিলন থেকে কী এনেছি, হাড়ের তৈরি পিঠ চুলকোবার হাত, খেজুর বিচির মালা, ইউফ্রেতিসের জল... মিসেস বিশ্বাস ও-সবে কান না দিয়ে বললেন, পঞ্চু আজও আসেনি। ডাঃ বিশ্বাস বললেন, সে কী? আমি ব্যাবিলন থেকে ফিরে এলাম, অথচ পঞ্চু বর্ধমান থেকে এখনো ফিরল না? পঞ্চু আর বিশ্বাস একই দিনে রওনা হয়েছিল। পঞ্চু বলেছিল দুদিনের জন্য যাচ্ছে। অথচ দশ দিন হয়ে গেল...। ডাঃ বিশ্বাস জানেন পঞ্চু না এলে তাঁর স্ত্রীর ব্লাড প্রেশার নর্মাল হবে না, হার্ট বিট-এ গণ্ডগোল থাকবে। বিশ্বাস বললেন, চিন্তা করো না, আমি টেলিগ্রাম করছি।

টেলিগ্রামে কী হবে? কবে পাবে তার ঠিক নেই। মিসেস বললেন।

ঠিকই তো, ঠিকই তো। আমি নিজেই যাব। ডাঃ বিশ্বাস জানেন পঞ্চু ওঁর সংসারের বোন-ম্যারো। ওঁর সংসারের লিভার কিডনি হার্ট ও না হলে সংসার অচল। বিশ্বাস ভাবলেন ওর গ্রামে গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসবেন। এর আগেও পঞ্চু দেশে গেছে। দু-দিনের নাম করেই যায় ও, তিন দিনের মধ্যেই চলে আসে। গত দশ বছরে একবারই মাত্র চারদিন হয়েছে। কিন্তু দশদিন কখনোই হয়নি।

মিসেস বিশ্বাস বললেন, কবে যাবে, আজই?

-আজ কী করে হবে, কাল যাব।

-কাল? দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, কালই যাও। এবার দেখাও কী এনেছ।

-এই দ্যাখো কী সুন্দর আয়না। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের তলায় বিক্রি হচ্ছিল...।

-এই তোমার সুন্দর? এ জিনিস তো গড়িয়াহাটের ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি হয়, লে লো বাবু পাঁচটাকার মাল।

-এই দেখ ইউফ্রেতিসের জল।

-এই জলে আমার কী, বরং গোলাপজল হলেও কিছু কাজে আসত।

-এই দ্যাখো আখরোট গাছের ছাল।

-কী হবে।

-খুব ভালো জোলাপ।

-তুমি খাওগে। এসব চাই না। আমার পঞ্চুকে এনে দাও।

পঞ্চু বলে বটে বর্ধমান, কিন্তু ওর ঠিকানাটা খুবই জটিল। গ্রাম নসিবপুর ভায়া আদ্রাহাটি। আদ্রাহাটি যেতে গেলে বর্ধমান থেকে বাসে চড়তে হবে। ডাঃ বিশ্বাস ভাবলেন বহুদিন বাংলার গ্রাম দেখা হয়নি। এক ঠাণ্ডা ঘর থেকে এক ঠাণ্ডা ঘরেই তাঁর যাতায়াত। বহুদিন ঘাস মাড়ানো হয়নি, কাশফুল দেখা হয়নি। স্যাণ্ডউইচ,

হটডগ, পেপ্তি, হ্যামবার্গার খাওয়া জিভ বহুদিন মুড়ি বেগুনির স্বাদ পায়নি। মিহিদানা সীতাভোগ খাওয়া হয়নি বহুদিন। ধানের গোলা দেখা হয়নি, ব্যাঙের ডাক শোনা হয়নি। বাঁদর নিয়ে বক্তৃতা করে এলেন, অথচ বহুদিন বাংলার বৃক্ষশালায় বাঙালি বাঁদরের অনুপম জিম্নাস্টিক দেখা হয়নি। ডাঃ বিশ্বাস ভাবলেন পঞ্চুর খোঁজে নসিবপুর যাওয়াটা একটা রমণীয় এক্সকারশনই হবে। এক ধরনের রিলিফ। পরদিনই রওনা হলেন ডাঃ বিশ্বাস। মিসেস বিশ্বাস এক বোতল ফুটোন জল এবং টিফিন ক্যারিয়ারে স্যাণ্ডউইচ দিয়ে দুগ্ধা দুগ্ধা বলে বিদায় দিলেন। বিশ্বাস এইসব স্যাণ্ডউইচ ট্যাণ্ডউইচ নিতে চাননি। ভেবেছিলেন ট্রেনে ঝালমুড়ি খাবেন। বাঁশের ঝড়িতে লাল শালুতে জড়ানো সিঙাড়া-ভেজিটেবিলের চপ খাবেন, তাই ট্যাক্সিতে উঠে, ট্যাক্সিটা মিসেসের চোখের আড়াল হতেই স্যাণ্ডউইচগুলো রাস্তায় ফেলে দিলেন।

বর্ধমানে নেমে বিশ্বাস দেখলেন আদ্রাহাটির বাস তিন ঘন্টার পর। একজন বলল গলসী নেমে আদ্রাহাটির বাস পাওয়া যেতে পারে। ডাঃ বিশ্বাস তাই করলেন। ঝরঝরিয়া বাসের ঝাঁকুনিতে ট্রেনে খাওয়া ঝালমুড়ির ঝংকার। ছাগলছানা, মুরগি ও নোংরা পোশাকের মানুষজনের গাদাগাদিতে কোণঠাসা বিজ্ঞানী হ্যাণ্ডেল ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছেন, বাংলার সবুজ শ্যামলিমা জানালার পাশ দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে, ডাঃ বিশ্বাস দেখতে পাচ্ছেন না। শেষ অবধি আদ্রাহাটিতে যখন নামলেন, ডাঃ বিশ্বাস একটি ঠাণ্ডা ঘর, রিল্যাকসনের গদি, ও একটি নীল আলোর অভাব বোধ করলেন। আদ্রাহাটিতে নেমে শুনলেন নসিবপুর আট কিলোমিটার দূর। দামোদরের পাশ দিয়ে রাস্তা আছে, ভ্যান রিক্সা সুবাসগঞ্জ পর্যন্ত যাবে। ওখান থেকে পায়ে হাঁটা পথে পাঁচ কিলোমিটার।

ডাঃ বিশ্বাসের বুক ধুকধুক করে উঠল। পশ্চিমবাংলার কোণে কোণে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে, এবং তাতে বাস চলাচল করে, এরকম একটা ধারণা ছিল ডাঃ বিশ্বাসের। সেই বিশ্বাসে চিড় ধরল। বর্ধমান একটা অতি উন্নত জেলা। তাতেই এই! বিশ্বাস হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে ডাঃ বিশ্বাস পথ চলতে লাগলেন। কাশফুল টাশফুল দু-চার ঝাক এখানে ওখানে নড়ছে, নড়ুক। দু-চার পিস প্রজাপতি উড়ছে, উড়ুক। দামোদরের বালি ছুঁয়ে হাওয়া আসছে, আসুক।

ডাঃ বিশ্বাস যখন নসিবপুরে পৌঁছলেন তার অনেক আগেই সূর্য দামোদরের ওপাড়ে গাছগাছালির তলায় সঁধিয়ে গেছে। মশার ঝাঁক ডাঃ বিশ্বাসের মাথার ওপর একটা ছোটখাটো স্তম্ভ বানিয়ে ফেলেছে। ভনভন করছে, ইচ্ছেমতো কামড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে শেষ পর্যন্ত যখন পঞ্চুদের বাড়িতে পৌঁছলেন ডাঃ বিশ্বাস, তাঁর আর কথা কইবার শক্তি নেই।

এটাই কি পঞ্চুর বাড়ি?

একজন খুরখুড়ে বুড়ি বললে, ‘বটে এজ্ঞে। কিন্তু আপনি কে বাবা? দারোগা?’

ডাঃ বিশ্বাস শুধু বলতে পারলেন পঞ্চু আমার বাড়িতেই কাজ করে। এটুকু বলেই দাওয়ায় পাতা তালপাতার তালাইয়ের ওপর শুয়ে পড়লেন। পঞ্চুর ঠাকুরমা তালাপাতার পাখায় বাতাস করতে থাকল। বাইরে ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। এমনকী যা হয় না, দাঁড়কাকও ডেকে উঠল। ডাঃ বিশ্বাসের সব ‘কাকস্য পরিবেদনা’ হয়ে যাচ্ছে। একটু পরে শেয়াল ডাকল। শেয়ালের ডাকে ভয় পেয়ে ডাঃ বিশ্বাস ধড়ফড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ডাকছে? পঞ্চুর ঠাকুরমা বলল, জঙ্গলে। পঞ্চুর মাও ঘোমটা দিয়ে

দাঁড়িয়েছে কাছে। আকাশে একফালি চাঁদ। জোনাকিগুলো বায়োলুমিনিসেন্স দিচ্ছে। সবই ননসেন্স লাগল ডাঃ বিশ্বাসের। উনি উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পঞ্চু কোথায়, ওকে নিতেই তো এসেছি।’

পড়ুর ঠাকুরমা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার লাতিটাকে ওরা নিয়ে চলে গেল।

ওরা মানে?

ওরা মানে অন্য গেরোর লোক।

গেরো মানে?

গেরো মানে গেরো, আকাশে আছে না।

আরও দু-চারজন জড়ো হয়েছে পাড়া প্রতিবেশী। একটি ছেলে বলল, আকাশে সব গ্রহ নক্ষত্র আছে ন্য, সেরকম অন্য এক গ্রহের লোকজন এয়েছেন, তেনারা নে গেল।

-গাজা খেয়েছ?

-গাঁজার চাষ একদম বন্ধ। পুলিশ প্যাঁদায়।

-তবে এসব কী বলছ?

-সত্যি বলছি, মা কালীর কিরে।

-কী করে চিনলে অন্য গ্রহের লোক?

-টি.ভি.র দ্বারা চিনলাম। আমাদের গায়ে দুটা টি.ভি. আছে। বাবুল কোজরের আর গণেশ গড়াইয়ের। ব্যাটারি দ্বারা চালায়। ওদের বাড়িতে টিভিতে দেখেছি অন্য গ্রহের লোকজন। যারা এসেছিল, অবিকল ওরকম ভাব। বুকো ঘড়ি, গোলগোল চোখ, মাথায় শিং, ডগা দে আগুন বেরুচ্ছে।

-কীভাবে এল ওরা?

-যেভাবে টিভিতে আসে, সেভাবেই।

-ডেসক্রাইব কর। মানে বর্ণনা কর।

একটি ছেলে বলল-আমনের টুসুর জন্য গান বেঞ্জেছি। শুনবেন?

আমার টুসুর আলোর ফোচাং

মাথায় কেমন শিং জেগেছে

হেলে দুলে রকেট চাপল গ

অনুরাধাপুর বেড়াতে গেছে...।

-অনুরাধাপুর মানে?

-অনুরাধা তারা আছে লাই, সেইখানে গেছে।

-কে বলল তোমায় অনুরাধা নক্ষত্রেই গেছে?

-ইটা কবি কল্পনা।

-কবি কল্পনা ছাড়া। কী দেখেছ সত্যি বল।

-তবে বলি শুনুন। রেতেরবেলা হঠাৎ শুনি শব্দ। একশোটা ঝাড়াই মেশিনে যে শব্দ তার চেয়েও বেশি। ডিপ টিউকলে যখন জল ওঠেনা, শৌঁ শৌঁ শব্দ হয়, ওরকম শব্দও পাচ্ছি। বাইরে এলাম। মনসা মন্দিরের



সামনে যেখানে ঝাপানের সময় মেলা বসে, সেই মেলার মাঠে দেখি আলো। বিরাট লম্বা একটা চোঙ লেবেছে। আমার ছেলের ফাইবের বইতে এরকম ছবি রয়েছে। ওটার আবার তিনটে ঠ্যাং। ঐ রকেটের পোঙা দে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তোড়ে, আবার গা থেকে আলো বলকাচ্ছে। ধোঁয়ায় বেশ নজেন নজেন গন্ধ। ধোঁয়া থামলে পরে রকেটের দোর খুলল, আর লাফ দিয়ে পড়ল কয়েকটা লোক। কেমন দেখতে তো আগেই শুনেছেন। একটা কথা বলা হয়নি, লোকগুলো যখন ছোট, তখন পেছন দে সাদা সাদা ধোঁয়া বের করে। সেই ধোঁয়াতেও নজেনের গন্ধ। আর হাতের আঙুলগুলো নম্বা নম্বা। অনেকগুলো করে আঙ্গুল। আঙ্গুলের ডগা দে আলোর ফোচাং বের হয়। আমরা তখন অনেকেই বাড়ি থেকে বেরোয়ে পড়েছি। দূর থেকে রগড় দেখছি। ভয় লাগেনি।

এমন সময় পঞ্চুর মা একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় একটা বড়সড় ডিমের ওমলেট দিয়ে গেল। বেশ গরম। ধোঁয়া উঠছে। খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল ডাঃ বিশ্বাসের। গপাগপ খেয়ে নিলেন। চামচ নেই, হাতেই খেলেন। ডিমের ওমলেট খেতে গেলে হাতের আঙ্গুলও স্বাদ পায়, গরম স্পর্শ পায়, অনেকদিন পরে ডাঃ বিশ্বাসের আঙুল এই আরামটা পেল। তারপর চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে ডাঃ বিশ্বাস বললেন, তারপর?

তারপর ওরা মেলার মাঠে নাচল, গাইল তারপর মই দিয়ে উঠে দরজা লাইগে শুয়ে পড়ল। পরদিন সকালবেলা আমরা উঠে পুকুরপাড়ে দাইড়ে আছি। ভাবছি তেনারা বাহ্যি ফিরতে এলেই ধরব। বলব আমাদের গেরামের উন্নতির জন্য চাঁদা দাও। মনসার ঝাপানের জন্য চাঁদা দাও। একজন বলল, ওদের গ্রহের টাকা কি এদেশে চলবে? তখন আমি বললাম তাহলে বরং সোনা চাইব। সোনার দাম সব জায়গায় আছে। অনুরোধপূরেই যাও, আর ঐ মঘা-কিন্তিকা ভদ্রাপুরেই যাও। কিন্তু কী করে চাইব? আমাদের ভাষা কি বুঝবে? যাইহোক, একটু পরে তেনারা নামলেন। তেনারা ছিলেন চারজন। দুজন মেয়েছেলে, দুজন বেটাছেলে। ডাঃ বিশ্বাস বললেন, ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে বুঝলে কী করে?

বুঝব না? ওরা তো গায়ের জামা খুলে ফেলেছিল। বোধহয় গরম লাগছিল। ওদের সঙ্গে ছিল ওদের পোষা জন্তু। সবাই একটা করে জন্তু কোলে রেখেছিল, আর জন্তুটা জিভ দিয়ে গা চেটে দিচ্ছিল। আমি পরে কাছে গেছিলাম, আমারও গা চেটে দিল। জিভটা বরফের মতন ঠাণ্ডা।

তারপর!

তারপর তেনারা বেরিয়ে পড়ল। একটা ছাগল নাদতে নেগেছিল, তার নাদি কটা নিল, গরুর গোবর জরি প্যাকেট ভরে নিল, গাছের আতাফল পেড়ে নিল নম্বা হাত বাড়িয়ে। হাতের মধ্যে একটা কল আছে। হাতটা অনেক দূর পর্যন্ত যায়, যত লম্বা হয়, হাতটা তত সরু হয়। তেনারাও লম্বা হতে পারেন। যত লম্বা হন তত সরু হন, আবার যত বেঁটে হন, তত মোটা হন। একজন লোক তো ঐ মনসামন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে একবার লম্বা হচ্ছেন, একবার মোটা হচ্ছেন। ওটা বোধ হয় ব্যায়াম! একসাইজ। একটা জিনিস স্যার, ঐয়ে বললামনি, পোষা জন্তু, ঐ জন্তুছাড়া তেনাদের মোটে চলেনি। ঐ জন্তুটা সবার ঘাড়ে চড়ে থাকে। মাঝে মাঝে জিভ দে চাটে, আর একটু পর পর ঐ জন্তুটার পেটের মধ্যে হাতের আঙুল দে চাটা মারে, তখন ঐ জন্তুটা ভক্ করে একটা ডিম পাড়ে, আর ঐ লোকগুলান কপাৎ করে গোটা ডিমটা খেয়ে লেয়। বিরাট বিশ্বাসের

চোখে বিরাট অবিশ্বাস। বললেন, কলকাতার লোক পেয়ে গুল দিচ্ছ না তো? ছেলেটা বলল, আপনাকে স্যার গুল দেব? আপনি আমাদের পঞ্চুর মনিব...।

ডাঃ বিশ্বাস বললেন, ঐ জন্তুটা কেমন দেখতে বল তো? আমাদের মুরগির মতন? ছেলেটা বলল, মুরগির মতো দেখতে হলে তো না বলে পাখিই বলতাম। ওটা ভারি আশ্চর্য দেখতে। কার মতো বলব? বেজিও নয়, আবার গোসাপও নয়, কেন্নোও নয়, আবার কাঠ বিড়ালিও নয়। সবরকম মিলিয়ে মিশিয়ে। জন্তুটা দেড় দু হাত লম্বা। গোসাপের মতো মুখ, বেজির মতো লোম, কাঠবিড়ালির মতো লম্বা লম্বা দাগ। একটা কেন্নোকে যদি অনেক ফুলিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে যেমন হত, লম্বাপানা, আর বেশ ঘাড়ে গলায় পেঁচিয়ে থাকতে পারে। কেন্নোর মতোই অনেকগুলো পা জন্তুটা তুরতুর করে হাঁটে। ইটার নাম দিয়েছি তুরতুরিয়া।

জন্তুটা ডাকে?

ভারি সুন্দর ডাকে আইজ্জা, যেন টেলিফোন।

ডাঃ বিশ্বাস বললেন, জন্তুটা মনে হচ্ছে এগুপ টেরিগোটা শ্রেণীর ম্যালোফ্যাকোটিস্ বর্গের ল্যাসারটিলিয়া উপবর্গের এক ধরনের ভারটিব্রেটা। জন্তু কী খায়?

কিছু খেতে দেখিনি আইজ্জা।

জন্তুটা পার্জ করেছে? পার্জ।

এজ্জে?

বড় বাইরে করেছে? পটি?

এজ্জে স্যার?

ডাঃ বিশ্বাস এবার গলা চড়িয়ে বললেন, হেগেছে?

-না স্যার, মোটে হাগেনি।

-আর ঐ লোকগুলো?

-না স্যার, ঐ লোকগুলোনও হাগেনি তবে এরা অন্য একটা ব্যাপার করে।

খোলস পালটায়।

সেটা আবার কী?

স্যার, সে ভারি আশ্চর্য আজব। তিনজন লাইন দিয়ে দাঁড়াল, চার নম্বরজন করলে কি, ওদের ছাল ছাড়িয়ে দেল আঙুল দে টেনে। চরচর শব্দ করে ওদের ছাল বেইরে এল। ছাল বেইরে আসার পর ওদের নতুন চামড়াটা দেখি আরও চকচকাচ্ছে। তারপর বাকি তিনজনে মিলে চার নম্বর জনের চামড়া ছাড়িয়ে দিল।

কোথায়, সেই চামড়া কোথায়? দেখি, দেখি, দাও দাও... বিরাট বিশ্বাস উত্তেজিত।

-চামড়া? কী হবে গ?

-কী হবে মানে? কত কিছু হবে। শোন ঐ চামড়ার কথা আর কেউ জানে না তো? খবর কাগজের লোকজন এখনে কেউ আসেনি তো? বিজ্ঞানীর টিম আসেনি তো? তদন্ত কমিশন আসেনি তো? পরিবেশ বাঁচাও আসেনি তো? আমি প্রথম তো? এতগুলো প্রশ্নের আক্রমণে ছেলেটা যেন বেদিশা হয়ে পড়ল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ। ডাঃ বিশ্বাস বললেন, আমার আগে আর এসব কেউ জেনেছে?

-দারোগা জেনেছে।

-দারোগার কাছে গেছিলে কেন?

-যাব না? পঞ্চু ছিনতাই হয়ে গেল, দারোগাকে জানাব না?

-দারোগা কী বলেছে?

-বলেছে ওরা অনুরাধাপুরে যেতে পারবে না, ওখানে রকেট ছাড়া যাওয়া যায় না।

কারণ থানায় একটা জিপ গাড়ি পর্যন্ত নেই।

-বাঃ ডায়রি নেয়নি তো!

-না।

-বেশ। তা হলে কেউ জানে না। আমিই প্রথম। তা দেখাও দেখি ঐ চামড়া ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের চামড়া।  
কসমিক লেদার। এটা নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরব। ডেমনস্ট্রেশন। বক্তৃতা। দেখাও চামড়া দেখাও! এফুনি।

-সেই সমড়া আর কি আছে? আর নাই।

-কেন! কে নিয়ে গেল।

-কেউ নেয়নি।

-তবে?

-সব জ্বালানি হয়ে গেছে।

-জ্বালানি? মানে?

-মানে তো কিছু নাই। জ্বালানি।

-কেন?

-জ্বালানির অভাব। জঙ্গল কমিটি বলেছে, জঙ্গল কাটলে জেল হবো, ইদিকে কার্তিকের ধান উঠল। ধান  
ভাপাতে হব্যেক। তেনারা অনুরাধাপুর চলে গেলেন, তেনাদের খোলস পড়ে রইল খেলার মাঠে। চণ্ডী গড়াই  
প্রথম ঐ খোলস নিয়ে ধান ভাঙায়। ও বল্ল, খুব ভাল জ্বালানি। খুব তেজ। দু ঘণ্টা ধরে জ্বলল। তারপর  
অন্যরা সব লিয়ে জ্বালিয়ে দিল। আমার ভাগ্যে জোটেনি।

-বাঃ বেশ করেছ। এজন্যই বলে চাষার মরণ। এক্কেবারে এওয়ারনেস জন্মায়নি। জেলায় জেলায় নাকি  
সাক্ষরতা আন্দোলন। ক্যাচকলা। একটুকরো চামড়াও নেই?

-না আঞ্জে।

-কেমন, রং সেই চামড়ার?

-রং নাই। জলরং। পলিথিন যেমন।

-থাম। ডাঃ বিশ্বাস গম্ভীর হলেন। ঝাঁ ঝাঁ ডাকছে। কেরোসিন কুপির দুবলা আলোর শিখা পড়া-না-পারা  
বালকের মত বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর ডাঃ বিশ্বাস বলল, ওরা তারপর কি করল?

-ওরা সব খোলস পালটালো, আমরা সব দাঁইড়ে দাঁইড়ে দেখছি। এমন সময় ওদের একজন মেয়াঁ ছেলে  
কপ করে হাতটা লম্বা করে বাড়ায়ে আমাদের পঞ্চুকে ধরল। তারপর পঞ্চুকে টেনে নিল। একটু আদর  
করল। আমি ভাবলাম সর্বোনাশ। এডস-এর গাড়ি যে বলে গেল অপরিচিতদের সঙ্গে মাখামখি করতে নেই।

এডস হয়। আর ভাববার সময় হলনি। ওরা আমাদের পঞ্চকে টেনে রকেটঘরে ঢোকাই নিল। আমি কী করব।

-তারপর?

-তারপর নজেন-নজেন ধুঁয়া ছেড়ে রকেট আকাশে পলাই গেল।

ডাঃ বিশ্বাস কিছুক্ষণ চুপ। কোনটা যে এওয়ারনেস, আর কোনটা এওয়ারলেস্ বোঝা মুশ্কিল। ডাঃ বিশ্বাস আবার বললেন - আচ্ছা, ওরা যে এসেছিল তার কোন প্রমাণ নেই? কিছু রেখে যায়নি?

-কিছু বইলতে মোক্ষম জিনিসটা দিয়ে গেছে এই বুড়িকে। পঞ্চুর ঠাক্মাকে।

-কী?

-ডিম।

-মানে!

-ঐ তুরতুরি জানোয়ারটার ডিম। ঐযে বল্লাম না, ওরা এই পৃথিবীর জিনিসপত্র নিচ্ছিল, ছাগলের নাদ, গাছের ফল, এইসব তখন ঐ বুড়ির কাছে মুরগির ডিম মাঙল। বুড়ির তো অনেক মুরগি!

-কী ভাষায় চাইল!

-আকার ইঙ্গিতের ভাষায়-

বুড়ি বল্লল, ছাগল-ঘরের কোনায় মুরগি থাকে। ওরা ঘরে ঢুকে দেখল দুটো ডিম। ডিম দুটো ঐ খঁকারা নিল। তারপর ওরা করলে কি, ওদের ঘাড়ে পেঁচানো তুরতুরি জানোয়ারটার পেটে একটু টেপন দেল, ওর জানোয়ারটার পিছন থেকে ডিম বেরুল। দু জনের ঘাড়ের দুইটা জানোয়ারের থেকে চারটা ডিম পাওয়া গেল। আমার কিছু লোসকান হয়নি। দুটো ছোট ছোট মুরগীর ডিমের বদলে চারটে বড়বড় তুরতুরির ডিম পেলাম।

-তো ডিমগুলো দেখি, দাও, এফুনি দাও...

-সে ডিম কি আর আছে?

-কেন?

-আজ সকালেইতো হাটে বেচে এলাম। ঘরে আরও কটা হাঁসমুরগির ডিম ছিল। তার সঙ্গে ঐ ডিমগুলো মিশিয়ে বেচে দিয়েছি। খন্দের বল্ল - এটা বুঝি বিলিতি হাঁসের ডিম? আমি বল্লাম দাম বেশি। বেশি দামেই বেচা হল।

-চারটে ডিমই বেচে দিয়েছ?

-না আঞ্জে। চারটাতো হাটে লিয়েই যাইনি তো চারটে বেচব কি করে!

-কটা নিয়েছিলে!

-তিনটা!

-আর একটা কী হল!

-কী হল মানে? একটু আগে আপনাকে মামলেট বাঁনায়ে দিলাম নি?

ধরনী-দ্বিধা হও। ডাঃ বিশ্বাসের শরীরের ভিতর ফিসন ফিউশন হতে শুরু করে। গ্রহান্তরের জীবের পাড়া ডিম এতক্ষণে ডাঃ বিশ্বাসের পেটে গ্যাস্ট্রিক এ্যাসিড, প্যাংক্রাইটিস জুস, বাইল, ইত্যাদির কারসাজিতে হজম

হয়ে চলেছে। এই হজম প্রক্রিয়া বন্ধ করার উপযুক্ত প্রযুক্তি ডাঃ বিশ্বাসের জানা নেই।

স্টুল একজামিন থেকে কিচ্ছু পাওয়া যাবে না? কোন আনডাইজেস্টেড অংশ? কোন নতুন ধরনের প্রোটিন বা রেয়ার মেটাল কিচ্ছুতো আসতে পারে। ডাঃ বিশ্বাসের পেটের ভিতরে অমূল্য সম্পদ। ওটাকে অন্যকিচ্ছু দিয়ে এডালটারেটেড করবেন না। রাত্রে কিচ্ছু খেলেন না। শুধু মশার কামড় খেলেন। জলও খেলেন না। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বল্লেন না। ভোর হতে হতেই যাত্রা করলেন। কলকাতা পৌঁছেই পেটের জিনিসটা অনুপুঙ্খ পরীক্ষা করবেন। দামোদরের ধার দিয়ে হাঁটছেন। অনেকটা হাঁটতে হবে। চাও খান নি। পেটের জিনিসটা রাখতেই হবে। একটু পরেই পেটে মোচড়। এরকম মোচড় রাত্রেও হয়েছিল। এখন ক্রমশ বাড়ছে। তুরতুরির ডিম সহ্য হয়নি। হজম হয়নি। হজম না হওয়া মানে ওর অরিজিনাল বৈশিষ্ট্য কিচ্ছুটা রক্ষা পেয়েছে। একটা নতুন পেপার হবে। এগ অফ তুরতুরি, এ্যান অ্যান্যালিসিস। আর পারা যাচ্ছে না। দামোদরের ধারে বসে যেতে হবে মনে হচ্ছে। বসে গেলেন মাথায় হাত দিয়ে।

কাছেই এসে দাঁড়ালো দুটো কালো শুয়োর। তুরতুরি সম্পর্কে শুয়োর প্রজাতির কোনই উৎসাহ নেই। হায় ওরা এখন ওদের খাদ্যের জন্য তুমুল এবং অবুঝ অপেক্ষা করছে।

## ক্যারাক্সাস্

আমার কিছু ভাল লাগছিল না! টারজন আমাকে মেরেছে। টারজনকে আমি শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, সাধ্যমতো সেবায়ত্ত্বও করি। গা-হাত-পা মুছিয়ে দি, তেল ঘষি, পাউডার লাগাই, সব করি। ঘড়ির কাঁটা ধরে ব্যাটারি পাল্টাই, কার্বন পাল্টাই। অথচ মারল। ওর নাভির ‘অয়েল হোল’ –এ মবিল দিচ্ছিলাম, সাবধানেই, লাগবার কথা নয়, হঠাৎ মারল। কেন মারল? রোবট তো আর জবাব দেয় না। আমার সময়টাই খারাপ যাচ্ছে। ছুটি হলে একা একা হাঁটি। মন খারাপের পা নালাটার দিকে চলে যায়। নালায় পাড় ধরে হাঁটি। নালায় কালো জল ছরছর বইছে। আহা! জল তো নয়, অ্যাসিড। শুধু কি অ্যাসিড? অ্যালডিহাইড-কিটোন-আর্সেনিক-সোডা...আমি কি আর অত শত নাম জানি? টারজনকে সেবা করাই আমার ডিউটি। কারখানার জলে কী আছে না আছে জেনে কি দরকার? কারখানার জল মানে কারখানার জল। জল থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া। কী সুন্দর। কত রঙের ধোঁয়া। সবুজ রঙের ধোঁয়া, হলুদ... গোলাপি। এই মাত্র এক গাব্বা ধোঁয়া সবুজ রং হয়ে জল থেকে উঠল, হয়ে গেল হলুদ। কোথাও আবার কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে গেল। কি সুন্দর ঝাঁঝালো গন্ধ। কেমন কাশি আসে। কোথেকে উড়ে এল একটা ঝরাপাতা। জলের ভিতরে পড়েই সাদা হয়ে গেল। নালায় পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে নালায় এইসব শোভা দেখতে দেখতে পুকুরের পাড়ে পৌঁছাই।

এই পুকুরের পাশে একটা গাছ আছে। গাছের মতন বহু আগে গাছ ছিল। মরে গেছে। কাঠ আছে। মরা কাঠ, কাঠের শরীর। গাছের ঝুরি মিছিমিছি নেমেছে মাটিতে। এখানে মাটিতে কোন ঘাস নেই। পুকুরের কাদার রং ভারী অন্ধুত। কোথাও সাদা, কোথাও কালো। কোথাও শেওলার মতো সবুজ। কোথাও হলুদ রেখা, কোথাও মাটির গায়ে রামধনুর ছাপ। পুকুরের জলে তেল ভাসে। তাতে রোদ্দুর পড়ে রামধনু হয়। আমি বিষপুকুরের শোভা দেখি।

হঠাৎ দেখলাম পুকুরের জলে বুটবুটি। মনোহর বুটবুটি। বুটবুটি নড়ছে, সামনে এগিয়ে আসছে, পিছনে যাচ্ছে। এ বুটবুটি অন্য বুটবুটি। ভোসকা গ্যাসের বটুর বটুর নয়, প্রাণের বুটবুট। আমি এগিয়ে যাই। সাবধানে যাই। পিছলে পড়লেই মরণ। অবাক তাকাই। নড়ছে। বুটবুটির তলায় একজোড়া চোখ। মাছ? কী করে হবে? এ তে বিষপুকুর। কারখানার জল নালা দিয়ে এসে এই পুকুরে পড়েছে। এই পুকুরের সামনে কঙ্কালের মুখ আঁকা বোর্ড আছে। সাবধান। জল ছুইবেন না। এই পুকুরে কীভাবে বুটবুটি তুলে ঘুরে বেড়াবে মাছ?

আমি চোখ কচলে দেখি।

মাছই তো। হাঁ করে জল খাচ্ছে। জল তো নয়, অ্যাসিড-ট্যাসিড। আমায় দেখেই পালায়। হি-হি। ওই তো ওপাশে আবার মুখ নড়ছে। ওদিকে যাই। আবার পালাল। মাছই তো। বিষ জলেও প্রাণ জন্ম নেয়? আমার মন ভাল হয়ে গেল।

ঘরে ফিরব। বউকে বলব। বউকে খুব ভালবাসি। বউও আমায়। আমরা কতদিন হ্যালোজেনের আলোয় বসে গল্প করিনি। আজ করব। বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার। হাফ প্যান্ট। কুকুর হাগাতে বেরুবেন। স্যার খুব জ্ঞানী। স্যারের ঘরে কত বই, ক্যাসেট, স্যারের ঘরে কত কাঁচ, কত নল, স্যারকে দেখেই বলি, স্যার, মাছ। স্যার কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকান। ভাবি, কী দরকার ছিল বলার। বউকে এনে মাঝে মাঝে দেখাতাম, বেশ, মাছ আমাকে ভয় পেয়ে পালাত বেশ, তখন আমার বেশ ইয়ে ইয়ে লাগত বেশ, তখন আমরা হাসতাম বেশ। কিন্তু আমি পেটে কথা রাখতে পারি না। বলি, স্যার বিষপুকুরে।

ননসেন্স।

ঠিক আছে বাবা, ননসেন্স। আমি চলে যাই।

শোনো!

স্যার!

বিষপুকুর মানে?

ওই যে স্যার, নালাটার জল যেখানে পড়েছে। ওখানে স্যার, মাছ সাঁতার কাটছে।

গাঁজা ধরেছ?

না স্যার।

তবে!

সত্যি বলছি স্যার। নিজের চোখে দেখে এলাম।

ওয়েট এ বিট।

স্যার ঘরে ঢুকলেন। ছিপ বঁড়িশি নিয়ে এলেন, আর ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা চিংড়ি। বললেন, চলো তো দেখি।

চললাম। স্যারের দু'পা পিছন পিছন। ওই বিষপুকুরে গিয়ে বললাম, ওই যে স্যার, দেখুন কেমন ঘাই মারছে। স্যার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্যারের কপালে কুঁচকানো রেখার ছবি হচ্ছে। স্যার আমার হাতে একটা ছোট পলিথিন ব্যাগ দিয়ে বললেন, ধরো। আমি ধরে রইলাম। স্যার এক টুকরো চিংড়ি বড়শিতে ছিপ ফেললেন। ফাতনা স্থির। ফাতনার এপাশে-ওপাশে ঘাই মারছে মাছ। আমি বললাম, এই মাছ বোধহয় চিংড়ি ভালবাসে না। স্যার ছিপ ওঠালেন। বড়শির মাথায় লেগে রয়েছে কালো খড়খড়ে ছোট্ট একটা কুণ্ডলী পুঁটলি। চিংড়ির টুকরোটা কীরকম কালো হয়ে গেছে ওই জলে। স্যার আবার চিংড়ির টোপ গাঁথলেন, আবার কালো খড়খড়ে হয়ে গেল ওই টোপ।

স্যার কী যেন ভাবলেন। আমি দেখছি কালো জলের কিনারে মাটির কাছে এসে গেছে ওই মাছ। একটা নয়, দুটো নয় তিনটে। আরও আছে? স্যার কী যেন ভাবছেন। তারপর বললেন, এখানে বসে থাকো, আমি এফুনি আসছি। স্যার গেলেন। আমি দেখতে থাকি কাদার গায়ে সবুজ হলুদ রেখা। জলের গ্যাস গন্ধ, গ্যাসের বুটবুটির সঙ্গে খেলা করছে মাছ। গ্যাসের বুটবুটি হারিয়ে দিয়ে জিতে যাচ্ছে প্রাণের বুটবুটি। কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য মাইরি...

স্যার আসেন। ব্যাগ থেকে বের করেন দু'তিন রকম পাউডার। মেশালেন। তার মধ্যে ঢেলে দিলেন কী একটা তেল। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। ধোঁয়া হল। ধোঁয়া শেষ হলে পড়ে রইল কীরকম যেন একটা

আঠালো আঠালো জিনিস।

স্যারের এত মাছ ধরার শখ। আগে জানতাম না স্যারের কত গুণ। আগে জানতাম না। স্যার বললেন নতুন মাছের টোপ। আঠালো জিনিসটা গোল পাকিয়ে বড়শিতে গাঁথলেন স্যার। ফেললেন। একটু পরেই নড়ে উঠল ফাতনা। ছিপে লাগালেন টান। উঠেছে উঠেছে। উঠেছে। সুতোর তলায় ফড়ফড় মাছ নড়ছে। স্যার লাফিয়ে উঠলেন। মাছটা ঝুলছে চোখের সামনে। ভীষণ আনন্দ আমার। ঝুঁকে দেখতে থাকি মাছটাকে। হাত খানিক লম্বা। ড্যাবা-ড্যাবা চোখ। সারা গায়ে আঁশ নেই একটুও। খড়খড়ে গা। গিরগিটির মতন।

স্যার কীরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখ স্থির। দেহ স্থির। আস্তে আস্তে মন্ত্র পড়ার মতন বলতে থাকলেন-ইউরেকা, ইউরেকা। মিউটেশন। নিউ গেন্স। নিউ স্পেসিস। নতুন প্রজাতি। নাম দিলাম ক্যারাক্সাস। আবিষ্কার করেছি আমি। আমিই দেখেছি এটা পৃথিবীতে প্রথম।

আমি বললাম, স্যার আমি তো ফাস্ট দেখিচি। আপনাকে তো আমিই দ্যাকালাম।

স্যার কোনও কথা না বলে হঠাৎই ধাক্কা দিলেন আমাকে। আমি পড়ে যাচ্ছি ওই বিষপুকুরে। বউ-এর মুখ ভেসে উঠল। বিধবা হয়ে যাবে। আমি জলে পড়ে গেলাম। এবার কুঁকড়ে পুড়ে কালো হয়ে মরে যাব। আমি হাবুডুবু খেয়ে সাঁতার কেটে কোনওরকমে পাড়ে দাঁড়াই। দেখি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার। স্যার কেন রাগ করলেন আমার উপরে? কেন? স্যারকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাব, এমন সময় দেখি স্যার কোমর থেকে ডান হাতটা তুলে একটা আঙুল ঠোঁটে লাগিয়ে রেখেছেন। তার মানে চুপ। মানে চোপ! চো-ও-প! আমি চুপ হয়ে যাই। আমার জামার কাপড় পুড়ে গেছে। ঝুরঝুর করে ঝরে যাচ্ছে। আমার গায়ের চামড়াটা কীরকম খড়খড়ে হয়ে গেছে। গিরগিটির চামড়ার মতো। আমি মাথা নিচু করে বাড়ি যাই। আমায় দেখেই আমার বউ চোখে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠল। আমি বললুম, ভয় পেয়ো না, আমি গো আমি। বউ বোধহয় আমার গলার স্বর চিনতে পারল। চোখ থেকে হাত সরাল, পরক্ষণেই আবার চোখ ঢাকল হাতে। বলল, না, তুমি না। আমি বললুম, হ্যাঁগো, আমি, তোমার আমি, শুধু একটু পাল্টে গেছি। কিন্তু আমি আমিই। আজ দুপুরে পুঁইশাক হয়েছিল, নুন বেশি ছিল, তাই না? তুমি কাল সন্ধ্যাবেলা রেডিমেড ব্লাউজ কিনেছ, লাল, পরে দেখলে টাইট-টাইট। তখন আমি বললুম...

বউ চোখ থেকে হাত সরাল। তারপর কিছুক্ষণ অপলক আমায় দেখল। তারপর কেঁদে উঠল। বলো বলো তোমার এমন দশা কে করেছে? কী বলব আমি? স্যারের আঙুল ছিল ঠোঁটে। আমি মাথা নিচু করে মিন মিন করে বলি, পা পিছলে বিষপুকুরে পড়ে গিয়েছিলুম। ওখানে পড়ে গেলে এরকম হয়। বউ আবার দু'চোখে হাত চাপা দিল।

আয়নায় দেখলাম, কালো চামড়া, কুঁচকানো, খড়খড়ে। চুল সাদা, ঞ্জ সাদা, চোখ বের হয়ে এসেছে। আমি চোখ বুজি।

রাত্রে বউ মাদুর পাতল নীচে। আমার ভালবাসার বউ, আমার নতুন বিয়ে করা বউ আলাদা শুলো। বলল, কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি, তোমায় বড্ড ভয় করছে। বড় দুঃখ হল।

আমার দুঃখের কথা কাকেই বা বলব? টারজনকেই বলি। ওকে তেল মাখাতে মাখাতে ওর গা মোছাতে মোছাতে আমার দুঃখের কথা বলি। ও শুধু শোনে। তবু তো শোনে। কারখানার সবাই প্রথম প্রথম আমার



দিকে অবাক চোখে তাকাত, ভয় পেত, এখন আর ভয় পায় না। এখন আমোদ পায়। আমাকে টিটকিরি দেয়। আমার খড়খড়ে গায়ে অপমান লাগে না।

একদিন স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি স্যারের সুন্দর ঘরে যাই। জীবনে প্রথম! দেয়ালের রঙে বাচ্চা খোকার গালের আভা। ঠাণ্ডা মেশিনের ঝিরিঝিরি। ফল ফুল গন্ধ।

স্যার বললেন, তোমায় দেখে অফিসের লোকেরা সব মজা। করছে?

হ্যাঁ বলি নাকি না বলি আমি?

আমি চুপ করে থাকি।

স্যার বললেন, এতে কাজের ক্ষতি হচ্ছে কোম্পানির। অ্যাটেনশন নষ্ট হচ্ছে। তোমার জন্যে একটা মুখোশ এনেছি। স্যার নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন ওই মুখোশ। বললেন, আয়নায় দেখো। অ্যাটাচড বাথরুমের দরজার দিকে আঙুল দেখান। আমি মুখোশের ঘুলঘুলি চোখ দিয়ে আমাকে দেখি। কী সুন্দর। একদম সত্যিকারের একটা সুন্দর মুখ। মুখে হাসি। পুরো সিনেমার হিরো। স্যার বললেন, কী এবার খুশি? আমি ঘাড় নাড়াই। স্যার বললেন, রোজ এটা পরে অফিসে আসবে। এটা তোমার ইউনিফর্ম। নতুন ইউনিফর্ম পরে বাড়ি যাই। বউ দরজা খুলেই অবাক। বলি, আমি গো, আমি। তোমার আমি। বউ বলল, আবার কোন্ পুকুরে ডুব দিলে? আমি বউ-এর কাছে যাই। আমি বলি, আমার নতুন ইউনিফর্ম। আমি বউ-এর কাছে ঘন হতে যাই। বউ বলে, না গো, এ তো তুমি না। যেন অন্য কেউ। আমি তখন মুখোশ খুলে ফেলি। বউ তখন বলে, এও তো আগের তুমি না। আগের মতোই মাদুরে শোয় বউ, আমি চোকিতে। খবরের কাগজে স্যারের ছবি উঠল বলে আমার খুব গর্ব হল। আমাদের কারখানার ছবি উঠছে। ওই বিষপুকুরের ছবি উঠেছে। আজব মাছের কথা লিখেছে কাগজগুলো। কত সাহেব সুবো আসছে, দেশ-বিদেশ থেকে। ওই পুকুরে বেড়া দেওয়া হয়েছে। কাঁটা তারের ফেনসিং। একটা গুমটিঘর করা হয়েছে। ওখানে চোকিদার। আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি আর যেন আমার মতো কেউ না পড়ে যায় সে জন্যে এরকম ব্যবস্থা নয়, আসলে ওই আজব মাছের জন্যেই এই পাহারা। কাউকে বলিনি।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওই বিষপুকুরে যাই। দেখি মাছ কিলবিল করছে। কিলবিল নয়, খলবল করছে। বহুত বাচ্চা হয়েছে ওদের। সারা পুকুর জুড়ে মাইরি কী আহ্লাদ। আমার খুব ভাল লাগছিল। একে আর বিষপুকুর বলব না। কী বলব তাহলে?

কারখানার ক্যান্টিনে, চায়ের দোকানে, দেশি মালের ঠেকে কত কথাবার্তা, কত আলোচনা। এই পুকুরের জল কিনতে চাইছে আমেরিকা, জার্মানি। আমাদের কোম্পানি দিচ্ছে না। আমি দেখি কত গাড়ি আসে, কত গাড়ি যায়, কত সাহেব আসে, কত সাহেব যায়। সাহেবরা চলে গেলে কত খালি বোতল পড়ে থাকে, কত চিবোনো হাড়...।

তারপর একদিন হল কি, আমাদের ফোরম্যান একদিন একটা গ্লাভস পরে এলেন। উনি সবাইকে দেখালেন ওই আজব মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি ওই গ্লাভস, উনি বললেন, অ্যাসিড প্রুফ, অ্যালকালি প্রুফ, রেডিও অ্যাকটিভিটি প্রুফ। আমি দেখলাম। উনি বলে দারুণ জিনিস। বললেন, কোম্পানি এখন ওই মাছের চামড়া দিয়ে গ্লাভস বানাবে, এপ্রন বানাবে, মুখোশ বানাবে বললেন, আমাদের কারখানা ছুটি হয়ে যাবে।

আমরা সবাই ছুটির ভয়ে থাকি। কে জানে কবে ছুটির খবর আসবে। কাউকে কিছু বলি না। আমার মুখোশ পরা মুখে মুখোশের হাসি লেগেই থাকে।

আমাদের একজন চালাক বন্ধু আছে। ও বলল, ধূস ভড়কি দেখাচ্ছে। এই কারখানা উঠে যাবার জো আছে? এই কারখানাটা আছে বলেই না বিষজল তৈরি হচ্ছে, আর তাতেই না ওই আজব মাছ। অন্য একজন বলল, ওটা বিষজল নয়, সারজল। আমাদের ওই চালাক বন্ধুর কথাটাই ঠিক কানাঘুসোয় শুনলাম আমাদের কোম্পানি এরকম অনেক বিষপুকুর, ভুল বললাম, সার পুকুর বানাবে, যেখানে এরকম মাছের চাষ হবে, ওই মাছের চামড়া বেচবে কোম্পানি। সুতরাং আরও সার পুকুর বানাতে হলে চাই আরও সারজল। আরও সারজলের জন্য আরও বিষ কারখানা।

আমার তা হলে ছুটি হবে না। বড় আনন্দ হল।

একদিন আমাদের ফোরম্যান একটা মুখোশ পরে অফিসে এলেন; খুব গম্ভীর গম্ভীর মুখের মুখোশ। খড়খড়ে চামড়ার। প্রচুর ব্যক্তিত্ব। সব সময় ব্যক্তিত্ব। ওই ক্যারাক্সাস্ মাছের চামড়ায় তৈরি। এরকম একটা মুখোশের হেভি দাম। অ্যাসিড-অ্যালকালি প্রুফ। ফায়ার-রেডিও অ্যাকটিভিটি প্রুফ। উনি বললেন, আমাদের এই কোম্পানির একটা নতুন ইউনিট খোলা হয়েছে। ওখানে ক্যারাক্সাসের চামড়া থেকে এপ্রন-ট্যাপ্রন হচ্ছে, মাস্ক হচ্ছে। আমাদের অফিসারদের একটা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আসলে এখন হাসছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না; কারণ গম্ভীর ব্যক্তিত্বের মুখোশ পোশাকে আছেন তিনি।

আমার যে কত সুন্দর মুখখানা, বউ তাতে খুশি নয়। মুখোশ ভয়। এখনও ভয় গেল না ওর। বড্ড ভয় কাতুরে। কী যে করি। হাসি মুখের ভিতরে আমার মতো দুঃখ শক্ত হয়ে থাকে। বউ কি আমার দুঃখ টের পায়? একদিন রাত্তিরবেলা আমার ঘুম ভেঙে গেলে নিচের মাদুরে শুয়ে থাকা বউ-এর কান্না শুনি। আমি খাট থেকে নেমে যাই। বউ-এর গা ধরে বলি, কেঁদো না। বউ আরও কেঁদে ওঠে। আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দি। ওর গায়ে আমার খড়খড়ে হাত বুলাই। চামড়ায় কষ্ট হলেও ও কিছু বলে না। ওর মুখের দিকে মুখ চলে যায়, ও ছিটকে গিয়ে আবার কেঁদে ওঠে।

ভোরবেলা বউ বলল, ওগো, এভাবে আর পারা যায় না। আমি বরং তোমাদের ওই বিষপুকুরে নেয়ে আসি গে। আমি আঁতকে উঠি। বলি, এত সুন্দর তুমি যে... ও বলে বরং হই বিচ্ছিরি, সুখে থাকব। কাল দেখেছি গাছতলায় দুটো গিরগিটি কত সুখ করছে। আমিও বরং তোমার মতো হই, তাহলে আমরাও সুখী হব। আমি বলি, যদি তুমি মরে যাও? জানো, চিংড়ি মাছের টোপ কুঁকড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল ও বলল, মরলে মরব। এভাবে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। আমি বলি, কী করে নাইবে? ওখানে লোহার বেড়া, ওখানে দারোয়ান। তোমাকে কাছে ঘেঁসতেই দেবে না। বউ বলল, ওগো, দারোয়ানকে কয়ে বলে একটা ব্যবস্থা কি হয় না?

একদিন আমার বউ কীভাবে যে জানে দারোয়ানকে হাত করে না কি যাদু করে ভোর রাতে ওই পুকুরে নেয়ে এল। হাসতে হাসতে বাড়ি এসে আমার ঘুম ভাঙল। সাদা ভ্রূর তলায় বেরিয়ে আসা চোখে আনন্দ আলো ফোকাস মারছে। সারা গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি কাটা-কালচে, খড়খড়ে। ঝোলা চামড়ার মুখে ফুল হাসি। আমি কিছু বলবার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরল ও। অনেকদিন পর আমাদের সুখ এল।

কোম্পানির সাহেবসুবোদের মনে মোটে সুখ নেই। বড় দুশ্চিন্তা। স্যারের মাথায় হাত। খবরের কাগজে বের হয়ে গেছে ম্যানেজমেন্টের লোভ এবং অদূরদর্শিতার জন্য একটি নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ নিঃশেষ। আমাদের স্যার চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে পুকুর পাড়ে বসে থাকেন যদি কোনও নতুন বুটবুটি চোখে পড়ে। এরই মধ্যে আবার কারখানার অ্যাসিড ট্যাংকি লিক। পিচকিরির মতো অ্যাসিড ছিটকোচ্ছে চারিদিকে। অ্যাসিডের ফোয়ারা। কত লোক মারা গেল, কতজন অন্ধ হয়ে গেল, কতজনের চামড়া কুঁচকে গেল। আমার গায়েও অ্যাসিড পড়েছিল, আমার কিছু হল না। আমি দিব্যি হাত দিয়ে গায়ের অ্যাসিড মুছে নিলাম। যাদের চোখ-টোখ নষ্ট হয়েছিল, কোম্পানি ওদের পয়সা কড়ি দিল, কিন্তু আমার কিছু হয়নি বলে আমার কিছু জুটল না। তারপর কোম্পানি সারকুলার ইস্যু করল- সবাই যেন ওই সার পুকুরে স্নান করে আমার মতো হয়ে যায়। কেউ রাজি হল না। বলল, বরং চাকরি যাক, না খেয়ে মরব, তবু গিরগিটি হব না। তখন কোম্পানি জানাল- ফারদার এরকম কিছু হলে কোম্পানি আর কোনও টাকা পয়সা দেবে না। এরই মধ্যে আর এক কাণ্ড। আমার বউ-এর প্রসব ব্যথা। হাসপাতালে নিতে হবে। প্রতিবেশীরা বলল, এই মেয়েছেলেকে হাসপাতালে রাখবে না। একে দেখেই তো পোয়াতিরা ভিরমি খাবে। তা হলে উপায়? ধাই ঠিক করো। ধাই নিয়ে এলাম। বউ কাতরাচ্ছে। আমি বাপ হচ্ছি। একটু পরেই কান্না শুনলাম, শিশুর কান্না। আমার বুকের মধ্যে কারখানা ছুটির ভোঁ বাজল। ধাই বের হল। বললাম, ছেলে না মেয়ে? ধাই বললে, জেবনে এই পরথম ভূতের জন্ম করালুম। পেত্নির গভ্বে ভূতের জন্ম। ট্যাকা দাও।

ছেলেটার চামড়া ঝোলা ঝোলা। সারা চামড়ায় গুঁড়ি গুঁড়ি কাটা। মাথা থেকে বেরিয়ে এসেছে ড্যাবা ড্যাবা চোখ। আমার মুখে স্থির হাসি লেগেই থাকে। পাড়া প্রতিবেশীরা ভূত দেখতে আসছে। ভূতের জন্মকথা ছড়িয়ে গেছে দূর দূরান্তে। ভূত দেখতে আসছে সব। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার স্যারের গাড়িও থামল আমার ঘরের সামনে। স্যার আসছেন, স্যার। আমি দাঁত মাজা বন্ধ করে হাসি মুখোশটা পরে নিই তাড়াতাড়ি। বউ ঘোমটা তুলে দেয় মাথায়।

তোমার ছেলেটাকে দেখব হে...। স্যার বললেন। আমি কাঁথা মুড়িয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসি। স্যার কাঁথা সরিয়ে দিলেন। স্যার মন দিয়ে দেখছেন। স্যার চামড়া টিপে টিপে দেখছেন, শিশুর চামড়া। স্যার স্যাম্পল দেখছেন, স্যাম্পল। স্যারের চোখ চকচক। নিঃশ্বাস ঘন ঘন। স্যার আমার ছেলের চামড়া টিপছেন, কাপড়ের জমিন দেখার মতো শিশুর ঝুলে থাকা চামড়ার দুপাশে আঙুল লাগিয়ে ঘষছেন। স্যার হাসলেন। বললেন, বাঃ। তারপর স্থির হলেন। চোখ স্থির, দেহ স্থির। মন্ত্র পড়ার মতো বলতে থাকলেন- ইউরেকা...ইউরেকা... নতুন প্রজাতি। নিউ স্পেসিস। ক্যারাক্টার... নিউ ক্যারাক্টার...

আমার শরীরের ভিতরে বুটবুটি কাটা তীর গোঙানি।

তবু আমার হাসি হাসি মুখ।

আমার হাসি মুখ।

আমরা হাসি।

## হনুমান

হনুমানটা বেশ লম্বা নাকের খোদলটা লাল লাল। গায়ের লোম গাওয়া ঘিয়ের মতো। ফর্সা মুখ। ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা গাট্টাগোটা হনুমানটিকে দেখছিল পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হাইটের রোগা রোগা হনুমান। বেঁকা বেঁকা ল্যাজটা পিছনে ফিট করা, তারও খড়ের। সর্বদাই খণ্ড হয়ে থাকে। কালো কুচকুচে মুখ। মুখে আপাতত বিড়ি।

কোন পুরাণে, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে হনু হ'ল গৌরবর্ণ? মানুষ হনুমানটি কপাল কুঁচকে নিজে নিজে বলে। ও তবু দেখে। অবাক হয়ে মানুষের তৈরি সুন্দর হনুমানটিকে দেখে। হনুমানটি হাতদুটো দিয়ে বুকের মধ্যে একটা গর্ত বানিয়েছে। গর্তটা বেশ বড়। এক ডজন কলা সঁটে যাবে। গর্তটার তলাটা প্লেন। সেখানে নোট, কয়েন ...। সবুজ সবুজ পাঁচ টাকার নোটও দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। কিছুক্ষণ আগেও ওই খোঁদলটার ভিতরে বাংলায় লেখা জয় শ্রীরাম পড়া যাচ্ছিল। এখন লেখার উপরে টাকা পয়সা। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হনুমান সাজা কদম্ব গুছাইত। ওর দশ টাকাও হয়নি আজ এই গঙ্গাসাগরের মেলায়; আজ প্রথম দিন। শুনেছিল হনুমানের বাজার এবার ভাল। জয় শ্রীরাম বলে লাফিয়েছে ডুবফেরত মানুষের কাছে, কপিলমুনির আশ্রমে, তেমন হয়নি। কদম্ব ভাবে ও কি হনুমান পাণ্টে কালী হবে? বাঙালিরা কালীকে দেয়থোয়। কিন্তু এই মেলায় হিন্দুস্তানী বেশি। তাই হনুমান। হনুমান যে ভালই খাচ্ছে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে কদম্ব মেলায় অনেক হনুমান, প্রত্যেকেই পয়সা পাচ্ছে; এরকম মাটির হনুমান তিনটে দেখেছে, মেশিনের হনুমান দুটো।

মেশিনের হনুমানের পেটে একটা গর্ত আছে। গর্তের মধ্যে একটাকার একটা কয়েন ফেলে দিলেই হনুমানের শরীরে ঘটাং-ঘটাং শব্দ হয়। ওর মুখটা একটু উপরের দিকে ওঠে দু পাশের দুই হাত বুকের মাঝখানে আসে। আর বুকটা দুভাগ হয়।

এতেক বলিয়া তবে পবন কুমার  
নখে চিরি বক্ষঃস্থল করিল বিদার  
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ  
অস্থিময় রাম নাম লেখা লক্ষ লক্ষ।

চামড়া সরে গেলে বুকের ভিতরে কাচ বাঁধানো রামসীতার ছবি। ছবির তলায় ছোট ছোট লেখা শ্রীমা আর্ট প্রেস। তারপরই হনুমানের মেশিন-হাত নেমে যায়, চামড়াটা সাট করে বন্ধ হয়ে যায়। থেমে গেলে হনুমান স্থির হয়ে যায় ফের। পেটের গর্তে আবার একটা টাকা ফেলে দিলে মোটর চালু হয়, লিভার পুলি চালু হয়, চালু হয় হনুমান মাহাত্ম্য। বুক চিরে রামসীতা দেখায়, সামনে দাঁড়ানো লোকজন টেঁচায়-জয় রাম জী কী। খুচরো পয়সা হনুমানের গায়ে লাগে। হনুমানের পিছনে একটা চাবির গর্ত। একটা লোক একঘণ্টা পর পর আসে। চারি মেরে দিলে পেছনটা খুলে যায়। ওখানে একটা পাত্র থেকে একটাকার চাকতিগুলি শব্দসমেত ব্যাগে ভরে নেয়। মানুষ হনুমান গুছাইত মেশিন হনুমানের এইসব সৌভাগ্য দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যে

লোকটা ব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে কোনও মিষ্টির দোকানের দিকে গেল পঞ্চাশ বা একশ টাকার কাগজ করে নেবে বলে, যাবার সময় হুকুমের মতো কথা দিয়ে গেল-আই, সব লাইন লাগাইয়ে, লাইন...

লাইন এগোচ্ছে কারসাজির দিকে। কদম্ব লাইনের কাছে দাঁড়ায়। ওঠে, দুই হাতে তালি দেয় জোরে। চিৎকার করে বলতে থাকে-

পবননন্দন হাম বীর হনুমান হায়  
ইয়ে হাত নেহি ফাঁসীকা ফান্দা হায়  
রাবণশালা সীতা মাই কো হরণ করিল  
লক্ষ্ম দিয়া হনুমান সাগর লঙ্ঘিল  
রামের অভিজ্ঞান দিল অশোক কাননে  
বাতচিত সব কিয়া সীতাদেবী সনে  
রাবণজীকা আদমী যব উল্কা পাকড় লিয়া  
হনুমানজী নে স্বর্ণলঙ্কা পুরা জ্বালা দিয়া  
হায়রে স্বর্ণলঙ্কা দাউ দাউ গেল রে ভাই জ্বলে  
ওলে ওলে ওলে...ওলে ওলে।।

কদম্ব ওর হনুমানে হিন্দি মেশায়, সিনেমা মেশায়, লক্ষ্ম-বাক্সও মেশায়-ও যতটা পারে এ বয়সে। পয়সা পায় কিছু কিন্তু মেশিন হনুমান পায় আরও অনেক বেশি। মানুষ কি আজকাল মেশিনকেই বেশি ভালবাসে?

রানাঘাটের মতি সাহার ঝুলনে গোবর্ধন ধারণ, বকাসুর বধ, বস্ত্রহরণ, খাণ্ডব দাহন, রামলীলা এইসব পুতুলে দেখানো হ'ত। গত ক'বছর ধরে এসব পুতুলগুলো মেশিন হয়েছে। কাগজের পাহাড়টাকে ধরে শ্রীকৃষ্ণ ওঠান আর নামিয়ে দেন। তলায় লেখা গোবর্ধন ধারণ। গোপিনীরা একবার দু'হাতে বুকচাপা দেয়, একবার দু'হাত শ্রীকৃষ্ণের দিকে উঁচিয়ে ধরে। গোপিনীদের হাতে দড়ি বাঁধা, তলায় মোটর। এখন মতি সা'র ঝুলনের নাম নড়া পুতুলের ঝুলন। জ্যান্ত মানুষরা ভিড় করে দেখতে আসে।

কদম্ব সাগরসঙ্গমে ঝাউগাছের তলায় বসে আছে। সাদা সাদা বালি। ও গালে হাত দিয়ে ভাবে। ওর হাতের উপর একটা ফড়িং বসল। কদম্ব হাতটা নাড়াল না, স্থির রেখে দিল, মূর্তির মত। ফড়িংটা অনেকক্ষণ বসে রইল।

মূর্তি হলে কেমন হয়? কদম্ব ভাবল। দেবতার মূর্তি হয় যদি? দেবতা নড়ে না। ওর দুটো হাত রাখা আছে প্রভাত মিশ্রের মেঠাই দোকানে। দড়ি দিয়ে বুকের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া যায়। আসল হাতদুটোর সঙ্গে জুড়লে চারটে হাত হয়ে গেল। চারহাতে নারায়ণ মুখে কালো রঙ আর জিভ লাগালে কালী। ও কালী হবে নাকি নারায়ণ হবে ভাবছিল, এমন সময় দেখল চারজন লোক ধরাধরি করে রামসীতা নিয়ে যাচ্ছে।

কদম্ব ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। লেজ নড়ছে। লেজটা খড়ের, কদম্ব নাড়াতে পারে না, নড়া বন্ধ করতে পারে না। কদম্ব চলছে, সামনে রামসীতা। চারজন লোক, যারা রামসীতাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সামনে আরও দু'জন। একজন ধুতি-শার্ট অন্যজন ফুলপ্যান্ট। ফুলপ্যান্টটা বলল, দেখো দেখো, রেডিমেড হনুমানও পেয়ে গেলে। ধুতিপরা লোকটার ঘড়ি লাগানো আর পাথর লাগানো ইশারায় কদম্ব রামসীতার

পিছন পিছন যেতে লাগল। কদম্ব ওর দু'হাত জোড় করে নিল। শিরদাঁড়া আর একটু বেঁকিয়ে নিল। অনুগত হনুমান হাঁটছে বাবুদের পিছন পিছন। একজন চামড়ার জ্যাকেট পরা, মুখে দাড়ি, কিলিক্ কিলিক্ করে ছবি তুলে নিল। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনে কিছুটা জায়গা দরমা দিয়ে ঘেরা হয়েছে আগেই, ওখানে একটা আমগাছ। আমগাছ তলায় ওরা মূর্তিটা বসাল। ধুতিপরা লোকটা ওর সাইড ব্যাগ থেকে বের করে নিল একটা খবর কাগজের মোড়ক। 'মহাকাশে আরও উপগ্রহ ছাড়বে ভারত' লেখা কাগজটা মাটিতে ফেলে দিতেই রাংতা আর পুঁতি বসানো মুকুট বেরিয়ে আসে। রামসীতাকে পরানোর পরও আরও একটা থেকে যায়।

একটা কালো বাস্কে ব্যাটারি রাখা হয়। রামসীতার পিছন থেকে বের হয়ে এসেছে রাঙা দুটি তার। ব্যাটারি লাগে তারে, আরে আরে, অমনি রামের হাসি-হাসি মুখ নড়ে ওঠে, সীতার হাসি-হাসি মুখ, চিরহাসি মুখ নড়ে ওঠে। রামসীতার ভাব জমে ওঠে। রামের মুখ সীতার দিকে ঘোরে, সীতার মুখ রামের দিকে ঘোরে। রাম সীতার হাত ধরে। মিলন হ'ল, আহা মি-ল-ন হোলো...। হরিবোল! ঘটংঘট। রামের মুখ ঘুরে যায়। সীতার মুখ ঘুরে যায়। হনুমান হাততালি দিয়ে ওঠে।

লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান  
শ্রীরামের ভক্ত নাহি তোমার সমান  
তোমারে জানেন রাম, রামে জান তুমি  
তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি  
হনুমান বলে আমি বনের বানর  
রামের দাসানুদাস তোমার নফর  
শুনিয়া হনুর কথা শ্রীরামের হাস  
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

ফুলপ্যান্টপরা জন বলল গজা, আমরা অলরেডি লেট। মাইক ফিট কর জলদি। দরমার বাইরে একটি টেবিল। ওখানে হলুদ টিকিট পাথর চাপা। একটি লোকের হাতে মাইক। মাইকের তারে ব্যাটারি যুক্ত হয়ে গেল। ক্যাসেটে বেজে উঠল কালি কালি আঁখে-তুরুর তুরুর...আসুন, দর্শন করুন রামের অভিষেক। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পী দ্বারা তৈরি রামসীতার পেটের ভিতরে অদ্ভুত, বিস্ময়কর জাপানি মেশিন। দর্শন করুন রাম হাস্য করিতেছেন, সীতামায়ের হাত ধরিতেছেন। দর্শন করুন – শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের আশ্চর্য মহিমা। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে পুণ্য লাভ করুন...টিকিট মাত্র একটাকা। দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা...হায় রাম... দরমার বেড়ার ও-পাশে ভিড়, এ-পাশে ব্যস্ততা। রামসীতার সামনে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালা রাখা হ'ল। বাবুরা খুব হুকুম টুকুম করছে। কদম্ব ধুতিপরা জন আর ফুলপ্যান্টপরা জনের দিকে তাকিয়ে ওদের সম্পর্ক বোঝাবার চেষ্টা করে। মামা ভাগ্নে? কাকা ভাইপো? শ্বশুর জামাই? ওই দু'জনের মধ্যে ধুতিপরাকেই আসল ভেবে কদম্ব ওর দিকে চেয়ে বলল, আজ্ঞে আমি এখানে রামসীতার কাছে হনুমান হয়েই থাকি? হাতটা জোড়াই ছিল। ধুতিপরা জন হাতটা তুলে সামান্য নাড়াল। যেন তথাস্তু। লোকটা কি নিজেকে বান্ধীকি ভাবল? ফুলপ্যান্টপরা জন তুড়ি দিয়ে ধুতিশার্টকে ডাকল। একটু যেন

শলাপরামর্শ করল। তারপর ফুলপ্যান্টপরা জন কদম্বকে ইশারায় ডাকল যেন ‘এই হনুমান কলা খাবি।’  
হনুমান দাঁড়াল। জোড় করা হাত। সদা সেবাদাস।

নাম কী?

কদম্ব গুছাইত।

থাকবে সারাদিন?

হনুমান ঘাড় নাড়ল।

কী নেবে?

আট আনা।

আট আনা মানে? ঘণ্টায়?

মানে হাফ হাফ।

ধুতিপরা জন দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিড়িক করে পানের পিক ফেলল। এঃ ফিফটি পার্সেন্ট! হাতের মাছি  
তাড়বার মতন বলল-লাগবেনে, লাগবেনে। হনুমান ছাড়াই শো হবে। ফুলপ্যান্টপরা জন কপালটা একটু  
কুঁচকে ধুতিপরা জনের দিকে তাকাল। বলল, তুমি থামো তো। তারপর কদম্বকে বলল, শোনো স্ট্র্যু পার?

পারি।

কী বল তো?

ওই তো, লড়নচড়ন বন্ধ। মূর্তি মানুষ হয়ে ভুলি থাকতি হবে আমি মানুষ, মনে করতি হবে আমি পাথর।  
আমি মাটি। আকাশে এলোপ্লেনের শব্দে উপরে দিখব না। বোমা পল্লি চমক পাব না। বোঁদে সিঙ্গাডার গন্ধ  
পাব, নেলো হব না। গায়ে মাছিটাছি যদি বসে, বসুক বসুক ভেবে সহ্য করি নিতে হবে।

-বাঃ।

-আগে আগে স্ট্র্যু-কাজ করেছিলে?

-আজ্ঞে, চাকদার বুলনে করেছি। জ্যাস্তবুলন হয় ওখেনে। নারদ হয়েছিলাম। তা বাদে বিয়ে বাড়িতে  
কাজ করেছি। পাগড়ি পরে, গোঁপ লাগিয়ে, আলখাল্লা গায়ে দিয়ে, আলখাল্লার ভিতরে কাপড়ের পুঁটলি  
টুকিয়ে ভুঁড়ি বানিয়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বিয়ে বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছি। ওটার নাম মহারাজা পোজ।  
একেদম লড়াচড়া করিনি। কতজন টিপে দেখেছিল আমি মাটির না মাংসের।

-এখানে একটু অন্যরকম কোরো বুঝলে, একেবারে স্ট্র্যু না থেকে নড়াস্ট্র্যুর মতো কোরো। রামসীতার  
দরবারে হনুমান যে পোজ নিয়ে বসে, ওইভাবেই বসে থাকবে তুমি, আর যেই না আমাদের রামসীতা হাত  
ধরবে, ওমনি তুমি তোমার দুহাত উপরে তুলে চোঁচিয়ে উঠবে-জয় সীরাম।

-পেমেন?

-পেমেন্ট...মনে কর... সারা দিনের জন্য পঞ্চাশ টাকা, আর তুমি যদি আলাদা প্রণামী কিছু পাও...পাবেই,  
তার ফিফটি মানে আটআনা।

-পঞ্চাশ না, একশো করেন। মেলার কণ্টা দিনই তো যা রোজগার। এমনি হনুমান হয়ে ঘুরে বেড়ালিই  
পঞ্চাশ-ষাট হয়ে ঝায়, কাদার হনুমান হয়ে তবে কী লাভ? জ্যাস্ত বুলনেই পঞ্চাশ পাতাম, এত খরচ-খরচা

করি এখানে এসে যদি একশো না হ'ল...

—একশোর উপর হয়ে যাচ্ছে। প্রণামী আছে না। আচ্ছা, সন্তর দেব, আর প্রণামী।

আর পাঁচটা টাকা...

আচ্ছা, দেখা যাবে।

—কদম্ব রামসীতার সামনে বসল কিছুটা নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে। ওর মাথায় পরিয়ে দেয়া হ'ল রাংতার মুকুট। কদম্ব বলে উঠল--জয় সীরাম। তুরুর তুরুর। ভিড় শুরু হয়ে গেছে। বাইরে মাইকের পাবলিসিটি-আইয়ে আইয়ে জনাব...দর্শন কিজিয়ে। রামসীতা কি যুগলমূর্তি দেখিয়ে। দেখিয়ে রামজী নে ক্যাইসে সীতা মঙ্গিকো হাথ পাকড়লেতা হয়।...

...হনুমান বলল, যাই, পেসসাব করে আসি।

হনুমান গাছের আড়ালে যায়। মাথায় মুকুট।

শো শুরু হয়ে গেছে। লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে। কপালে তিলক। দাদুর কাঁধে নাতি। মায়ের কোলে ছেলে। কদম্ব তো হনুমান, ও শুধু রামের দিকে, সীতার দিকে চেয়ে আছে। রামসীতার শরীর থেকে হান্কা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে। মোটরের। রামের মুখ আস্তে আস্তে সীতার দিকে ঘুরে যায়। সীতার মুখ আস্তে আস্তে রামের দিকে ঘুরে যায়। রামের হাত সীতার দিকে, সীতার হাত রামের দিকে। হাত হাতে স্পর্শ। অমনি কদম্ব দু'হাত তুলে 'জয় শ্রীরাম' বলে চৈচিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কেটে দেখতে আসা লোকজনও জয় শ্রীরাম বলে আপ্লুত আওয়াজ করে। আর থালায় পয়সা। হনুমানের দিকেও পয়সা পড়ছে। হনুমান আড়চোখে দেখে। কিছু পয়সা ওর সামনে, কিছু রামের সামনে। হনুমান আর রামের মাঝামাঝিও কিছু পয়সা পড়েছে। রামের অধিকারের সীমানা কতদূর? আর ওর সীমানা? কতদূর পর্যন্ত ওর? সীমানা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। অধিকার ভাববার অবসর নেই। রামসীতার হাতের স্পর্শ হলেই ঘটাংঘট আর হনুমানের দু'হাত উপর।

একজন বউ, কোলের বাচ্চা মাই খাচ্ছে, ওর স্বামীকে বলল—এই হনুমানটাও কি কলকজার হনুমান? ওর স্বামী একটু দেখে বলল, না, মানুষ মনে হচ্ছে। একজন ভিনদেশী বুড়ি অনেকক্ষণ ধরে হনুমানকে দেখল। তারপর বলল, আদমী মালুম হোতা হয়। বুড়িটা রামের দিকেই শুধু ছুঁড়ল। হনুমানের দিকে কি আদমী বলে ছুঁড়লো না? মানুষ বলে? রামের দিকে ছুঁড়লো ভগবান বলে? নাকি মেশিন বলে? কদম্ব যখন কালী হয়, কিংবা নারায়ণ হয় বা হনুমান হয় তখন ওকে তো ভগবান ভেবেই দেয়। এই যে মানুষজন সব দর্শন করতে আসছে, পয়সাটয়সা দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে? ভগবানকে, নাকি ভগবানের নড়াচড়াকে, কলকজার মাহাত্মকে, মাহাত্মর যে কত রকম রূপ!

কদম্ব চোর ছিল। চুরি করতে গিয়ে কদম্ব ওর নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছে মানুষ মানুষকে ভালবাসে। মানুষ মানুষের সঙ্গে থাকতে চায়। কেউ একজন চোর বলে হাঁক দিলে দশজন মানুষ ছুটে আসে। দশজন মিলে প্যাদায়, আবার দশজন মিলেই ঠোঁটের রক্ত মুছিয়ে দেয়, জল খাওয়ায়, হাওয়া করে। কদম্ব কীভাবে যেন জেনেছে বহু লক্ষ বছর ধরে মানুষ শিকার করেছে মানুষে মানুষে মিশে। চাষবাস করেছে একসাথে। মাইকে একটা গান শুনতো খুব – মানুষ মানুষের জন্য। কদম্ব যখন হনুমান বা মাকালী হয়ে ঘোরে, লোকে



আহা, বেচারী মানুষটা, এই ভেবেই তো পরসাদ দেয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের বহুদিনের সংসার। তবে কেন মানুষ-হনুমানের চেয়ে কলকজ্জা-ভগবানে বেশি নজর?

কদম্ব এইসব চিন্তা করে, আর চিন্তার মাঝে মাঝেই, ঠিক টাইম মতন, টাইম মতন ‘জয় সীরাম’ বলে দেয়। ক্রটি হয় না। এই যে কদম্বের ক্রটি হচ্ছে না, টাইম মত হাত উঠে যাচ্ছে, ওকে কি লোকে কারিগর বলবে? নাকি আর্টিস্ট? নাকি যন্ত্রণ? ও যখন সঙ করত শুধু, চাকদার রামলাল সাহাই প্রস্তাব দিয়েছিল ব্যাণ্ডপাটির ফল্‌স্‌ হবি? রামলাল সাহা হল ডেকরেটারের মালিক। চেয়ার টেবিল মাইক ঝাড়লঠন ভাড়া দেয়। ব্যাণ্ডপাটিও ভাড়া দেয়। ড্রাম-ক্লারিওনেট-বিউগল! হয়তো কোনও পাটির সঙ্গে কথা হচ্ছে—

মিউজিক হবে?

পাবেন। কী চাই?

এক ডজন ড্রাম, হাফ ডজন ক্লারিওনেট, দুজোড়া বিউগল।

হয়ে যাবে।

কত পড়বে?

দেড় হাজার।

এক হাজারে করে দিন।

তাহলে চারটে ড্রাম, তিনটে ক্লারিওনেট ফল্‌স্‌ হয়ে যাবে।

ফল্‌স্‌ মানে হল নাদান লোকের হাতে যন্ত্র থাকবে, ওরা শুধু হাত নেড়ে যাবে, বাজাবে না, ফু দিয়ে যাবে, বাজাবে না। ওরা বাজাতে জানে না। শুধু বাজাবার ভান করবে। নাদান মানুষের মজুরি কম। কদম্ব বিউগল বাজাত, ফল্‌স্‌। শব্দ হত না। অন্য শব্দের সঙ্গে ওর নৈঃশব্দ মিশে যেত।

একদিন রামলাল সাহা বলল, জ্যাস্তুলনের পুতুল হবি? মানুষ পুতুল? চাকদায় জ্যাস্তুলনে দেখেছিল শ্রীকৃষ্ণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নটরাজ শিব... সবাই পাথরের মূর্তির মতো স্থির। ওইগুলো হল জ্যাস্তুলনের না-নড়া পুতুল। আর বকাসুর বধ, হিরণ্যকশিপু বধ, রামের হরধনু ভঙ্গ, এগুলো হল জ্যাস্তুলনের নড়া পুতুল। রামলাল সাহা বলেছিল, তোর হবে। চৈতন্য হ। কদম্ব দু’হাত তুলে চৈতন্য হয়েছিল। রামলাল সাহা বলেছিল, ব্যাপারগুলো ভাল করে শিখে নে কদম্ব। হাত দুটো উপর দিকে উঠিয়ে দাঁড়ালে শ্রীচৈতন্য। হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিলে যিশু এরকম বুকের কাছে হাতদুটো ভাজ করে রাখলে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ এরকম। আর গালে হাত দিয়ে ভাবলে সুকান্ত।

কদম্ব সেবার বেশ ভালই চৈতন্য হয়েছিল। আঁকা ভ্রু, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, গলায় মালা। শুধু মাথাটা নেড়া করতে হয়েছিল। জ্যাস্তুলনে যারা ভাল পারে, রামলাল সা’ ওদের অন্য জায়গায় ভাড়া দেয়। বিয়ে বাড়ির গেটে থাকত কলাগাছ। সাদা পিজবোর্ড... পিজবোর্ড তো নয়, থার্মোকল, ওই থার্মোকল কাটা বডিজ পরা শঙ্খ বাজানো মেয়েছেলে দেখেছে গেটে লাগানো। শাঁখ বাজাচ্ছে মাটির সুন্দরীও দেখেছে। সেদিন দেখল জ্যাস্ত-পুতুল। রামলাল সা’ ভাড়া দিচ্ছে। কালী-প্যাণ্ডেলে জ্যাস্ত রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, রামকৃষ্ণ ভাড়া দিচ্ছে রামলাল। পুজার আগে কাপড় দোকানের কাচের ভিতরে জ্যাস্ত-পুতুল কাপড় পরে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামলাল ভাড়া দিচ্ছে। কদম্বও ভাড়ায় খেটেছিল মহারাজ। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লাল আলখাল্লা মুখে ঝুলে পড়া গৌঁফ, শরীরটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে, কুঁজো হয়ে হাতটা কপালের কাছে এনে স্থির হয়ে যাওয়া।

এই পোজটা কোন্ দেশের মহারাজের জানে না। একটা দু'ইঞ্চির কুঁজো হয়ে থাকা, নিচু হয়ে থাকা মাটির পুতুল দেখিয়ে রামলাল সা' বলেছিল, এই হ'ল মহারাজ। তোকে এরকম হতে হবে। দু'ইঞ্চির পুতুল দেখে পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চির পুতুল হতে পেরেছিল কদম্ব। অসুবিধে হয়নি।

মানুষকে নকল করে পুতুল হয়েছে। এখন পুতুলকে নকল করছে মানুষ।

এখন নড়ল কদম্ব। কারণ রাম নড়ল, সীতা নড়ল। হাসিমুখ নড়ল। জয় সীরাম।

বাঃ, রাম, বাঃ, বেশ পার মাইরি। সীতাকে দেখে তুমি হাসছ, হাত ধরছ, অভিষেক মারাজ্ছ। কি বলেছিলে তুমি?

সূর্যবংশে জন্ম মোর দশরথ নন্দন  
তোমা হেন নারীতে নাহি প্রয়োজন  
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে  
যথা ইচ্ছা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে  
সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাজ  
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক লাজ  
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইলেন কুণ্ড  
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড  
কাষ্ঠ পরি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি  
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম মহিষী  
দেখ ভাই দেখ দেখ কী আশ্চর্য সীন  
সীতা পুড়িল না, ত্রেতায় না ছিল কেরোসিন।।  
দুহাত তুলে জয় সীরাম ফের।

আচ্ছা মাইরি হনুমান, পবননন্দন, তুই বসে বসে দেখলি সীতাকে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কিছু বললি না। অথচ তুই অষ্ট রাক্ষস বধ করিলি, স্বর্ণলঙ্কা দহন করিলি। সীতা পোড়ানোর সময় স্পটে ছিলি তুই। কী করিলি তখন? তুই বল। অথচ, সীতা তোকে কী ভালই বাসত, বল! সীতা তোকে বর দিয়েছিল-

দুই হাত তুলি হনু তোমায় দিনু বর  
মোর বরে চারিযুগে হইবে অমর  
সীতা বলে যতকাল থাকিবে পৃথিবী  
রোগশোকহীন তুমি হও চিরজীবী  
যাবৎ রামের নাম ঘোষিবে সংসার  
ততকাল হও তুমি অক্ষয় অমর  
হনুমান তোমারে দিলাম এই বর।

আর সীতার শরীরে যখন আগুন, তখন তোর সন্তামধ্যে জয় শ্রীরাম। কারণ ওই কথাটা তোর অন্তরে ছিল না। শ্লোগানে ছিল। তুই ততদিনে দমের পুতুল হয়ে গিয়েছিলি। নড়া-পুতুল। বশ্যতায়।

হীনরাব শুনলেই জিন্দাবাদ বলে কদম্ব। জিন্দাভাত বলতে খুব ইচ্ছা করত আগে। এখন করে না। গ্যাট চুক্তি নিপাত যাক বলে, এখন বলল জয়-সীরাম। রামসীতার হাতধরা থেকে ছেড়ে দেয়া, আবার হাত ধরা গুনলে মোট ১৮০। এখন ১৮০ না-গুনেও চোখে না-দেখেও বলে দিতে পারে কদম্ব। সারা শরীরে ১৮০-র বোধ চলে আসে ওর। পা ঝিনঝিন করছে কদম্বর। করুক। ও কিছু নয়। খিদে পেয়েছে। সয়ে যাবে। গায়ে মাছি বসছে। সয়ে যাবে। ল্যাজে বসেছে ভিমরুল। কী মজা। ল্যাজের নিজস্ব অনুভূতি নেই। ওটা খড়ের। কামড়ালেও লাগবে না। সারাটা শরীর মাইরি যদি ন্যাজের মতো হয়ে যায়... জয় সীরাম। চোখ খুলল। একটু ভুল হয়ে গেছে। রামসীতা তখনও হাত ধরেনি। কয়েক মুহূর্ত আগেই বলে ফেলেছে কদম্ব। কদম্বর চোখে একটু যেন অপরাধবোধ। কদম্ব ফুলপ্যান্টপরা জনের দিকে তাকাল। কদম্ব কি ওকেই এতক্ষণ জয় শ্রীরাম বলছিল?

গঙ্গাসাগরের এই মেলাটা ভেঙে গেলে ওই লোকগুলোর সঙ্গে লেনদেন ভাঙবে না কদম্ব। ওরাও কি হরি সা'র মতো ভাড়া খাটায় নাকি অন্য কোনও হরি সা'র কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে আসে? ওরা কি মেলায় যাবে কদম্ব? তাহলে সারা বছর কাজ হবে! পয়সা হবে। পয়সা দিয়ে কদম্ব কী করবে? আবার সংসার করবে? সংসার মানে চালায় লাউ, বালতিভরা জল, দাওয়া, মুড়িমাখা। আবার সংসার মানে কেরোসিনও তো।

সংসার পেতেছিল কদম্ব। বসিরহাট। ও পারেনি। পালিয়েছিল। ওর বউ তখন পোয়াতি। বউয়ের নাম প্রতিমা। কদম্বর মনে হয়েছিল, প্রতিমার গর্ভের সম্ভান যখন ছিচকে চোরকে বাপ ডাকবে, তখন কি সামলাতে পারবে ও? মনে হয়েছিল, বাবুদের বাড়ি গিয়ে বাসনপত্তরের সঙ্গে ও কি বুঝবুঝিও চুরি করবে? দু'দিকে টুপি পরানো বোতল? চুরি করবে ডটপেন- সাদা খাতা? চুরি করবে লাল মলাট বিদ্যাসাগরের বই? পালিয়েছিল কদম্ব! ওর সেই বউ আর সন্তানের খবর জানে না ও। এখন মাঝামাঝি দেখতে ইচ্ছে হয়। পুরানো সংসারটার গায়ে বিছিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় লাউলতা।

চুরি করার জন্যই সংয়ের কাজটা শিখেছিল কদম্ব। মুখে কালি মাখতে শিখেছিল ঠিকমতো। হঠাৎ হঠাৎ স্থিরমূর্তি হয়ে যাবার অভ্যাস করেছিল। সব বিদ্যারই শুরু হয়। চুরির সময় ওর গুরু ছিল গুরুপদ। সংয়ের কোনও গুরু ছিল না। বাগদি বাউড়িদের মধ্যে যারা সঙ সেজে বেড়ায় ওরা ওদের বাপ-পিতামোর কাছ থেকে শিখেছে। কদম্ব শিখেছে সমাজের কাছে। তাই ও শুধু কালী-কৃষ্ণ সাজে না। ব্লক-এর 'যেমন ইচ্ছা সাজা' প্রতিযোগিতায় 'চোর' সেজে কৃষ্ণবাসী রামায়ণ প্রাইজ পেয়েছে কদম্ব। একবার সেজেছিল রানার। কিছু লোক জানে, কখন কী সংয়ের বাজার। হরিলাল সা' জানে।

এখন খুব ভিড় বেড়েছে। তা-তা-তা তুরু তুরু। দেখুন দেখুন মানুষের মতো পুতুল আর পুতুলের মতো মানুষ। দেখুন মানুষ আর পুতুল সাইড বাই সাইড। তা-তা-তা তুরু তুরু কদম্বের সামনে ভিড়। পয়সা পড়ছে ঠং ঠং ঠং। একটা বাচ্চা মেয়েকে পিছন থেকে বদমায়েসি করছে পিছনের মোটা লোকটা...জয় শ্রীরাম। একটা হার ছিনতাই হ'ল কার। জয় শ্রীরাম। একটা বউয়ের মৃগী হয়েছে। পড়ে যাচ্ছে ভুঁইয়ে। কোলের বাচ্চাটা পড়ে গেল। কেউ মাড়িয়ে দিল ওর হাত। জয় শ্রীরাম। বমি করল একটা লোক। কিছু না। খিদে পাচ্ছে।

কিছু না। একটা বুড়ি বলল, বেচারী, হনুমানটার বড় দুঃখ... কিছু না। ওটা কে দাঁড়িয়ে সামনে? প্রতিমা না? প্রতিমাই তো। ওই তো থুতনির দাগ। ওই তো ভাসা চোখ, এখন কালির দাগ। সঙ্গে দুটি ছেলে। একই রকম দেখতে। যমজ? লবকুশ? হাতে আয়রে বুকে আয়। ওরা রাম সীতা দেখল অবাক হয়ে। যন্তরের হাতনাড়া দেখল হনুমান দেখল। ‘মা গো, হনুমানটা মানুষ নাকি রামের মতোই যন্তর?’ ওদের মা বলল হবেই একটা। ওই তো সেই গলার আওয়াজ। শরবত খাবা? ওই তো আদিখ্যেতা! ওই তো।

একটা ব্যাগ বের করল ওই প্রতিমা। লাল ফোম-এর। ব্যাগের থেকে দুটো কুড়ি পয়সা বের করল। ছেলেদের হাতে দিল। বলল, রাম সীতারে দ্যাও। ওরা দিল। তারপর দশ দশ পয়সা বার করল। ছেলেদের হাতে দিয়ে বলল, হনুরে দ্যাও। ওরা দিল। বলল, পেন্নাম করো। ওরা করল। ওরা চলে গেল।

কে যে কীভাবে কখন মেশিন হয়ে যায় কে জানে? কদম্ব ভাবল।

তারপর রামসীতার আরও বহুবার ঘাড় ঘোরাবার পর রামসীতার ঘাড়ে ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ হবার দরুন রামসীতার ঘাড়ে একটু গ্রীজ মাখাবার জন্য ধুতিপরা জন রামের সঙ্গে ব্যাটারির কানেকশন কেটে দিল। কদম্বের পিছনের সঙ্গে ব্যাটারির যদিও কোনও সংযোগ ছিল না, তবুও দেখা গেল, তখনই, ঠিক তখনই কদম্বের হাত নেতিয়ে পড়ল, ঘাড় টিলে হয়ে গেল এবং মাথা থেকে পড়ে গেল রাংতার মুকুট।

## কুহ

উ ইণ্ড স্পিড ওয়ান এইটি ডিগ্রি, থ্রি নট্‌স্‌। আকাশে হাঙ্কা অল্টো কিউমুলাস। পি.আর.ও পার্থ বসুর বাড়িতে ষ্টিরিওতে জ্যাজ বাজছে। কোকিল ডাকল। বসন্তকাল।

বসন্তকাল। একশো আশি ডিগ্রি থেকে হাওয়া আসছে হাঙ্কা হাঙ্কা। মৃদুমন্দ হাওয়া। বাতাসে অ্যানিলিনের গন্ধ। দক্ষিণ থেকে আসছে। প্ল্যান্টটা দক্ষিণ দিকেই।

আজ ছুটির দিন হলেও প্ল্যান্টটা চলছে। প্ল্যান্ট রোজই চলে। এখন মালের প্রচণ্ড ডিমাণ্ড। কারখানা চলছে। রক্ত তৈরির এই কারখানার কর্মচারীদের বসবাসের জন্য তৈরি হয়েছে এই হাউসিং কলোনি। কৌশিক এখন একটা সাইকেল নিয়ে কলোনিতে ঘুরছে। এই কলোনির পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বে আছে কৌশিক। আগামীকাল পরিবেশ মন্ত্রী আসবেন। কোকিল ডাকল।

রাস্তাটা তকতক করছে। একটাও গুকনো পাতা পড়ে নেই। এ দিককার ঝাউ গাছগুলি প্লাস্টিকের। সফ্ট পি.ভি.সি.। বাতাসে ঝিরঝির। একটুকরো লন। তাজা ক্লোরোফিল রং নাইলনের দুকো-ঘাস রৌদ্রে ঝিলমিল। একাকী ফড়িং উড়ে উড়ে ভুল বুঝে চলে গেল।

কৌশিক ইন্সপেকশন করছে। এখন ‘এ’ জোনে আছে। ‘এ’ থেকে ‘বি’তে যাবে। ‘এ’ জোন হ’ল অফিসার এবং একজিকিউটিভদের। বাতাসে অ্যানিলিনের খরাপ গন্ধ। একটা ট্রিটমেন্ট করতে পারলে ভাল হ’ত, অন্তত এই অঞ্চলের জন্য। বেনজইল এসিটেট স্প্রে করলে কেমন হয়? এর জুইফুলের মত গন্ধ।

দখিনা বাতাসে অফিসার এলাকায় ছড়িয়ে যাবে গন্ধ। কোকিল ডাকল।

জুই কি বসন্তকালের ফুল? কৌশিকের কনফার্মেশন দরকার।

কিছুদিন আগেই অ্যাকাউন্টস্‌ অফিসার মিঃ ঝা ভবভূতি পুরস্কার পেলেন। তাঁকে সংবর্ধনা দেবার জন্য গার্ডেন পার্টি হ’ল নাইলনের লনে। সাইকোডেলিক ছাতার তলায় গোল গোল টেবিল আর চেয়ার। ছাতার উপর লতানো মাধবী। গুচ্ছ গুচ্ছ মাধবী। বসেদের হাতে হুইস্কি। বসেদের বউদের হাতে লাইম জিন। মিঃ ঝা একবার তার সোয়েটারটা টেনে নিলেন, মাফলারটা নিলেন, তারপর একবার ফুলেদের দিকে চেয়ে, একবার নারীদের দিকে চেয়ে এক্সটেম্পোর কবিতা বললেন –

লা জবাব মাধবী লতা নিকলি

বিন মৌসম বিন বর্ষাত।

দেওতা নেহি, কুদরত শয়তান কা।

অব না জানে ক্যা হোগা

আখৌ সে অংগারে

পেড়ো সে পানি

বাদলেসে ধুয়া।

মূর্দে শোয়ের্পে নর্ম বিস্তারা পর  
আদমী হাওয়া মে ঝুল রাহা হোগা  
শয়তানো কা তামাশা মে

আব ক্যা প্লাস্টিক কা লাড্ডু বাটরহা হোগা...

আসলে কিন্তু কৌশিকের সদিচ্ছার অভাব ছিল না। ঐ ফ্রেশ লটটা পাঠিয়েছিল শয়তান। শয়তান মানে হচ্ছে সাবস্টিটিউশন অ্যাণ্ড ইম্প্লিমেন্টেশন টেকনিক অফ অ্যাবস্কন্ডিং নেচার। সংক্ষেপে SAITAN-এটি একটি প্রকৃতি-প্রেমিকদের সংগঠন।

ওরা খুব ভাল পি.ভি.সির তৈরি ফুলভর্তি মাধবীলতা। পাঠিয়েছিল, কৌশিক পরম সদিচ্ছায় কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু ঐ গার্ডেন পার্টিতে মিঃ বা'র কবিতা শুনে জেনারেল ম্যানেজার কৌশিকের দিকে যেভাবে তাকালেন তা মন খারাপ হবার পক্ষে যথেষ্ট।

তা জুঁই ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত। উইণ্ড স্পিড ওয়ান এইটি থ্রি নটস। টু অক্টা সিরোকিউমুলাস আকাশে। নেমপ্লেটে সীতানাথ বা! ব্রেক চাপে কৌশিক। ভাবে, জিজ্ঞাসা করবে বসন্তকালে জুঁইফুল ফোটে কিনা। কোকিল ডাকল। কোকিল এরকম এতবার ডাকে কেন? জানালা দিয়ে কৌশিক দেখল সীতানাথ বা কবিতা লিখছেন। কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়। থেমে থেমে যায়। এ সময়ে মিঃ বা'কে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে না। খচে যাবে। সাইকেলে উঠে যায় কৌশিক।

সাইকেল কি করে যেন, কেন যেন সতের নম্বর রাস্তাটার দিকে যায়। ব্যালকনি থেকে অনুরাধার লতাপাতা আঁকা কাপড়টা হাওয়ার সঙ্গে খেলছে। কৌশিক বেল টিপল, আর ওমনি কুহু-কুহু-কুহু স্টপ। আগের দিন টিয়াপাখির ডাক ছিল। অনুরাধা দরজা খুলে দিল। আরে কী খবর, কৌশিকদা...। মুখময় হাসি। কিছুদিন আগে স্পোর্টস্-এ কৌশিক সব চেয়ে বেশি মডেল পেলে সব চেয়ে বেশি হাততালি দিয়েছিল অনুরাধা। সুব্রত সোফায় আধা শোয়া। একটা বই পড়ছে। মলাটটা দেখল কৌশিক। অ্যানাটমি অফ হিপোপটেমাস। সুব্রত হ'ল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার। হেভি জেনারেল নলেজ। কুইজ মাস্টার। দেয়াল আলমারিতে অনেক কাপ, শীল্ড, রোবট। কাঠের বেদীতে একটা খুব সুন্দর পি.ভি.সি.র হরিণ। তলায় লেখা ঘাই হরিণী। ওটার দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল-বাঃ। বই থেকে কিছুটা চোখ তুলে সুব্রত বলল-ফাস্ট প্রাইজ। ইন্টার একজিকিউটিভস্ কুইজ কমপিটিশন। কৌশিক বলল-আমাকে একটু হেল্প করতে পারবেন মি রায়? একটু সমস্যায় পড়েছি। জুঁই কি বসন্তে ফোটে?

জুঁই? মানে একটা ফ্লাওয়ার তো? জেস্মিন?

হুঁ।

পারপাসটা কী?

এনভায়রনমেন্টে একটা ফ্লোভার দিতে চাই। ভাবছি জেস্মিন দেব।

হুঁ। বলছি।

সুব্রত ওর পার্সোনাল কম্পিউটারটা বার করে। কয়েকটা ছোট নব টেপে। স্ক্রিনে ভেসে আসে জ্যাক...জ্যাকল...জ্যাসিন্থ...জেলি...জেলি...জিগ...

জেস্মিন সম্পর্কে কোনো ডেটা ফিড করা নেই বোধ হয়।

আবার কী একটা নব টিপল।

সব ফুলের। বল সাম... বেলি... চায়না রোজ... গার্ডেনিয়া... লিলি... লোটাস... সানফ্লাওয়ার...  
ওলিয়েণ্ডার... ন্নাঃ। সরি। কান্ট সে ডিটেইলস্ অ্যাবাউট জেস্মিন।

অনুরাধা বলল - জুঁই? দাঁড়ান বলে দিচ্ছি।

সুত্রত বলল - বিউটিশিয়ান্স্ হ্যাণ্ডবুকটায় দেখতো কিছু আছে কিনা, যেখানে সফটেনিং চ্যাপটারে  
ল্যানোনিন-জেস্মিন কন্সনেশনের ব্যাপারটা আছে।

কিন্তু অনুরাধা তুলে নিল গীতবিতান। বইয়ের সাদা কাগজের কোনা ছুয়ে যাচ্ছে নখ চকচক গোলাপী  
আভা। অনুরাধা পাতা ওল্টাতে লাগল আর বলতে লাগল বসন্তের গানগুলির মধ্যে পেয়ে যাব। বসন্তে যদি  
জুঁই ফোটে, ঠিক গানের মধ্যে এসে গেছে। এসো বসন্ত ধরাতলে এসো মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে। এনেছ ঐ  
শিরীষ বকুল আমার মুকুল। ও মঞ্জুরী, ও মঞ্জুরী আমার মঞ্জুরী। বুমকোলতার চিকন পাতা কাপেরে কার  
চমকে চাওয়ায়। পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন। ওরে পলাশ ওরে পলাশ। বকুল গন্ধে বন্যা এল। আজি  
বসন্তের দিন চলে যায়।

অনুরাধা বইটা বন্ধ করল। চোখ বুঁজল। চোখ ঢাকল আঁখি পল্লব। কোকিল ডাকল। অনুরাধা বলল - মরি  
হায়।

মরি হায় শব্দটার মধ্যে সুর মেশাল অনুরাধা। গেয়ে উঠল - মরি হায়... বসন্তের দিন চলে যায়।

চলে যায়...

দূর শাখে পিক ডাকে

বিরামবিহীন

মরি হায়...

এবং কোকিল ডাকল পরপর পাঁচবার।

পিক মানে কি কোকিল? ইয়েস্। তাই মনে হচ্ছে। আবার ডাকল পিক। ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না  
কৌশিক। কোকিলের ডাকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না? প্রোগামিং তো এরকম ছিলনা। সিঙ্ক্রটিন সিঙ্ক্রটিন টু-টু  
টুয়েন্টিফোর সিঙ্ক্রটিন সেকেন্ড। নেচার পত্রিকা পড়ে এবং দি কাক্কু ভি-ডি-ও ফিল্ম দেখে এরকম প্রোগ্রামিং  
করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যে যখন তখন কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে কি যে ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না।  
ডাকটাকে কন্ট্রোলে রাখা যাচ্ছে না কেন?

কেন আজি অকারণে

সারা বেলা আনমনে

পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন

মরি হায়...

অনুরাধা গান গাইছে। কৌশিকের অনেক কাজ। কৌশিক উঠল।

সুত্রত বলল, অনুরাধা, কৌশিকবাবু চলে যাচ্ছেন। একদম দেখলে না। কিছু দাও...

অনুরাধা গান থামাল। শ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে।

সুব্রত বলল, নতুন ইলিশটা দিতে পারতে, অনুরাধা দেয়ালের শোকেস থেকে বার করল একটা ক্যাসেট। প্লেয়িং ক্যাপটা নিয়ে এল। আঁচলে খেলছে ফ্যানের বাতাস। কৌশিকের মাথায় বসিয়ে দিল ঐ ক্যাপ। ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিল প্লেয়িং ক্যাপে।

সুব্রত বলল, এটা রিসেন্টলি বাংলাদেশ থেকে আনানো। এক আরবের শেখ বাংলাদেশে গিয়ে জীবনের প্রথম ইলিশ মাছ ভাপা খেল। এটা সেই রেকর্ড। ইউ উইল এনজয় ইট।

ক্যাসেটটা চালালেই ভীষণ ভাল লাগতে লাগল কৌশিকের। জীবনে প্রথম ইলিশ খেয়ে যে অনুভূতি হয়েছিল ঐ আরবের মানুষটির মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই অনুভূতি পেতে লাগল কৌশিক।

ইলিশের পর অনুরাধা দিল নায়েগা। কখনো নদী দেখেনি, জল, জলের উচ্ছাস দেখেনি, সাহারার এক প্রৌঢ়কে দিয়ে স্কের্ড করিয়ে নিয়েছিল স্কের্ড কোম্পানি। সেই মানুষটি প্রথম নায়েগা দেখার অনুভূতির ক্যাসেট প্লে করল কৌশিক। প্লেয়িং ক্যাপের দু'পাশে দুটো অ্যানোড এবং ক্যাথোড রড কৌশিকের মাথার দুপাশ স্পর্শ করে আছে। আর কোনো এক বোধ কাজ করে যাচ্ছে মাথার ভিতরে।

কৌশিক একা থাকে ওর কোয়ার্টারে। ওর কেউ নেই। যে মহিলাটির গর্ভ ভাড়া নিয়ে ওর জন্ম, তাকে কোনোদিন দেখেনি কৌশিক। প্রতিপালিকা মা তার বালক হয়ে যাবার পর সেই কোথায় যেন কার সঙ্গে চলে গেছে। কৌশিকের কাছে রীতেশ কুমার পাণ্ডিয়া ভাটের হনিমুন ক্যাসেট আছে। এক ঘণ্টার ক্যাসেট। দু'রকমই আছে। রীতেশের মাথায় চাপিয়ে একটা, আবার পাপিয়া ভাটের মাথায় চাপিয়ে রেকর্ড করা আর একটা। পাপিয়ার রেকর্ডিংটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে কৌশিকের। মিডল এজেড নিথো উইল এইটিন ইয়ার্স আছে। কয়েকটি হরার ক্যাসেটও আছে। আকাশে মিসাইল, সাইরেনের শব্দ, ধ্বসে পড়া বাড়ির সামনে রক্তাক্ত সন্তানকে সামনে বসিয়ে ক্যাসেট ব্যবসায়ীরা এক বৃদ্ধার মাথায় লাগিয়ে দিয়েছিল রেকর্ডিং ক্যাপ। সেটা হট সেলার। বার বছরের বালকের সামনে তার মাকে ধর্ষণ করে গেল কয়েকজন। হট সেলার। অনুরাধা এবার দিল মাংকি। চিড়িয়াখানায় বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়ানো সাত বছরের শিশুর অনুভূতি। কৌশিকের সময় নেই। কোকিল ডাকছে বড় বেশি।

কৌশিক ওঠে। সাইকেল চাপে। ব্যালকনিতে অনুরাধা। আঁচলে ওয়ান এইটি ডিগ্রী ফোর নটস হাওয়া খেলা করে।

মাস্টার কন্ট্রোলে যাবে কৌশিক। পথে 'সি' জোন। 'সি' জোনে লেবাররা থাকে। একটা ট্যাংক। কারখানার রিফিউজ এসে জমা হয় এখানে। বিষজলজমা পড়ে। পুকুর পাড়ে কয়েক গাছ মধুকুপী ঘাস। সফট পি.ভি.সি'র। ওয়াশ-এবল। পুকুরের বিষ জলে রাজহাঁস ঘোরে। ব্যাটারি চালিত।

পুকুরের পাড় দিয়ে রাস্তা। রাস্তা শেষ হ'লে কন্ট্রোলরুম। দেখল কোনো ভুল নেই। সিক্সটিন-সিক্সটিন টু-টু টুয়েন্টিফোর সিক্সটিন। এ ভাবেই কাঁটা নড়ছে। পুরো কলোনিতে চব্বিশটা গাছে স্পিকার বসানো আছে। এর মধ্যে চোদ্দটাই প্লাস্টিকের গাছ। এখন কোকিলের ডাক শুরু হয় সকাল সাতটা থেকে। চলে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। ভোর পাঁচটায় শুরু হয় কাকলি। নানা রকম পাখির আওয়াজ। তখন একজিকিউটিভরা জগিং করেন।



এরই মধ্যে আবার সুপার-ইমপোজ করা কয়েকটা কুছ ডাক আছে এই স্প্রিং সিজনের জন্য। কাকিলি ফেড আউট করিয়ে কোকিল দেয়া হয় এরপর। রাত্রে ঝিঁঝিঁ, কিন্তু বর্ষায় ব্যাঙ লো ভল্যুমে।

অপারেটর চঞ্চল সান্যালকে জিজ্ঞাসা করে কৌশিক-একটা ইনটামিট্যান্ট ইন্টারাপশন হচ্ছে, বুঝতে পারছ?

চঞ্চল কিছু বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝেই প্রোগ্রামিং আউট হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছ?

কাঁটার দিকে চোখ রেখে চঞ্চল বলে-বুঝতে পারছি না স্যার।

আসলে ঘরটা কাচের। প্রায় সাউণ্ড প্রুফ। বাইরের শব্দতো ভিতরে আসেনা, ত ছাড়া সারা 'সি' জোনে মাত্র চারটি স্পিকার। বি জোন আর এ জোন-এ বেশি বেশি আছে। চঞ্চল বুঝতে পারে না কিছু। এমন সময় প্রিপ্ প্রিপ্।

ফোন এল।

-কৌশিকদা আছেন?

-বলছি

-আমি অনুরাধা। জানেন, একটা সত্যিকারের কোকিল ঢুকে পড়েছে এই কলোনিতে, ডাকছে।

-হ্যাঁ। আমিও ওরকমই অ্যাপ্রিহেন্ড করেছিলাম। কোথায় আছে জানেন? রিদ্ম্ নষ্ট করে দিচ্ছে।

-কৌশিকদা, একটা রিকোয়েস্ট করব? স্পিকারগুলো অফ করে দেবেন? সত্যিকারের কোকিল ডাকছে।

-অফ করে দেব? এরপর যদি ঐ জ্যাস্ত কোকিলটা না ডাকে? জ্যাস্ত কোকিলের উপর কিন্তু আমাদের কোনো কন্ট্রোল থাকবে না।

-প্লিজ কৌশিকদা। একবার অফ করে দেখুন না কী হয়...

মেয়েটা কেমন বদখেয়ালি। কিছুদিন আগে যখন উইণ্ড থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি টু নট্‌স্ ছিল, টেম্পারেচার থারটিন, ফরটিন, তখন শিমূল না কি বলে ঐ গাছগুলো থেকে ঝিরি ঝিরি পাতা পড়ে ক্যাম্পাস নোংরা হত, তখন ঐ অনুরাধা একা একা ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকত, ঐ শুকনো সেলুলোজ ওর গায়ে পড়ত, ঘাড়ে, চুলে, শাড়িতে আটকে থাকত। ওটা একটা সত্যিকারের গাছ ছিল।

ঐ গাছগুলোতে পরে ফুল এসেছিল। টু আল্‌লি ঝরে গেল। আর দু'টা দিন থাকতে পারত। মন্ত্রী আসবেন। এদের উপর কোনো কন্ট্রোল নেই।

একটু পরেই আবার ফোন। মিঃ ঝা। প্লিজ কিপ দা কাক্কু মিঃ রায়।

কৌশিক বিপদে পড়ল। কী ডিসিসন্ নেবে বুঝতে পারে না। চঞ্চলকে বলল অফ দা অডিও, দেখি কি হয়। চঞ্চল অফ করল। এক মিনিট কেটে যায়, দু মিনিট কেটে যায়, অনেক অনেক মিনিট কেটে যায়...কোকিলের ডাক নেই। জ্যাস্ত কোকিলের এই ফ্যাসাদ। কোনো কন্ট্রোল নেই। এমন সময় আবার ফোন। চঞ্চল ফোনটা ধরেই-ইয়েস স্যার, বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। আছেন স্যার, বলেই ফোনের মাউথ পিস্ হাতে চেপে শঙ্কিত উচ্চারণে জানাল-জি.এম.।ব্যস্ত হয়ে ফোন ধরার আগে এক মুহূর্তের জন্য কৌশিকের মনে হয় ভাগ্যিস ও এখন এখানে ছিল।

-কৌশিক স্পিকিং স্যার।

-হোয়াট হ্যাপেন্ড?

জেনারেল ম্যানেজার কোকিলের ডাক শুনছেন না। কোয়ারি করছেন অডিও সিস্টেমে কোনো গণ্ডগোল হল কিনা। ওনার অ্যাংজাইটি হচ্ছে। মিনিস্টার কামিং।

কৌশিক বলেছিল, স্যার আমি অফ করে রেখেছি।

হোয়াই?

ফর এক্সপেরিমেন্ট স্যার।

ফর চেকিং? ও-কে। নো মোর এক্সপেরিমেন্ট নাও। অন দি কাক্কু। ও-কে?

ইয়েস স্যার। কৌশিক জি.এম.কে বোঝানোর কোনো স্কোপই পেলনা যে একটা জ্যান্ত কোকিল এসেছে এই কলোনিতে।

ঐ জ্যান্ত ডাকের মহিমা বুঝবার চেষ্টা করছিল এতক্ষণ। সুইচ অন হল। ডেকে উঠল কাক্কু। সিক্সটিন-সিক্সটিন-টু টু টুয়েন্টিফোর সিক্সটিন।

তক্ষুনি ডেকে উঠল টেলিফোন।

কৌশিকবাবু...।

অনুরাধার গলা। হাইপিচ। অনুরাধা কিন্তু কৌশিকদাই বলে।

ইয়েস।

কথাটা রাখলেন না।

কোন কথা?

কোকিল?

জি.এম.-এর অর্ডার যে...

ছিঃ।

ফোন রেখে দিল অনুরাধা। ছিঃ শব্দটা বড় বেশি মেটালিক। অনেক ডেসিবল বেশি সাউণ্ড। অনেকটা বাতাস। পেশী কুঞ্জন।

ছিঃ শব্দটা বড্ড কানে লাগল কৌশিকের। শুধু কানে নয়। শরীরের ভিতরেও কোথাও যেন বিঁধেছে।

কৌশিক ওর কোয়ার্টারে যাবে। সাইকেলে ওঠে। কোকিল ঠিকমত ডেকে চলে। শব্দটা যেন মাছি। কেবলই ঘিন ঘিন করে। কৌশিক ঘরে আসে। শুয়ে পড়ে খাটে।

কেন তবু সেই ছিঃ শব্দ ঘুরে ঘুরে চলে আসে ফের। মাথার চারিপাশে, চোখের চারিপাশে, বুকের চারিপাশে ঘুরে যায়। কৌশিক তাড়ায়। ওটা যায় না।

একজন ফেরিওলা, পরনে ছেড়া প্যান্ট, পিছনে কিটস ব্যাগ একা একা হেকে যাচ্ছে পোগরামিং করাবেন, কমপিউটার পোগরাম...

ছেলেটাকে ডাকবে ভাবল। পার্সোনাল কমপিউটারে কয়েকটা প্রোগ্রামিং করিয়ে রাখা দরকার। কৌশিক ডাকল না। ছেলেটা চলে যায়। অকসিজেন সিলিগারের নবটা একটু খুলে রাখে। আরও বেশি অকসিজেন

থাকুক ঘরে কিছুক্ষণ। কৌশিক শুয়ে চুপ চাপ শুয়ে শুয়ে কোকিলের ডাক শোনে। প্রকৃত কোকিলের ডাকটা চিনে ফেলল। কি করে ক্রমশ যেন বুঝে যায় প্রকৃত কোকিল-কুহুর পৃথক মহিমা।

উঠে দাঁড়ায় কৌশিক ফোনের নব টেপে।

-ইয়েস। জি.এম. স্পিকিং।

-স্যার, একটা সত্যিকারের কোকিলের কথা বলছিলাম না, ওটা কলোনিতে এসেছে। ওটাকে এখানে পার্মানেন্টলি রেখে দিলে কেমন হয়?

-কোকিল? ওটাতো বাসা বাধতে পারে না। তাইতো?

-ইয়েস স্যার।

-কাকের বাসায় ডিম পাড়ে।

-ইয়েস স্যার।

-কাকতো নোংরা ছাড়া বাঁচে না।

-ইয়েস স্যার।

-তা হলে তো নোংরা খুঁজতে হয়।

ফোন রেখে দিলেন জি.এম.।

সূর্য পশ্চিমে চিমনিটার তলায় চলে গেল। ছায়া এগিয়ে আসছে। প্রকৃত ও প্লাস্টিকের গাছের একই রকম ছায়া। এলায়ে পড়েছে ছায়াগুলি। কারখানা থেকে আসা ভোঁ শব্দের সঙ্গে মিশল কুহু কুহু। নতুন শিফট শুরু হবে। কৌশিকের কেমন যেন মন খারাপ লাগে। বাতাসে মন খারাপ। কৌশিক, একা থেকে নেমে আসে। সাইকেল প্যাডেলে চাপ দেয়। সাইকেল আনমনে ঘুরে ঘুরে কি করে যেন সতের নম্বর রাস্তাটাই ধরে নেয়। এই রাস্তায় অনুরাধাদের বাড়ি।

অনুরাধা ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে আছে। দূরে কোথাও তার চোখ। একশো আশি ডিগ্রির হাল্কা বাতাসে উড়ছে ওর গোলাপী শাড়ি। একেই দক্ষিণা বাতাস বলে বুঝি। কোকিলের ডাক শুনলো কৌশিক। ও বুঝতে পারল এটা প্রকৃত কোকিল। অনুরাধা কৌশিককে দেখে বাতাসে নাড়াল হাত। হাতছানিতে ডাকল। কৌশিক দ্রুত ঘোরাল সাইকেল প্যাডেল। অনুরাধা বলল, ঐ যে কোকিলটা।

কৌশিক ওদিকে তাকাল,যেদিকে অনুরাধার ওচানো আঙুল। কৌশিক কিছু দেখতে পেলনা। শুধু ঝাউগাছ, প্রকৃত কিংবা প্লাস্টিকের। কৌশিক বাড়িতে ঢোকে। সুরত বই পড়ছে জিওলজি অফ দি স্যাটার্ন। কৌশিককে বলল-কোকিলটা চিল্লাচ্ছে। জানেন তো কোকিল কেন চিল্লায়?

কৌশিক না জেনে সুরতর দিকে তাকিয়ে থাকে।

পেয়ার খুঁজছে। পেয়ার। ফিমেল পেয়ার। কোথায় পাবে?

কৌশিক ব্যালকনিতে যায়। কোকিল ডাকল। অনুরাধা কোনো কথা বলে না। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। কৌশিক খুব ভয়ে আর সংকোচে বলল, কোথায়? অনুরাধা দেখাল। কৌশিক দেখতে পেল একা প্লাস্টিকের ঝাউডালে কালো কোকিল ডাকল। একাকী কোকিল। অনুরাধা একাকী দাঁড়িয়ে আছে। হাতের পাতায় ওর

মুখ। অনুরাধা আস্তে আস্তে গান গাইছে। অস্ফুটে। কৌশিক ওর কাছে যায়। কৌশিক শোনে; আমায় চেন কি। আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি।

কারখানার শিফট পাণ্টেছে। মানুষজন ফিরে আসছে। ১৭ নম্বর রাস্তায় পদশব্দ। কারখানার শিফট পাণ্টেছে। রোবটজন ফিরছে। ১৭ নং রাস্তায় খটখট শব্দ। প্লাস্টিক গাছে একাকী কোকিল। একটা রোবট বমি করল। কালো বমি। ম্যাংগানিজ ডাই অক্সাইড। ওর ড্রাই সেলে বেশি করে মশলা ভরা হয়েছিল হয়তো।

ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন করে কে গো ডাকে  
করণ গুঞ্জরি।

কোকিল ডাকছে। প্রকৃত কোকিল। কারখানা ফেরত মানুষজন ওদিকে তাকায় না। রোবটজন এদিকে ওদিকে তাকায় না। পদশব্দ মিলিয়ে যায়।

যখন বিদায় বাশির সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে  
সঙ্গে কে রবি  
আমি রব উদাস হব ওগো উদাসী...

অনুরাধার চোখের কোনায় ওটা কী? জল? ইয়েস, জলইতো। ওর দুঃখ? দুঃখ কেন? গানটা থেমে গেলেও অনুরাধার নাকের দু পাশে দু ফোঁটা রয়ে গেল।

-কাঁদছেন মিসেস রায়? কীসের দুঃখ আপনার? এ্যাঁ?

অনুরাধা মৃদু হাসল। গাল থেকে ঝরে গেল ফোঁটা দুটো।

-ভীষণ আনন্দ হচ্ছে কৌশিকদা। ভীষণ।

আনন্দ? আনন্দ হলে কেউ কাঁদে নাকি? কেমন আনন্দ সেটা?

এই আনন্দটা কি পাওয়া যায় না?

কৌশিক ঘরের ভিতরে যায়। রেকর্ডিং ক্যাপটা নিয়ে আসে। অনুরাধার কাছে যায়। খুব ধীরে ধীরে বলে অনুরাধা, আপনার আনন্দটা আমাকেও দেবেন?

অনুরাধা কিছু বলে না। শুধু মাথাটা আস্তে করে কাত করে।

কৌশিক ক্যাপটা পরিয়ে দেয় মাথায়। ক্যাসেট ভরে দেয়।

অনুরাধা মৃদু কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলে, কৌশিকদা, এটার কোনে কপি করবেন না কিন্তু! এটা শুধুই আপনার।

আমার? আমারই শুধু? কৌশিক ঘরে যায় ফের। ফোন তুলে ধরে। চঞ্চল, চঞ্চল, বন্ধ করে দাও কলের কোকিল। অফ দা সুইচ।

শুধুই কৌশিকের জন্য ক্যাসেটটা ঘুরছে। অনুরাধা স্থির। গুন গুন করছে, আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি। প্রকৃত বাতাসে কাঁপে প্লাস্টিকের পাতা। অনুরাধার গলার গান মেশে বাতাসে। ক্যাসেট ঘুরছে, শুধুই কৌশিকের জন্য। কৌশিকের শরীরের ভিতর কেমন শিরশির। কচি পাতা উঠছে গা ফুঁড়ে। কচি কচি পাতা। বসন্তকাল। বুকের ভিতরে কী যেন, কে যেন ডাকছে।

## কাননে কুসুম কলি

জ্যা মে যখন মিনিবাসটা আটকে পড়েছে, জানালা দিয়ে দেবশিস দেখল ফুটপাতে অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচোচ্ছে। খুশি হল।

দেবশিস টেলিভিশনে চাকরি করে। শিশু শ্রমিকদের উপর একটা ডকুমেন্টারি করার কথা ভাবছিল বেশ কিছুদিন। এ ব্যাপারটাও লাগানো যেতে পারে। 'এর চেয়ে হাটলে আগে পৌছব' কণ্ঠাকটারকে এই কথা দিয়ে নেমে গেল দেবশিস।

ডানহাতে জাঁতি বাম হাতে সুপুরি, কী দ্রুত চলছে দু'হাত। কালো বুটিজামার মেয়েটা বলল আজ আমি আইস্কিরিম, তুই? হলদেটে হওয়া, আসলে সাদা টেপ জামার আরো ছোটো মেয়েটা বলল মাংস, বলেই ও ফুটপাতে বসা রোগা লোকটার পেলায় অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্চির দিকে তাকায়। সিগারেট কিনতে ও ফুটপাতে গেলে একটুর জন্য মরা কৃমি ও মাছিসমেত গু মাড়িয়ে ফেলত। কাছেই ঐ মাংসওলা। উবু হয়ে বসা দুটো লুঙ্গি পরা লোক যা খাচ্ছে, তা হল ছোটো করে কাটা নাড়িভুড়ি। গন্ধে বুঝল পাশেই কোথাও চুল্লি বিক্রি হয়।

কুঁচো সুপুরির স্তূপের সামনে বাচ্চারা কথা বলছে :

-তোর ক'কেজিরে চিনু?

-এই ধামা হলে পাঁচ হবে।

-ইসরে, আমার তিন চলছে। মাথাটায় উকুন খাজলাচ্ছে, চুলকোতে গেলে হাত বন্ধ। তোর উকুন না বেছে দিইচি সেদিন, চারটে চুলকানি পাওনা আছে, ওটা দিবি এখন?

-কাজের পরে সন্ধ্যাবেলায় দেব। তুই এখন ডিস্কো কাটনা, তাড়াতাড়ি হবে।

মেয়েটা বাম হাতের তালুতে দুটো করে সুপুরি এক সঙ্গে রাখে এবং জাঁতি দিয়ে এক সঙ্গে কাটতে কাটতে বলে ডিস্-কো-ডিস-কো।

দেবশিস মেয়েটাকে নাম জিজ্ঞাসা করে।

-হাসি।

-না-না, হেলেন। অন্য একটা ছেলে বলে। কথা বলার সময় নাচে, মালিক তাই হেলেন নাম দিয়েছে। দাঁত ফোকলা ছেলেটা হাসে।

-সারাদিনে কতটা কাটতে পারো?

-আমি চার কিলো।

-আমি পাঁচ কিলো।

-আমি একদিন ছ'কিলো করেছি।

-কিলোতে কত করে মজুরি?

-আধা ফালা চার আনা, চৌকো আট আনা, ছক্কা একটাকা, ঝিরি ঝিরি দুটাকা।

-সারা দিনে কত রোজগার করো?-

-তিন টাকা-

-সাড়ে তিন।

-পয়া দিনে চারটাকার উপর। দেবাশিস পয়া দিন ব্যাপারটা অনুমানে অনুধাবন করে। যেদিন মাথায় উকুন কম থাকবে, কিংবা যেদিন ঘন ঘন ঘাম মুছতে হবে না, কিংবা যে দিন পায়ে ঝিম ধরবে না। পয়া দিন।

-কখন এসেছ আজ?

-আমি সাইরেনের আগে।

-আমি বাবুদের রেশন তুলি।যখন এলাম তখন কলের জল চলে গেছে। -তোমাদের মা-বাবা কী করেন?

-আমার বাবা মরে গেছে।মা...

-ওর মা ভিকিরি। দাঁত ফোকলা বললে।

-তোমার মা-বাবা?

-আমার আসল মা চলে গেছে। বাবার নতুন বৌ আমায় প্যাদায়। আমি যা কামাই, খেয়েলি। রাস্তায় শুই।

দেবাশিসের তেমন কোনো প্রেমিকা নেই। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে একটা চায়ের দোকানে আড্ডা মারে।সেদিন ওখানে না গিয়ে মামাবাড়ি গেল। দুটো মামাতো বোন আছে। একজন বি.এ. বিটি করে বিয়ের জন্য বসে আছে, ছোটোটা এম.এ. পড়ছে রবীন্দ্রভারতীতে। টিভিতে চাকরি পাবার পর মামার বাড়িতে ওর গ্ল্যামার হয়েছে। এখন মামারবাড়ির সবাই ওকে ঘিরে বসে। দেবাশিস সংবাদ পাঠক অমুকের চরিত্রদোষ, বিখ্যাত প্রযোজক অমুকের পদোন্নতির গোপন রহস্য বা অমুকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ ইত্যাদি রকম টিভি স্টারদের গোপন কথার গল্প বলে।

আজ মামাবাড়ি যেতেই-আরে এসো এসো দেবাশিসদা,বলেই উচ্ছসিত ছোটোবোন হাত ধরে ভিতরে নিয়ে তার দুই বান্ধবীর কাছে গিয়ে বলল-এই যে দেবাশিসদা, যার কথা বলি।

-টিভি তে?

মেয়ে দুটোর চোখে টুনি বাস্তবের অস্তিত্ব টের পায় দেবাশিস।এই মওকায় বলে ফেলে-মামাতো বোনের দিকে চেয়ে-একটা যা প্রোথাম প্ল্যান নিয়েছি না সুজাতা-টেরিফিক্। ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে লাইটার হাতে নিল।

চাইগু লেবারদের নিয়ে।-সিগারেট ঠোঁটে নাচল।

দেবাশিস অফিসে এই প্রোথামটার ব্যাপারে প্রোপোসাল পাঠাল। প্ল্যানিংটা এইরকম।

চায়ের দোকানের বয়।

ট্রেনের শিশু হকার।

ট্রেনের মোটবওয়া কিশোর।

সুপুরিকাটা বাচ্চাগুলো।

হাওড়ার লেদকারখানাগুলোর শিশুশ্রমিক।

শিশুশ্রম সম্পর্কে আইনের ব্যাখ্যা এবং ল-ইয়ারের সঙ্গে ইন্টারভিউ।

শিশুশ্রম সম্পর্কে একজন সমাজতাত্ত্বিকের সঙ্গে ইন্টারভিউ।

স্টেশন ডিরেক্টার ডেকে পাঠালেন।

-কোন ল-ইয়ারকে ইন্টারভিউ করতে চাও?

-ঠিক করিনি, স্যার।

-ঠিক আছে। আমি একজনকে ফোন করে দিচ্ছি।

-সোসিওলজিস্ট?

-ডাঃ বিনয় বসু।

-ওতো লেবেলড লোক। পাল্টাও।

-কাকে নেব স্যার?

সেটা তুমি দেখ। এমন কাউকে নিও না যে রুট টুট খুঁজবে। তাহলে টেলিকাস্ট করা যাবে না। আর একটা কথা, প্রোগ্রামে ওটা রাখোনি? হাউ গভর্নেন্ট ট্রাইস টু প্রিভেন্ট দিস্ প্রাক্টিস্ অফ্ ইউজিং চাইল্ড লেবারস্? লেবার কমিশনারের সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ রাখো। রিভাইস্ ইওর প্ল্যান।ওকে?

গাড়িতে বসেই ক্যামেরা প্যান করানো হ'ল।

রাস্তা, লোকজন, যানবাহন, দোকানের সারি। মিডশট।

একটা দোকান।

ক্লোজ মিডশট। দোকান মালিকের বাস্ট। সামনে সুপুরির স্তুপ।

জুম ইন্। সুপুরির স্তুপ।

(একজন মালিক বলল-ক্যা হোতা হয় সার?—

সুটিং হোতা হয়, সুটিং, সিনেমাকা।

কেয়া নাম সার সিনেমাকা?

-নসীব কলকাত্তা কি)

ক্লোজশট। সুপুরির স্তুপ।

ক্যামেরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন সাইজের সুপুরি কুঁচির স্যাম্পল রাখা মাটির সরাগুলির উপর দিয়ে প্যান করে।

পরের শট-এ রাস্তায় বসা বাচ্চাগুলো সুপুরি কুচোচ্ছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ক্লোজশট নিল দেবাশিস। দেবাশিস পকেট থেকে একমুঠো টফি বের করে দেখাল, বলল, ছবি তোলা হয়ে গেলে সন্ধ্যাইকে দেবে। তারপর বলল যে যে পারো, ডিস্কো সুপুরি কাটো। সিনেমার ছবি উঠবে।

একটা ১৪/১৫ বছরের ছেলে বলল বুঝেছি, কাটিং সিনেমা উঠবে, আসল সিনেমার আগে হয়। দেবাশিস হাতের উপর এম্ফাসিস্ দেবার জন্য ক্যামেরা তাক করে।

ক্লোজশট। বাচ্চাদের হাত, হাতের খেলা, সুপুরি ঝরে পড়ছে।

একসঙ্গে দুটো করে সুপুরি, জাঁতিতে চাপ, শিরা ফুলে যাচ্ছে, হাতের শিরাগুলো টানটান, সুপুরি খসে খসে পড়ছে।

আবার দুটো সুপুরি জাতিতে, আড়ালে। অন্য হাত কাঁপছে, চাপ, ছিটকে গেল জাতি, ছড়িয়ে গেল সুপুরি, নখসমেত একটু অংশ কুচোনো সুপুরির পাশে পড়ে আছে। সুপুরির কুচি শুষে নিচ্ছে রক্ত। ক্যামেরা টালমাটাল।

মেয়েটার জামা রক্তময় হয়ে উঠেছে, কী ঘটনা বুঝতে মেয়েটার কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। এবার মেয়েটা তুমুল আত্ননাদ করে ওঠে। ছিন্ন ডানার মতো ঝাপট মারে হাত, আর রক্ত ছিটোয়। কী সর্বনাশ হল সমবেত স্বরে এই আত্ননাদ, দেবাশিস পেছতে থাকে। ক্যায়া হো গিয়া রে?—মালিকরা নেমে আসে।

দেবাশিস ছুটে গিয়ে গাড়িতে স্টার্ট, এখুনি। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়, তীব্র বাজে ইলেকট্রিক হর্ন।

প্ল্যানিংটা একটু চেঞ্জ করল দেবাশিস। সুপুরির ব্যাপারটা রাখল শেষের দিকে। জাঁতিতে আঙুল কেটে টুকরো হয়ে পড়ে যাওয়াটা অঙ্কুর এসেছে। নাম রাখল ‘এইসব শিশুগুলি’। টেলিকাস্ট হল। পরদিন অফিসে টুকতেই একজন সহকর্মী হাত বাড়িয়ে দিল।

—এ রিয়াল ডকুমেন্ট, মাইরি, এক্সিলেন্ট। দেবাশিস তার সবগুলি আঙুল সমেত হাত করমর্দনের ঝাঁকুনি পেল, তখন থ্যাংকিউ উচ্চারণ বড়ো দুর্বল ও কাঁপা শোনা।

সমাজসেবিকা গায়ত্রী দেবী শিশুমেলায় তরফ থেকে স্টেশন ডিরেক্টরকে ফোন করলেন দুঃসাহসিক প্রোডাকশনের জন্য। ওয়ার্ল্ড লুথেরান ফোন করল।

দেবাশিসের কলিগ্রা অনেকেই বলল, রিলটা একবার দেবেনতো, পরে দেখে নেব। স্টেশন ডিরেক্টর ডেকে নিয়ে বললেন—এ গুড প্রডাকশন! আই উইল সেন্ড ইট ফর ন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ড।

চায়ের দোকানে বন্ধুদের আড্ডায় যেতেই ওরা ‘এইষে এসেছে শালা, মার’, বলে হাসল। শালা গোবিন্দ নিহাল্ণি। কেমিস্ট্রি কিন্তু ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বন্ধু বলল—মেয়েটার আঙুলখানা নিয়ে নিলি?

দেবাশিস বলল—না মাইরি, ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। হয়ে গেল। বড্ড গিল্টি লাগে নিজেকে।

—ক্যামেরাই কি মেয়েটার অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করেছিল?

দেবাশিস বাসের টিকিট পাকাচ্ছিল।

একজন লেকচারার বন্ধু বলল, বাচ্চাগুলোর কাজটার মধ্যে তো রিস্ক ইন্ভলভড রয়েছে। হয়তো এমনিতেই হতে পারত, অ্যাকসিডেন্টালি ক্যামেরাটা সেখানে গিয়ে পড়েছিল। এর আগেও হয়তো এরকম ঘটে গেছে, তখন তো ক্যামেরা যায়নি।

এই ব্যাখ্যাটা দেবাশিসের সবচেয়ে ভালো লাগল। সিগারেট ধরাল।

ইঞ্জিনিয়ার অথচ ছোটো গল্পকার বন্ধু বলল, আই এগ্রি সেদিন না হলেও অন্যদিন হতে পারত। আসলে রেক্লেস প্রফিট ওরিয়েন্টেশনের আউটকাম এসব। একজন অ্যাডাল্টের ওয়ান ফোর্থ পেমেন্ট দিয়ে হাফ কাজ



পাওয়া যাচ্ছে মানে হানড্রেড পার্সেন্ট মোর প্রফিট ইন রেসপেক্ট অফ লেবার পেমেন্ট।

বয় চা নিয়ে এল। গল্পকার ওকে দুটো টাকা দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে পাঠাল। কুইক।

ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বলল-এ-ও কিন্তু শিশুশ্রমিক দাদা। বয় সিগারেট এনে টেবিলে রাখল। ওর হাতের চামড়া কিছুটা কুঁচকে আছে।

-কী হয়েছে রে এখানে?

-চায়ের জলে।

-কবে?

-পুজোর সময়ে।

-পুজোর সময়?-অথচ...

ওরা এ-ওর চোখের দিকে তাকাল এবং আলোচনার মোড় ঘোরাল। বল দেবাশিস, তোর বোনের বান্ধবীর খবর কী?

দেবাশিস আজকাল বাসে উঠবার আগে জিজ্ঞেস করে নেয়-ভায়া এস.এন. ব্যানাজী?-কন্ডাকটর যাবে না বললেই ও নিশ্চিন্তে ওঠে। সুপুরির দোকানগুলোর সামনে দিয়ে বাসে যেতেও ভয় পায় ও।

খবরের কাগজে টিভির ঐ 'এইসব শিশুগুলি'র রেফারেন্স দিয়ে শিশু শ্রমিক আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটা চিঠি বেরিয়েছে। ফিচারও বের হল। এইভাবে শুরু:

কলকাতা কর্পোরেশন-দেয় ট্রেড লাইসেন্স কি ট্রেড সিক্রেট আছে যাতে কর্পোরেশন ভবনের নাকের ডগায় সারবন্দি শিশুরা বিপজ্জনকভাবে সুপুরি কুঁচোচ্ছে?

কিছুদিন পর দিল্লি থেকে খবর এল জাজেরা বলেছেন দেবাশিসের 'এইসব শিশুরা' বেস্ট ডকুমেন্টারি যার নগদ টাকা অ্যাওয়ার্ড। যে প্রডিউসারটি সর্বদা দেবাশিসের নিন্দা করে সে ডান কাঁধে মৃদু থাপ্পড় দিল। এ এস ডি, গতবার যিনি খুব খারাপ সি আর দিয়েছিলেন, বাম কাঁধে মৃদু থাপ্পড় দিল।

যে সুন্দরী মহিলা লাইব্রেরিয়ানটির সাথে বই ফেরত দেয়া নিয়ে বিত্রী ঝগড়ার পর তিক্ত সম্পর্ক বহু চেষ্টাতেও দেবাশিস ভালো করতে পারেনি, সেই মহিলা সিঁড়িতে লাল আঁচলের বাতাস দিয়ে পারফিউম গন্ধের সাথে জানাল দারুণ খবর। এমনকি দেবাশিসের মোটা বেল্টের স্টিলের বগলসে একবার টোকা মারল। বলল লাইব্রেরিতে আসবেন, কফি খাওয়াব।

দেবাশিস হাফ সি.এল. নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। ফ্যান ছেড়ে ঘুমল। মা, বোন, কাউকে জানাল না অ্যাওয়ার্ডের কথাটা। সন্ধ্যায় ছাতে উঠল, যখন বাতাস মাথার চুল ফালি ফালি করে ওড়াচ্ছিল, তখন দুহাতে মাথার চুল চেপে ধরল, ঝাঁকাতে লাগল। সূর্য ডোবার পর আকাশের শেষ লাল রং ঐ মেয়েটার আঙুলের চোঁয়ানো রক্তের মতো। ছাতের রেলিং-এর ধারে চলে আসে। গা গোলাচ্ছে। অফিসে গেলেও যেন খাটালের পাশের পাঁচিল। সবাই ঘুঁটে মারছে-কনথ্যাচুলেশন, অ্যাওয়ার্ড, পুরস্কার। পরের দিন টেলিফোনে অসুস্থতার কথা জানাল অফিসে। সহকর্মীটি জিজ্ঞাসা করল-কী অসুখ-অ্যাওয়ার্ডের গ্যাস?

চায়ের দোকানের আড্ডায় বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করল অ্যাওয়ার্ডের পুরো টাকাটাই যার আঙুল কাটা গেছে, সেই মেয়েটাকে দিয়ে দেবে।

তিনমাস পরে অ্যাওয়ার্ডের টাকাটা এলে দেবাশিস ওর চার বন্ধুর দল নিয়ে এস.এন. ব্যানাজী রোডে এল। ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বলল- ক্রিমিনোলজির সেই ট্রাডিশন-দ্যাখ-অপরাধী যাচ্ছে অকুস্থলে। -যাবেই। দেবাশিস বলল-ও দূর থেকে চিনিয়ে দেবে মেয়েটাকে, তারপর বাকি বন্ধুরা যা হয় করবে। মেয়েটার বাড়ি গিয়ে ওর অভিভাবকের হাতে তুলে দেবে টাকাটা। দেবাশিস পিচ্চারে থাকবে না।

এই যে সুপুরির দোকানগুলো। কিন্তু কই? ফুটপাথের ধারের সারবন্দি বাচ্চারাতো নেই। কী ব্যাপার? আজ তাহলে ওরা আসেনি?

দেবাশিস পিচ্চারে নেই তাই ওর এক বন্ধু এক দোকান মালিককে জিজ্ঞাসা করল-যেসব বাচ্চালোগ সুপারি চিপ্‌স্‌ করতা থা, কাহা গিয়া?

-কৈ নেহি হয়্য সার। আপনা মর্জিসে সব বিলকুল মিশিন বৈঠা দিয়া সার।

আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝল ওরা। গভর্নমেন্ট থেকে চাপ দিয়ে ওদের সুপুরি কুঁচো করার মেশিন কিনিয়েছে সম্প্রতি। ওদের সরকারি অফিসার ভেবেছে। তাই লসিয় মাঙিয়েছে। বাচ্চাকাচ্চাগুলোর খবর ওরা জানে না। যার কেটে গিয়েছিল সেই মেয়েটার খবরও ওরা রাখে না।

ইঞ্জিনিয়ার অথচ ছোটো গল্পকার বন্ধুটির প্রশ্নের উত্তর মালিকরা জানাল বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে হাটিয়ে এখন অনেক ঝামেলা কমে গেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, মেশিনে লেবার খরচ কম। 'যো ছয়া সার আচ্ছাই ছয়া, সার আচ্ছাই ছয়া।'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ কিন্তু দেবাশিস কাউকে পুরো ব্যাপারটা বলতে

গেলে আর একটু না বলে পারবে না।

কিছুদিন পরে 'শিল্পগঠনে ব্যাংক' এই নামে একটা ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে ব্যাংকের সাহায্যে গড়ে ওঠা বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা গ্রাইণ্ডিং মেশিনের কারখানা প্রি-কভারেজে গিয়ে দ্যাখে কারখানার মালিক ওর সহপাঠী ঘোতন। পরীক্ষায় ভালো টুকতে পারত আর গুলির টিপ্ ছিল খুব। যাক ঘোতন 'এইসব শিশুগুলি'-র ব্যাপারে কিছু বলল না, বাঁচা গেল।

ঘোতন খুব খুশি হল, মনের কথা বলল দেবাশিসকে। বলল, তুই আছিস ভালো মাইরি, টিভিতে কত মেয়ে-ফেয়ে...।

ঘোতন কারখানার কথা বলল মন্ত্রীর চামচে থেকে ব্যাংক অফিসার পর্যন্ত কাকে কী ধাক্কা করতে হয়েছে, কাকে কত দিতে হয়েছে। এসব কাহিনিতো আর টিভিতে বল যাবে না।

ঘোতন একদিন বিয়ার খাওয়াতে চাইল।

কতজনকেই তো খাওয়াতে হয়। ..বিয়ে করিসনি! বাঃ। চাস্তো নিয়ে যেতে পারি। বাঁধা আছে।...

ঘোতনের খুশি মুখ থেকে সুঘ্রাণ সিগারেট ঘুরে ঘুরে ওড়ে। ভালো প্রফিট থাকছে। ডোমেস্টিক গ্রাইণ্ডারের সাথে আর একটু ভারী ধরনের বিটলনাট চিপিং মেশিন তৈরি করছি। একটা মেশিনেই বিভিন্ন সাইজের সুপুরি কাটা যায়। গভর্নমেন্টের লেবার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের থুরুতে সুপুরি মার্চেন্টরা কিনছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল ফাইভ পার্সেন্ট দি। সাউথ ইন্ডিয়া থেকেও দুচরটে অর্ডার পেয়েছি। চ'না, কারখানা দেখবি যোলোজন কাজ করে।

দেবশিস কারখানায় গিয়ে দেখল পাঁচ-ছজন বাচ্চা ছেলে, কেউ ঘষছে লোহার পাত, কেউ দুহাতে চক্চকে ইস্পাতের ফলা টানটান করে ধরে রেখেছে ঘুরন্ত লোহার চাকতির উপর। শান দিচ্ছে। তারাবাজির মতো ঠিকরোচ্ছে আগুন।

আমি আজ আইস্কিরিম্।

তুই-

আমি ঘুগনি।

লোহার শব্দে, মেশিনের শব্দে ঐ বাচ্চাগুলোর কথাবার্তা শোনা যায় না।

দুটো বাচ্চা মেয়ে সরু তামার তার জড়াচ্ছে আরমেচারে তাঁদের সরু-সরু আঙুলে। আঙুলগুলো ঠিকই তো আছে আপাতত।

## একটি সতর্কতামূলক রূপকথা

এক যে আছে লোক। ওর একটা ফ্যাট আছে। টিভি-ভিসিআর-ভিসিনি মেশিন আছে, কর্ডলেস ফোন আছে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে, একটা স্কুটার আছে, গাড়ি নেই বলে দুঃখ আছে, আর আছে একটা বউ। বউ বড় দুঃখী। সবার কত গাড়ি আছে, ওর একটাও নেই। সবাই কেমন ফরেন যায়, ও একবারও যায়নি। সবার ছেলে টাই বুলিয়ে ঘাড় দুলিয়ে টা-টা করে স্কুলে যায়, ওর কোনো বাচ্চা নেই।

লোকটার বউ রান্নাঘরে রবিবারের রান্না করছে আর লোকটা সোফায় বসে রবিবারের টিভি দেখছে—দুঃশাসন দ্রৌপদীর শাড়ির আঁচল ধরল। বেগুনি রঙের সিনথেটিক শাড়ি। বলল—হাম তুমকো নাঙা করেঙ্গে। শাড়ির আঁচল ধরে টানতে লাগল। চুমকি বসানো শাড়িতে ঝিকিমিকি-ঝিকিমিকি। রুবি মালহোত্রা, মানে দ্রৌপদী ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে। দুঃশাসন হাঃ হাঃ হাঃ অউহাস্য হেসে যাচ্ছে। রুবি বলল—হে কৃষ্ণ তুমকো মে সর্বস্ব সমর্পণ কিয়া, মুঝে বাঁচাও। তখনই স্ক্রিনের কোনায় মদন মিশ্র, মানে শ্রীকৃষ্ণ। মদন ওর পেটেন্ট হাসিটা দিল, আর তখনই বেগুনি শাড়ি শেষ হয়ে গোলাপি এল। গোলাপি শেষ হল, হলুদ এল। ঝিকিমিকি-ঝিকিমিকি। রুবি ঘুরে যাচ্ছে। দুঃশাসন-দুর্যোধনের হা হা হাসি থেমে যায়। ভেসে আসে মমতাজ—মমতাজ-মমতাজ। মমতাজ শাড়ি অফুরন্ত... দ্রৌপদী ঘুরে যাচ্ছে। দ্রৌপদীর গায়ে গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে মমতাজ প্রিন্টেড, চেক, বুটি... জড়িয়ে যাচ্ছে, ভয়েল, জর্জেট...। পরদায় বারবার ঝলক — মমতাজ শাড়ি অফুরন্ত...

লোকটা দেখে। ঠিক দেখে না, চেয়ে থাকে। সোফায় আধশোয়া হয়ে চেয়ে থাকে। হাতে সিগারেট। টানছে না। তবু আঙুলে রয়েছে। টিভি কেসের মাঝের তাকে ভিসিপি-ভিসিআর। কতদিন চালানো হয় না, আছে। ব্যালকনিতে একটা দোলনা ঝুলছে। একা একা ঝুলছে। বুককেসে কত বই, কতদিন খোলা হয় না। টিভি দেখে লোকটা। দেখে না, চেয়ে থাকে।

এমন সময় সেই মিউজিক। যেই না মিউজিকটা শুরু হল, বউটা মাইক্রোওয়েভ উনুনটা অফ করল, চিংড়ি মাছ ফ্রিজে তারপর সোফায় এসে বসল। বউটার মুখে হাসি নেই। বউটা লোকটার দিকে তাকায় না, লোকটা বউটা দুজনেই টিভি-র কাঁচের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দারুণ মিউজিক। ভিতর পর্যন্ত ঝনঝন-শিরশির। পর্দায় H.O.P.E অক্ষরগুলি নাচে। অক্ষরগুলি দুভাগ হয়ে যায়। তার মধ্যে জুড়ে যায় নতুন অক্ষর। শেষঅব্দি তৈরি হয় হোমোসেপিয়েন্স্। মিৎসুবিসি প্রেজেন্টস্ ইনকুবেটার ফর হোমোসেপিয়েন্স্। হোপ। হোপ। হোপ। হোপ।

কর্তা চায় গিনির দিকে। গিনির চোখ টিভিতে। গিনির দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তাই দেখে কর্তারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই হোপ যন্ত্রটি ওদের নেই। হোপ মানে ইনকুবেটার। মানুষের ডিমে তা দেবার যন্ত্র। যান্ত্রিক তা। এটা কিনলে, কিনতে পারলে তবে ওদের বাচ্চা হবে।

লোকটা বলল, বুঝলে বিপাশা, এবার এটা কিনতেই হবে। বউটা বলল, আর কিনেছ। বউটার চোখ টিভির দিকে। ওরা বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়। এক এক দিন এক এক রকম।

টিভির পর্দায় বন্দনা ঘোষ। প্রখ্যাত মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা।। ছেলেরা দিব্যি কোনো কষ্টটস্ট না করে বাবা হয়ে যেত, আর মেয়েরা ক্যারি করে মরত। এবার মেয়েদের মুক্তি। পেট ফুলিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে না। আজ অম্বল কাল পেট ফাঁপায় ভুগতে হবে না। শেষের দিনগুলোতে মেয়েরা সেক্স এনজয় করতে পারত না। এবারে পারবে। মেকানিকাল ইনকুবেশন ওয়েলকামড।

রুবি মালহোত্রা।। চিত্রাভিনেত্রী। আমার বেবি তো ইনকুবেটারে বেড়েছে। কোনো অসুবিধেই হয় নি। লিটারেচার ফলো করে বটনিং করে গ্যুটিং-এ চলে যেতাম। একটা চিন্তা ছিল শেলটা ফাটবে তো, কিন্তু শিডিউল টাইমের সাত মিনিট আগেই শুনি বিপ্‌বিপ্‌। শেল থেকে বেবি বেরিয়ে গেল। শী ইজ নাও পারফেক্টলি ওকে। দেড় বছরের হল। দিব্যি মা বলছে।

এবার এল একজন সুন্দরী মহিলা। সারা মুখে মা-মা ভাব। পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দুর। মুচকি হাসল। বলল, এ পর্যন্ত আমাদের দেশের একলক্ষ একাশি হাজার মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছি আমরা। ওই দীর্ঘ কষ্টের দিনগুলির কথা ওরা জানে না। তারপর টেলিভিশনের পর্দায় পরপর আসে কতকগুলি হাসিরাশি সুন্দরী।

অদৃশ্য কণ্ঠ : আপনি কী ভাবছেন?

বউটা বলল, কী ভাবছ?

লোকটা বলল, এক লক্ষ একাশি হাজারের মধ্যে আমরা নেই। আমরাও হব। হতে হবে।

তারপর লোকটা চোখ বোজে।

স্তিরিওতে কী একটা গান হচ্ছে। ওয়াশিং মেশিনে কী একটা শব্দ হচ্ছে। লোকটা ভাবছে ওই এক লক্ষ একাশি হাজারের মধ্যে ওর জানা চেনা কে কে আছে।

জেনারেল ম্যানেজার? -নো, নো।

ওয়ার্কস ম্যানেজার? -নো।

সেলস ম্যানেজার? -নো।

জার্মানি ফেরত আসতুতো ভাই বিল্টু একটা কিনবে কিনবে করছিল। কিনেছে কি? ফোন করল লোকটা।

-না ভাই কিনতে পারিনি এখনো। বউ তো আর দেরি করতে চাইচে না। এখনো না হলে বাচ্চা বড় হবে কবে। ভাবছি এমনিই হোক, বায়োলজিকালি। তোরা নিচ্ছিস নাকি?

-ভাবছি। তা তোরা নিলি না কেন?

-আরে, আমার একার চাকরি। তোর তো ডবল ইঞ্জিন। নিয়ে নে, নিয়ে নে।

-তোর জানাশুনো কেউ কিনেছে?

-নস্তুই তো কিনল। আমার মেজ শালাটা। কন্ট্রাক্টর।

ওয়াশিং মেশিনের বাদামি প্লাস্টফর্মের উপর বাঁ-হাতের কনুইটা রেখে গালে হাত দিয়ে মেশিনটার দিকে স্থির তাকিয়ে আছে বিপাশা। পলক পড়ে না। দেখলে মনে হবে বুঝি আদর করছে দৃষ্টিতে। ওর ডান হাতের পাতা মেশিনটার গায়ে লাগল। নড়ল। দেখলে মনে হবে মমতায় হাত বুলোল। আসলে ধুলো ঝাড়ল।

মেশিনকটাকে ভালো লাগে না বিপাশার। সবকটা পাজি। একদণ্ড তিষ্ঠোতে দেয় না। এটার বরফ পরিষ্কার করো, ওটার বলবেয়ারিং চেঞ্জ, ওটার গায়ে তেল দাও, এটার হেড পরিষ্কার করা... লেগেই আছে। আর খালি খাইখাই। এবার আবার হাত বুলাল মেশিনটার গায়ে। এটা আদরের। তারপর মেশিনটার আনন্দ ঘড়ঘড় শব্দ শুনল কিছুক্ষণ, চোখ বুজে। এবার অন্য একটা বোতাম টিপবার কথা-জিনিসগুলো শুকোবার জন্য। ঠিক তখনই থেমে নখচকচক আঙুল। ভাবল আজ শাড়িগুলোকে বাইরে মেললে কেমন হয়, বাইরের রোদদুরে? তাহলে একটু অন্যরকম হয়। রোদদুরের একটা আলাদা গন্ধ আছে। বিপাশা তখন লোকটার গলায় কথা শুনল।

-তোমার জানাশোনা কার কার আছে?

-কতবার তো বলেছি। মধুরিমারই তো আছে-

-তোমার কলিগ?

-হু। বড্ড ভুলে যাও তুমি। নাকি ভান করা?

-ওর বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখে আসা যায় না?

-না। ওর বাড়ি যাওয়া যায় না। বড্ড আদেখলা ভাববে।

-ঠিক আছে। ওটা ছেড়ে দাও। আর কে নিয়েছে?

-টুম্পার বউদিরা। ওখানেও যেতে চাই না।

-তা হলে বিন্টুর শালার বাড়িতেই যাওয়া যাক। বুঝলে...

তারপর বিন্টুকে নিয়ে ওরা বিন্টুর শালা নম্বর বাড়ি গেল। নম্বরবাবুকে সবাই চেনে। বাড়ির জানালাগুলোয় এ-সি বাক্স এঁটে আছে বলে নয়, সে তো অনেকেরই আছে, নম্বরবাবু দিলদরিয়া, নম্বরবাবুর অনেক শখ। কালীপুজোয় অনেক বাজি, অনেক মদ, পয়লা বোশেখে অনেক মিষ্টি, পনেরোই আগস্টে অনেক কাঙালিভোজন... সবাই চেনে। এখন আরো চেনে কারণ ও বাড়ির বউদির ডিম ফুটছে যন্ত্রে।

টেবিলে বসানো একটি কাচের বাক্স। বাক্সের গায়ে কাঠের ফ্রেমে লাইন করা অনেকগুলো বোতাম। বোতামের গায়ে 1, 2, 3, 4... লেখা। কাচের গায়ে চন্দন এবং সিঁদুরের ছিটে। বাক্সটার পাশে আর একটা ছোট যন্ত্র তাতে আলো দপদপ করছে। একপাশে কয়েকটা সিলিঙার, তাতে পাইপ লাগানো, পাইপ গিয়েছে বাক্সে। বাক্সটার অন্যপাশে একটা ফ্রেমে বাঁধানো মা কালী। স্ট্যাণ্ডে ফিট করা; ছবির তলায় রক্তজবা। বাক্সের মধ্যে একটা স্টেনলেস স্টিলের প্লেটে কাশীর পেয়ারা সাইজের বাদামি রঙের ডিম।

বিপাশা জিজ্ঞাসা করল-কমাস চলছে?

নম্বরবাবুর বউ মুচকি হাসি হেসে বলল, পাঁচ মাস।

কোনো কিছু অসুবিধে বুঝছেন?

না ভাই, এখনো তো ভালোই।

নম্বরবাবুও তখন বাড়ি ছিল। ফট করে যন্ত্রটার একটা সুইচ টিপে দিল। ওমনি যন্ত্রটার গায়ের একটা সাদা পর্দায় সবুজ রেখার ঢেউ খেলে যেতে থাকল। নম্বরবাবু বলল, এটা মনিটর। জিনিসটা কেমন আছে, বোঝা যায় এখানে। নম্বরবাবুর গলায় কথা লাফাচ্ছে, পর্দায় রেখা লাফাচ্ছে। প্রাণ।

লোকটা মাথা চুলকোল, আঙুল মটকাল। বলল, মেশিনটা বাড়ি নিয়ে এলেন কেন? শুনেছি কোম্পানিরই ব্যবস্থা আছে, ওদের ওখানেই ডিম ফোটানো যায়।

নম্বুবাবু বলল, যায়, কিন্তু আমার শখ বাড়িতেই হোক। সবাই বেশ দেখবে...

নম্বুবাবুর স্ত্রীর নাম মুন। কমবয়সী ছটফটে। ওর সঙ্গে বিপাশার বেশ ভাব হয়ে গেল!...

মুন।। না দিদিভাই, কিস্সু ঝামেলা নেই। খুব ইজি প্রসেস্। এখানে বাক্সের গায়ে লাইন করা দুশো আশিটা বোতাম আছে। রোজ একটা করে টিপে দাও, ব্যাস।

বিপাশা।। যদি ভুলে যাও?

মুন।। ভুল হবে কেন?

সকালে দাঁত মাজার সময়ই বোতামটা পুশ করে দিই।

বিপাশা।। তোমার তো এটা সেকেন্ড ইস্যু। আগেরটা কি গো? ছেলে না মেয়ে?

মুন।। মেয়ে। ও কিন্তু পেটে হয়েছে। তখন তো এসব আসে নি। ওর এখন চার বছর চলছে। কেবল জিজ্ঞাসা করত মা আমি কি করে হলাম, কি করে হলাম... এবারে নিজে দেখছে। হি-হি।

বিপাশা।। এবারে কী হচ্ছে জান? ছেলে না মেয়ে?

মুন।। ছেলে। টেস্ট করিয়েছিলাম গত সপ্তাহে।

বিপাশা।। কীভাবে?

মুন।। কোম্পানির লোক তো আসেই প্রতি সপ্তাহে। সব চেকটেক করে যায়। একশো কুড়ি দিন হলেই ওরা বলে দেয় ছেলে না মেয়ে।

বিপাশা।। তুমি তো ছেলেই চাইছিলে?

মুন।। চাইব না? আগেরটা তো মেয়ে।

বিপাশা।। যদি এটাও মেয়ে হত?

মুন।। তহলে হয়তো কোম্পানিতে যেতে হত। এটা নষ্ট করে আবার নতুন করতে হত। সেকেন্ড টাইম অবশ্য কনসেশন দেয়।

বিপাশা।। কী করে ওরা?

মুন।। কিছু না। মেয়েদের পেট থেকে ফুটিয়ে কি একটা বার করে নেয়।

বিপাশা।। ওভা।

মুন।। লাগে না। তারপর ছেলেদের ওই জিনিসটা লাগে। পাশেই একটা ঘর আছে এজন্য। তারপর ওরা কী সব করে পরদিন বলে দেয় হল কিনা। না হলে আবার মেয়েদের ইয়ে অনুযায়ী ডেট দেয়।

ওদের এইরকম কথাবার্তা চলছে, আর লোকটা বিল্টুবাবু নম্বুবাবুর সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্স রিবেট, শেয়ারবাজার, ডলার-এক্সচেঞ্জ রেট, এসব নিয়ে কথাবার্তা বলছে। এ সময় একটা বুড়ি এল ওই ঘরে। মুখে হাসি। বলল, কী রে, নাতি আমার ঠিক আছে তো? এই বলে মেঝেতে কিছুক্ষণ বসে থাকল। বাক্সটাকে দেখতে থাকল। ‘একমাস আগে আরো কত ছোট ছিল ডিমটা, ফত বড় হয়ে গেছে রে।’ এই বলে উঠে

গিয়ে ডিম বাস্কাটার কাঁচের দেয়ালে হাত বুলোতে লাগল। বুড়ির পানরাঙা ঠোঁটে হাসি। মুন বলল, সরে আসুন মা। এরকম করবেন না, কোন বোতামে কখন হাতটাত লেগে যাবে, কেলেক্কারি হবে।

লোকটা স্কুটার চালাচ্ছে, লোকটার বউ পিছনে বসে আছে। বউটা কখনো গাড়িটার স্টেপনি, কখনো লোকটার কোমর ধরে টাল সামলাচ্ছে। কেমর ধরা অবস্থায় বউটা বলল, তাহলে কী ভাবছ? লোকটা ওই ভটভট শব্দের মধ্যে বলল, ওটা নিলে আর এটা হচ্ছে না। বউটা কোমর ছেড়ে স্টেপনি ধরল। লোকটা বলল, ঠিক কর। গাড়ি না ইনকুবেটার। বউটা স্টেপনি ছেড়ে কামর ধরে আদুরে গলায় বলল, বেবি। লোকটা বলল, খরচাটা শুনেছ? বউটা বলল, ঠিক হয়ে যাবে, দেখো...

রাত্রিবেলা ফ্যান ঘুরছে। লোকটা বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে, ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে চোখ। বউটা বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে, ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে চোখ। জানালার গ্লিল ফুঁড়ে হলুদ হ্যালোজেন দেয়ালের উপর গ্লিলছায়ার আলপনা ঐঁকেছে। একটা চাঁদও এমনি এমনি রয়ে গেছে আকাশে। নিমগাছের নিমফুলের গন্ধ আসছে মিছিমিছি। বউটা ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে। লোকটা ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে।

লোকটা।। আর একটা কিছু করতে হবে।

বউটা।। তুমি তো অনেক কিছু করছই। আমিই আরো কিছু করব।

লোকটা।। শেয়ারের দামটা আর বাড়ল না।

বউটা।। নোটবই লিখতে বলেছি... সাজেশন লিখতে বলেছি... কোশ্চেন আউট করে দিতে বলেছিল...

লোকটা।। পারচেজ-এ যদি ট্রান্সফার পাই একবার...

ওরা চোখ খুলে থাকে। চোখ বুজে ভাবে...

ওরা একদিন ভেবেছিল একটা ফ্ল্যাট হোক। তখন বউটা একটা চাকরি খুঁজে পেল। ফ্ল্যাট হল। তারপর ভেবেছিল কালার টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর হোক। লোকটা চাকরির সঙ্গে পার্টটাইম, বউটা টিউশনি করতে থাকল। ওরা ভাবল চাকরি-টিউশনি-কনসাল্টেন্সিতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। তাই সময়ের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতির জন্য অনেক সময় ব্যয়ে গেল। ওরা ভাবল এবার আহা, একটা বাচ্চা আসুক। তখন আরো বেশি রোজগারের জন্য লোকটা দুবছর আবুধাবি কাটিয়ে এল। এখন লোকটা কুঁজো-কুঁজো। চুলটা সাদা-সাদা। বউটা মুখের বলিরেখায় অনেক দামের মলম ঘষে। ইতিমধ্যে আবার কি মুশকিল, নতুন যন্ত্র বেরিয়ে গেছে। যান্ত্রিকতা।

একদিন এক বসন্তকাল। স্কাইস্ক্র্যাপারে কোকিল ডাকছে। স্কাই স্ক্র্যাপারের দরজায় পিভিসির পলাশ। লিফট-এ চড়ে এগারোতলায় ওঠে লোকটা। লোকটা জানতে এসেছে। ইন ডিটেইলস। ফুল আঁকা লতা আঁকা সুইংডোর-এ হোপ লেখা। খুলতেই বনসাই করা বটগাছের ফাকে বসা সুন্দরী। লোকটা কিছু বলতেই সুন্দরী সুন্দর হেসে বলে, ওয়েলকাম।

অন্য একটা ফুল আঁকা সুইংডোর খুললে অন্য একটা ঘর। টেবিলে টেবিলে কাঁচের বাস্কা। বাস্কের গায়ে আহা, আলো পড়েছে রঙিন রঙিন। বাস্কের গায়ে নম্বর। বাস্কের পাশে অঙ্কুত যন্ত্র। যন্ত্রের গায়ে আলো জ্বলছে, আলো নিভছে। যন্ত্রের পাশে অঙ্কুত সিলিগুর। সিলিগুর থেকে নল গিয়েছে যন্ত্রে, যন্ত্র থেকে বাস্কে।



-যে শেলটা দেখছেন, ওনলি নাইনটিন ডেজ। লোকটা দেখল ছোট্ট সরষের দানার মতো একটা প্রাণ সিংহাসনে বসে আছে।

-এই যে এটা দেখছেন, এতে একজন ভেরি ফেমাস পলিটিসিয়ানের স্পার্ম রয়েছে।

-বাপ বুঝি পলিটিসিয়ান?

-নো-নো, নট দ্যাট। পার্টি চেয়েছিল। আমাদের স্পার্ম ব্যাকও আছে তো...।

-দেখুন, এটায় একজন ফেমাস ক্রিকেট প্লেয়ারের। ওটায় মিউজিশিয়ান। সবরকমই আছে আমাদের স্টকে। চার্জবল।

লোকটা বলল- না। আমিই বাপ থাকতে চাই।

-ওয়েলকাম ইটস আপটু ইউ।

লোকটার কীরকম যেন নার্ভাস-নার্ভাস লাগতে লাগল। বলল, যারা আসছে, ধরুন আমার বাচ্চা, কোনো রিস্ক নেই তো? ঠিক ভাবে বড় হবে তো?

-আরো বেটার হবে। আমরা কনডিশনড করে দিচ্ছি। এরা এইট পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যাটমোসফেরারিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড কনজিউম করার ক্ষমতা রাখবে। ইয়ারলি সেভেন হানড্রেড মিলিরেম রেডিও অ্যাকটিভিটিতেও কিসসু হবে না। বাতাসে নাইন পার্সেন্ট ক্লোরিন বা সালফার ডাই-অক্সাইড থাকলেও একটুও কাশবে না। ব্লাডে বক্সিশ পার্সেন্ট ইসেনোফিল থাকলেও শ্বাসকষ্ট হবে না। আট মিলিগ্রাম বিলিরুবিনও স্কিনে র্যাশ বার করতে পারবে না। অনেক ফেসেলিটি। লোকটা লিটারেচারটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পেমেন্ট, ইনস্টলমেন্ট, এসব ডিটেলস আছে তো?

এভরিথিং।

তারপর জেরা ক্রসিং দিয়ে অনেক অ্যামবাসেডর মারুতি পদ্মিনী বয়ে যায়। অনেক টিভি সিরিয়াল শেষ হয়। তারপর একদিন এক শুভদিনে লোকটা আর বউটা ট্যাক্সি করে ওই এগারোতলার বাড়ির ভিতরে লতাপাতার ভিতরে হোপ লেখা সুইংডোর খুলে ভিতরে ঢুকল। ঢাকা-পয়সা জমা দিল। রসিদ নিল। পেটের ফোটানোর ব্যথাই লাগল না। লোকটা বাঁহাতে টেস্ট টিউবটা নিয়ে ছোট ঘরটায় গেল। ডান হাতে নিয়ে এল।

ফেরার সময় চাইনিজ খেল। ওদের আজ খুব আনন্দ। আনন্দ আর রঙ্গরস। বাড়ি ফিরে স্প্রিং-এর পুতুল দম দিয়ে নাচাল। স্টিরিওতে গান বাজাল, ভিডিওতে পর্ন চালাল।

বউটা।। শোন, যদি এরকম হত, তোমার দরকারই হত না, তা হলে আমার জিনিসটা আমি বড় করতাম। আর একটা আমি হতাম বেশ।

লোকটা।। আর আমিও তা হলে আমার জিনিসটা বড় করতাম, আর একটা আমি হত বেশ, আর সেই আমি আবার তোমার আমিকেই বিয়ে করত।

তারপর হি-হি হাসি, স্প্রিং-এর পুতুল, আলিঙ্গন...বরটা খেল জিন সেং, বউটা নিল কন্ট্রাসেপটিভ।

লোকটা এগারাতলায় ফোন করল পরদিন। মিষ্টি গলায় ওপাশ থেকে 'সরি'। বলছে স্পার্মকাউন্ট পুওর। ভেরি পুওর। "লো লেভেলেও আমরা করে দিই। কিন্তু সাম্পলটা ভেরি লো।" হয়নি। কাউন্ট বাড়তে হবে। আদারওয়াইজ আমাদের স্টক থেকে নিয়ে নিন। ইঞ্জিনিয়ার, মিউজিশিয়ান, পলিটেশিয়ান...

-ন্না, আমি বাবা হতে চাই...

ডাক্তারবাবু, ওটা বাড়বে?

বাড়তে পারে, এটা খেয়ে যান...

কবিরাজমশাই, হবে?

শিলাজিত, স্বর্ণভস্ম আর অশ্বগন্ধার ওষুধ দিয়েছি, সেবন করুন...

হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ আছে?

আছে। টাইম লাগবে।

লোকটা অতঃপর পাবলিক ইউরিনালের হতাশ হইয়াছেন? গ্রান্টিপ্রদত্ত চিকিৎসার খোঁজে সোনারপুর, নৈহাটি, আমতা ঘুরে এসে পঞ্চমবার এগারোতলা বাড়ির ওই ছোট ঘরটায় গেল। স্পার্ম কাউন্ট করা হবে। চারিপাশ সাদা। ধবধবে। দেয়ালে গ্লেজটালি চকচক করছে। ওই আলোমাখা সাদা বাক্সে ও একা। কাঁচের তলায় কলকাতা শহর। জেরা ক্রিশিং, পুতুল মানুষ। এগারোতলার উপরে ওই পুতুল মানুষটার, ওই বেচারী মানুষটার এক হাতে একটা টেস্ট টিউব। অসহায় অন্যহাত ধরে আছে কাতর পুরুষাঙ্গ। পাশের ঘরে ইকেবানা আর বনসাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, রঙিন আলোর যত্নে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হেফাজতে মানুষের ডিম। আগামী প্রজন্ম।

## লাপ্লা

লাপ্লার দাম আবার বাড়ছে সরকার কিছুটা ভরতুকি দিত, সেই ভরতুকি উঠিয়ে নেবে, ফলে লাপ্লার দাম আবার বাড়বে।

একটা মিছিল বের হল এই দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে। মিছিলে সমবেতভাবে গাওয়া হল : লারে লাপ্লা লারে লাপ্লা লাপ্লা লাপ্লা লারে, লাপ্লা লারে...। কিন্তু সেই মিছিলের তেজ একটু পরই ফুরিয়ে গেল, কারণ মিছিলের লোকজনের যথেষ্ট পরিমাণে লাপ্লা নেওয়া ছিল না। যে কয়েকজন নেতা মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করেছিলেন, তারা লাপ্লা সেন্টার থেকে জনগণের চাঁদায় যথেষ্ট পরিমাণে লাপ্লা নিয়েছিলেন। তাই জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতায় নেতারা বলেছিলেন, দেশের মানুষকে লাপ্লা বঞ্চিত করা চলবে না। দেশের যদি উন্নতি করতে হয় সরকারকে সস্তায় লাপ্লা সরবরাহ করতেই হবে। যাদের টাকা আছে, তারা তাদের শরীর ফুল চার্জ করে নিচ্ছে, যারা গরিব, তারা ফুল চার্জ দূরের কথা, হাফ চার্জ করতে পারছে না। এই সব মূঢ় ল্পান মুখে দিতে হবে লাপ্লা। সমুখেতে কষ্টের সংসার। বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বন্ধ অন্ধকার। অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, মুক্তবায়ু। তারও আগে লাপ্লা চাই, আনন্দ উজ্জল পরমায়ু। লাপ্লাই যদি না পাব, তবে যে শুয়ে থাকতে হবে ঘরে। মৃতের মতো। বল লাপ্লাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়? আমরা যদি লাপ্লা না পাই, ঘরের ভেতরে শুয়ে না থেকে সবাই রাস্তায় শুয়ে থাকব। ট্রেন লাইনে শুয়ে থাকব। সবকিছু অচল করে দেব...

সুবোধ শুনছিল এই বক্তৃতা। সুবোধ এমনিতেই একটু ভীৰু প্রকৃতির, লাপ্লা কম পেয়ে আরও থম মেরে গেছে। শহরে চাকরি। চাকরিটা হয়েছে বছর দশেক। মফস্বল থেকেই যাতায়াত করছিল। যাকে বলে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা। সুবোধ বিয়ে করেছে বছর পাঁচেক আগে, ওদের একটি পুত্রসন্তান আছে। সন্তানের বয়স তিন। সন্তানের লেখাপড়া শহরে ভালো হবে। আর লাপ্লা চার্জ করার জন্য দূরে যেতে হবে না, ঘরের ভেতরে কানেকশন নেওয়া সম্ভব না হলেও আশপাশেই নিশ্চয় লাপ্লা বুথ থাকবে। আর এসব ভেবেই শহরে এসে বাড়ি ভাড়া নেওয়া। শহরে ওরা যে বাড়িতে আছে, একটু পুরোনো ধরনের। মালিকদের গাঙগোলের কারণে প্রোমোটিং হয়নি। একটা উঠোন, উঠোনের চারদিকে দালান। দালানগুলো তিনতলা। মোট বারোটি পরিবার। যাকে বলে বারো ঘর এক উঠোন। উঠোনে একটা কল বসানো। কল মানে জলের কল নয়, লাপ্লা কল। ওই এ টি এম মেশিনের মতো দেখতে একটা বাস্তবের মধ্যে একটা পাইপ। পাইপের সঙ্গে জড়ানো টুপি। মাথায় টুপিটা পরে পাসওয়ার্ড টাইপ করতে হয়। তারপর ও কে টিপতে হয়। লাপ্লা আসতে থাকে টুপিতে। লেখা ফুটে ওঠে ‘চার্জিং’ আর মিটারে দেখানো হয় কত খরচ হচ্ছে। একদম পেট্রল পাম্পের মতো। আগে একটাই লাপ্লা কোম্পানি ছিল। এখন বিভিন্ন কোম্পানি হয়েছে। কোনো কোনো কোম্পানির লাপ্লা বেশ স্ট্রং। ফুল চার্জ হয়ে যায়। কোনো কোম্পানির লাপ্লা একটু ডাইলিউট। কোনো কোম্পানি চব্বিশ ঘণ্টাই সাপ্লাই করে, কোনো কোম্পানি দিনে কয়েকবার।

সুবোধরা যে কোম্পানির গ্রাহক, সেই কোম্পানি দিনে চারবার করে লাগ্না সাপ্লাই করে। অনেকটা কর্পোরেশনের জলের মতো। জল আসার আগে কল থেকে যেমন গব্ব গব্ব শব্দ বের হয়, অনেকটা সেরকম একটা শব্দ বের হয় – হব্ব হব্ব....এই মেশিন থেকে।

যাদের ২৪ ঘণ্টা সাপ্লাই আছে, তারা তো যখন খুশি টুপি পরে নিয়ে চার্জড হয়ে যেতে পারে, তাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু যে সব গ্রাহক সস্তার কোম্পানির লাগ্না কেনে, তাদের আবার টাইমকলের মতো টাইমে টাইমে হাজির হতে হয়। এজন্য লাগ্না লাং পাওয়া যায়। ওটা একধরনের চৌবাচ্চা। একটু খরচ করে চৌবাচ্চা কিনে নিতে হয় যখন টাইমকলে লাগ্না আসে, ওই চৌবাচ্চায় জমা পড়ে, আর গ্রাহকদের যার যখন সময় হয়, ওই চৌবাচ্চা থেকে লাগ্না ভরে নিতে পারে। চৌবাচ্চা মানে একটা বাস্ক।

সুবোধদের বাড়িতে যারা থাকে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই উলটো পালটা ডিউটি। কেউ টিভি চ্যানেলে কাজ করে, কেউ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, কেউ তান্ত্রিক জ্যোতিষী, কেউ যৌন পরিশেষাবিদ। যদিও সুবোধ দশটা-পাঁচটা (প্রকৃত অর্থে নটা-আটটা) চাকরি করে, কিন্তু বেশিরভাগ ভাড়াটের সিদ্ধান্তে লাগ্না লাং-এর জন্য ভালোরকম চাঁদা দিতে হয়েছে। সুবোধ পারতপক্ষে চৌবাচ্চা ব্যবহার করে না। সকাল সাতটায় দাঁত মাজতে মাজতেই ও হব্ব হব্ব শব্দ শোনে, এবং মুখ ধুয়েই তাজা লাগ্না নিয়ে নেয়, এরপরই দোলনকে পাঠিয়ে দেয়। দোলন সুবোধের বউ। দোলন সঙ্গে করে দ্রোণকে নিয়ে যায়। দ্রোণ ওদের সন্তান। চার্জ করিয়ে নেয়। দোলন এখনও চাকরি পায়নি। তবে কিছু আয়ও করে। একটা বিদেশি কোম্পানির সাবান কসমেটিক্স, টুথপেস্ট-এসব গছায়। কমিশন পায়। ওদের পরিবারের সবাই একটাই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে। একটাই বিল আসে সুবোধের নামে বিলে ব্যবহৃত ইউনিট এবং তার খরচ লেখা থাকে। এ নিয়ে সংসারে একটু খিটিমিটি হয়। ঝগড়ার ধরনটা এরকম:

দো। তো বিলটা আমায় দেখাচ্ছ কেন?

সু। বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

দো। সে কি আমার জন্য হচ্ছে? আমি কি বেশি নিচ্ছি? তুমিই তো দু-বার করে নিচ্ছ।

সু। আমাকে অনেক খাটতে হয়। অনেক মাথার পরিশ্রম।

দো। আমি বুঝি বসে বসে খাই? মাল গছাবার হ্যাপা জানো? এ জন্য কত লাগ্না দরকার হয় জানো? তাও তো আমি দু-বার নিই না। অতই যদি সন্দেহ, তবে ইনডিভিজুয়াল বিলের জন্য অ্যাপ্লাই করো। আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড হোক...

সু। আলাদা হওয়ার কথা উঠছে কেন আবার...

দো। তুমিই তো ওঠাচ্ছ। প্রতি মাসেই ওঠাও, কিন্তু জানি তো, আলাদা পাসওয়ার্ড করিয়ে দেবে না, ওতে তো খরচ বেশি। তোমার ক্ষমতা তো জানি। একে একটা বাজে কোম্পানির লাগ্না নিচ্ছি, তাও কমন। তার ওপর বড় বড় বাত।

সু। আহা-হাহা, রেগে যাচ্ছ কেন এমন, আমি শুধু বলছিলাম একটু বুঝে চলতে, আর কিছু না। দ্রোণকে এত চার্জ করাচ্ছ কেন? ও তো বাচ্চা। ওর কি এত লাগে?

দো। ওকে এ বছর স্কুলে ভর্তি করাতে হবে তো, নাকি? স্কুলের অ্যাডমিশন টেস্টগুলো কি তুমি দিয়ে আসবে?

সু। বেশি লাপ্পা দিলেই আই কিউ বাড়ে না। বরং ক্ষতি হয়। পরশুদিন একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল পড়োনি? লাপ্পা একটা ধাপ্পা।

দো। ধাপ্পা তো তুমি নিচ্ছ কেন? তুমি তো দিব্যি দু-বেলাই টুপি পরছো। আর কেবল নজর আমি বেশি নিচ্ছি কি না। ঠিক আছে, আমি নেবই না। চুপচাপ শুয়ে থাকব। তুমি চারবার করে নাও। একেই বলে পুরুষতন্ত্র। পুরুষরা যত খুশি নেবে, কেবল আমরা নিলেই দোষ...

সু। উঃ প্লিজ, আমি এভাবে বলিনি...

দো। প্রতি মাসে বিল এলেই ডাইরেস্টলি হোক, ইনডাইরেস্টলি হোক আমাকে খোঁটা দাও...

সু। খোঁটা কেন দেব খামোকা। বলছিলাম গত মাসে দুশো ইউনিট ছিল, এ মাসে তিনশো কুড়ি। এবার আমাদের চেক করতে হবে, এ নিয়ে একটু আলোচনা করার জন্য...

দো। ছাড়ো ছাড়ো...। একটা চাকরি পাচ্ছি না বলে। একটা চাকরি পেলে তোমার পরোয়া করব না। আমি আলাদা পাসওয়ার্ড ইউজ করব। আমার আলাদা বিল আসবে। দরকার হলে পোর্টেবল কিট কিনব...।

হ্যাঁ, এখন পোর্টেবলও পাওয়া যাচ্ছে। দাম বেশ বেশি পড়ে। ব্যস্ত সিরিয়াল শিল্পীরা, যাঁরা পরপর ফ্লোরে ফ্লোরাতে শুটিং করেই চলেছেন, তারা গাড়িতে পোর্টেবল কিট রাখেন, শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে একটু করে লাপ্পা নিয়ে নেন। যাঁদের ট্যুরের চাকরি, তারাও পোর্টেবল নিচ্ছেন। আর ভোটের সময় তো পোর্টেবলের বিক্রি খুবই বেড়ে যায়। তখন ব্ল্যাকও হয়।

সুবোধরা যখন মফস্বলে ছিল, তখন পঞ্চায়েতের পরিচালনায় কমিউনিটি লাপ্পা সেন্টারে যেত। একটু ভিড় হত, একটু লাইন দিতে হত। অনেক গ্রামে এখনও পর্যন্ত লাপ্পা লাইন পৌঁছোয়নি। ওখানকার মানুষরা এখনও লাপ্পাহীন। ওদের চাকরি পেতে অসুবিধা হচ্ছে। ওদিককার এম এল এরা লাপ্পাহীনদের জন্যও সংরক্ষণ দাবি করছে। শহরের মানুষের নানা সুবিধে। তার মধ্যে অন্যতম হল সহজলভ্য লাপ্পা।

শহরের অভিজাত আবাসনে প্রত্যেক ফ্ল্যাটে আলাদা আলাদা লাপ্পা কানেকশন আছে। এটা খালি দেখলেই হয় না, খরচা আছে। যারা সস্তায় চায়, তারা ভাগ করে নেয়। সুবোধরাও এরকমই ভাগাভাগির মধ্যে আছে। ভাগাভাগি শব্দটা যখন এলই, তাহলে বলতেই হয় লাপ্পা সমাজটাকে শ্রেণিবিভক্ত করে দিয়েছে। যারা লাপ্পা ব্যবহার করে না বা করতে পারে না, তারা হল নারে লাপ্পা শ্রেণি। বা বি এল এল মানে বিলো লাপ্পা লেভেল। আর যারা পারে, তারা হাঁরে লাপ্পা। হাঁরে লাপ্পাদের আবার কয়েকটা ভাগ। আটকা, ঠেকনা, টাইমকা, ছুটকো-এরকম। মানে কারা ঘরে চব্বিশ ঘণ্টার কানেকশন নিয়েছে, কারা নির্দিষ্ট সময়ের, কারা রোজ নেয় না, যখন পারে পাবলিক বুথ থেকে নিয়ে নেয়-এরকম। সোশ্যাল স্ট্যাটাসও নির্ভর করে এর ওপর। যদি ডট কম বা ওই জাতীয় বিশেষ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাত্রপাত্রী খুঁজতে হলে যে ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, ততে দুটো কলাম থাকে, যেখানে লাপ্পা সম্পর্কেও তথ্য দিতে হয়।

তো, লাপ্পার দাম বেড়ে গেছে। সুবোধ সত্যিই কম কম নিচ্ছে কিন্তু আরও নেওয়ার একটা তৃষ্ণা থেকে যাচ্ছে। লাপ্পা একটা নেশার মতো। না নিলে কেমন যেন কষ্ট হয়। ছোটবেলায় তো লাপ্পা ছিল না, তখন তো

অসুবিধে হত না। কিন্তু এখন সারা শরীর যেন নুন কম নুন কম লাগছে।

আন্দোলনও চলছে। একদিন বন্ধুও ডাকা হল। অবশ্য বন্ধুর আওতা থেকে সমস্তরকম লাগ্না সার্ভিস বাদ দেওয়া হয়েছিল। বন্ধু কোনো লাভ হল না। সরকার আর ভরতুকি দিতে রাজি নয়। কোম্পানিগুলোও দাম কমাতে রাজি নয়। কোম্পানিগুলোর বন্ধু আন্তর্জাতিক বাজারে লাগ্নার দাম অনেক বেশি। এখন যা কিছু হিসেব হয়, সব ডলারে। এই লাগ্না ফিলিপিনস বা ইন্দোনেশিয়া বা থাইল্যান্ডে বিক্রি করলে অনেক বেশি টাকা পাওয়া যায়। ভারত সরকার আগে বলেছিল কনজিউমারদের থেকে কিছু কম নিতে বাকিটা সরকার পুষিয়ে দেবে। এখন সরকার যদি ভরতুকি না দেয়, ওইসব বিদেশি কোম্পানিগুলি ব্যবসা গুটিয়ে অন্য দেশে চলে যাবে। এখন যে সব লাগ্না কোম্পানি আছে প্রায় সবাই বিদেশি। একটিমাত্র আধা দেশি কোম্পানি আছে, তার নাম স্বস্তিকা এল.পি.জি. এল পি জি মানে লাগ্না প্রোডাকশন গ্রুপ। ইউনিট প্রতি এদের রেট একটু কম। সুবোধরা এদেরই মেসার।

সরকার অনড়। দু-একজন নেতা বললেন ভারতবর্ষে লাগ্নার দরকার নেই। যে দেশে যোগব্যায়াম আছে সে দেশে লাগ্নার কী দরকার। মানুষ ঠিক জানে যে-সব নেতা এসব বলছে, তারা নিয়মিত লাগ্না নেয়। ভারতবর্ষে যদি বন্ধ হয়ে যায়, ওরা বিদেশ থেকে নিয়ে আসবে।

চারিদিকে আন্দোলন চলতে থাকল। বাস-টাস পুড়তে লাগল। দুটি মাত্র দল, যারা কেন্দ্র সরকার চালাচ্ছে, তারা ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দল লাগ্না বাঁচাও আন্দোলনে शामिल। রিলে অনশন চলছে। অনশন মঞ্চে লাগ্না লারে লারে গান চলছে, কিন্তু অতিবিপ্লবী স্বস্তিকা লাগ্না কোম্পানির সদর দপ্তরে ইট দাগল। কাচ ভাঙল। ভেতরে ঢুকে কয়েকজন কর্মকর্তার মাথা ফাটিয়ে দিল। স্বস্তিকা কোম্পানি পরদিন সাপ্লাই বন্ধ করে দিল। স্বস্তিকা কোম্পানি খবর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিল ওরা ব্যবসা বন্ধ করে দেবে, এবং যাদের যা সিকিউরিটি মানি জমা আছে, অমুক তারিখের মধ্যে তুলে নাও।

একটা সামাজিক আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। এ তো চাল নয় যে বস্তা বস্তা তুলে রাখা যাবে। চ্যানেলে চ্যানেলে তর্ক, আপনার মতামত। এটা কি বহুজাতিক চাল? সত্যি সত্যিই কি লাগ্না ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে? এ নিয়ে এস এম এস, ওপিনিয়ন পোল।

বেচারী সুবোধ। বিদ্যাসাগরের গোপাল। গোপাল বড় সুবোধ বালক। সেই টাইপের। সকাল থেকে স্বস্তিকা কোম্পানির সাপ্লাই নেই।

চৌবাচ্চায় মানে, লাগ্না লাং-এ হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সবাই নিতে চায়। দোলন বলল দাঁড়িয়ে হাবার মতো দেখছ কী! কিছু একটা কর! সুবোধ কী করবে বুঝতে পারে না। দোলন নিজেই এগিয়ে আসে। বলে হচ্ছেটা কী? কোনো ডিসিপ্লিন শেখেননি? লাইনে দাঁড়ান, সবাই লাইনে দাঁড়ান!

বারোটা পরিবারের সদস্য হুড়োহুড়ি করছে। তবু যাহোক করে একটা লাইন তৈরি হল। দোলন বাইশ নম্বর, দ্রোণ তেইশ এবং সুবোধ চব্বিশ নম্বর। চৌবাচ্চার থেকে সবাই ফুল চার্জ করে লাগ্না নিচ্ছে। দোতলার কেতকী সমাদ্দার একটি গর্ভজাত মেয়ে এবং কাজের মেয়ে নিয়ে থাকেন। তিনি যৌন পরিষেবা সেক্টরে আছেন। নিজেদের পরিবারের সবার নেওয়া হয়ে গেলে একটা ছোট ইঁদুরকলের মতো প্লাগ লাগ্না লাং-এর আউট পয়েন্টে গুঁজে দিলেন। এ কী হচ্ছে বলে অনেকে চিৎকার শুরু করে দিল। কিন্তু চিৎকার ও প্রতিরোধ

প্রবল হওয়ার আগেই ওই ভদ্রমহিলার কাজ শেষ। উনি চলে গেলেন। তারপরই চ্যাঁচামেচি প্রবলতর হল। কেউ বলল হুকিং চলবে না। কেউ বলল চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। বোঝা গেল পেন ড্রাইভ জাতীয় একটা যন্ত্র দিয়ে ওই ভদ্রমহিলা বেশ কিছুটা লাগ্না বার করে নিয়েছেন ভবিষ্যতের জন্য। উনিশজনের মাথায় চৌবাচ্চায় লালবাতি জ্বলে উঠল, মানে আর মাল নেই।

এবার কী হবে? দোলন চোখ বড় বড় করে তাকাল সুবোধের দিকে। দৃষ্টিটা সুবিধের মনে হল না সুবোধের। সুবোধ আগেই সারেভার করল। বলল, আমি কী করব শেষ হয়ে গেলে। দোলন বলল, তুমি ওরকম একটা যন্ত্রর আগেভাগেই কিনে রাখোনি কেন?

আমি ঠিক জানতাম না... সুবোধ কুঁই কুঁই করে।

কিন্তু আমি তো অ্যাড দেখেছি। এল এল বি। লাগ্না লোডিং ব্যাঙ্ক। ওর মধ্যে জমিয়ে রাখা যায়। তুমি আজই কিনে আনো। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নাও।

সুবোধ বলল, আচ্ছা।

দোলন বলল, আচ্ছা তো বলে দিলে। কোথেকে লোড করবে তুমি? চৌবাচ্চায় তো মাল নেই।

সুবোধ বলল, তাই তো।

তবে?

এর উত্তর তো সুবোধের কাছে নেই। সুবোধ চিন্তা করতে থাকে। ওর মনে হয় ও চিন্তাটাও ঠিকমতো করতে পারছে না। লাগ্না পড়েনি শরীরে। লাগ্না ছাড়া চিন্তাও করা যায় না।

জানা গেল অন্য কোম্পানিগুলো সাপ্লাই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুবোধের পক্ষে এক্সুনি কানেকশন নেওয়া মুশকিল। বাড়ির সবাই মিলে যদি নেয়, তবে হয়তো সম্ভব।

স্বস্তিকা কোম্পানি সাপ্লাই বন্ধ করে দিলেও অন্য কোম্পানিগুলো সাপ্লাই দিচ্ছে। দু-একটা কোম্পানি গাড়ি নামিয়ে দিয়েছে। ভ্রাম্যমাণ লাগ্না সাপ্লাই। বন্দুক হাতে পুলিশ আছে সেই সব গাড়িতে। মানুষ লাইন দিয়ে বেশি দাম দিয়ে লাগ্না নিয়ে যাচ্ছে।

সুবোধ রাস্তায় এসব দেখল। ওর পকেটে এ টি এম কার্ড থাকে। ওই কার্ড দিয়ে টাকা তুলল। ওই টাকায় একটা এল এল বি কিনল। ভ্রাম্যমাণ গাড়ির লাইনে দাঁড়াল। নিজে নিল, এবং নতুন কেনা এল এল বি তে যতটা ধরে লাগ্না কিনে নিয়ে গর্বিত পায়ে বাড়িতে গেল। আজি এনেছি, আজি এনেছি তোমাকে করিতে সব দান। দোলন খুশি হল। সুবোধ বলল, এটায় কুড়ি ইউনিট ধরে। তিন-চারদিন চালাতে পারবে তো? দোলন দ্রোণকে আড়াল করে প্রথমে একটা চুমু খেল সুবোধকে। তারপর টুপিতে কানেকশন দিয়ে মাথায় পরে নিল।

সুবোধ বলল, আগে তো দ্রোণকে দিতে পারতে...

দোলন বলল, আগে আমি ঠিক হয়ে নিই, ওকে তো দেবই...

সুবোধ লক্ষ করল বউটা লক্ষ্মী হয়েছে। মাত্র দেড় ইউনিট নিজে নিল, তারপর দ্রোণকে। সুবোধ তাকিয়ে আছে। দোলন বলল, ভয় নেই, ভয় নেই, তোষার জন্য রাখব...। মিষ্টি করে তাকাল দোলন।

অফিসে আর কোনো কাজ নেই, কেবল এ নিয়ে আলোচনা। সবাই বলাবলি করছে স্বস্তিকা কোম্পানি এই শক সামলাতে পারবে না। এমনিতেই কোম্পানিটার শেয়ারের দাম দিনকে দিন নেমে যাচ্ছে। অন্য

কোম্পানিগুলো টিকে যাবে। সরকার যদি ভরতুকি উঠিয়েও নেয়, মানুষ লাগ্না ছাড়া বাঁচতে পারবে না। বেশি দাম দিয়েই কিনতে হবে, কোনো উপায় নেই।

অফিসের ওর এক হিতৈষী বন্ধু উপদেশ দিল আলফা কোম্পানির কানেকশন নিতে। অন্য বন্ধু আলফা হল আমেরিকান কোম্পানি। ডলারের দাম পড়ে যাচ্ছে। আমেরিকার ভবিষ্যৎ নেই, বিটা কোম্পানির কানেকশন নাও। বিটা হল ডাচ কোম্পানি। ডাচরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী জাতি। ইউরোর দাম কিন্তু বাড়ছে। অন্য বন্ধু বলল, বরং গামা কোম্পানির কানেকশন নাও। জাপানি কোম্পানি। খরচটা একটু বেশি, কিন্তু সার্ভিস ভালো। জাপানিরা সহজে বিট্রে করে না। সুবোধ পি এফ থেকে টাকা তোলার জন্য দরখাস্ত করে দিল, এবং হেড ক্লার্কের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি কাজটা করে দিন। ছোট্ট করে স্যারও বলল সুবোধ। সুবোধের একটা মামাতো ভাই আছে এ শহরে। ও সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করে। সুবোধ জানে ওর নিজস্ব হোম কানেকশন আছে। তা ছাড়া ও প্রতি মাসে একটা ভালো অঙ্কের লাগ্না অ্যালাউন্স পায়। ওর কথা মনে পড়তেই ওকে ফোন করল সুবোধ। মামাতো ভাই বলল, আজ আমার অফ, চলে আয়। দেখা যাক কী করা যায়।

সুবোধ গেল। কী সুন্দর ফ্ল্যাট। লাগ্নার দাম বেড়েছে বলে কোনো চিন্তা নেই। বিল কোম্পানি মেটাবে। বলল, এত চিন্তা করছিস কেন তুই, লাগ্না ভরে নে। সুবোধ বলল, আমার জন্য এত ভাবছি না। আমার তো পরিবার আছে।

আই টি কোম্পানির ভাইটি বলল, লোড করে নিয়ে যা। আমার কাছে একটা এল এল বি আছে। আগেকার মডেল, একটু বড়। হারমোনিয়াম বাক্সের সাইজ। ভরে দিচ্ছি, নিয়ে যা। তিন চারদিন চলে যাবে। কিন্তু বারবার দিতে পারব না। হিউজ বিল হলে কোম্পানি ভাববে আমি বাইরে বিক্রি করছি।

তাই করল সুবোধ। এল এল বি-তে লাগ্না ভরল। তারপর ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে গেল। বউকে বলল এনেছি, আমি এনেছি...

আলফা-বিটা-গামা কোম্পানির ফ্রানচাইজিতে গেল সুবোধ। বুঝল সহজে কানেকশন পাওয়া যাবে না। কারণ আলফা কোম্পানি প্রোডাকশন বাড়াবে না আর। নতুন গভর্নমেন্টের শক্তিমন্ত্রীর সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক ভালো নয়। নববিবাহিত পুত্র গ্রিনল্যান্ডের ইগলুতে হনিমুন করতে চেয়ে আলফা কোম্পানিকে স্পনসরও ব্যবস্থা করতে বলেছিল, কোম্পানি ভুল করেছিল। রাজি হয়নি। অনেকের ধারণা আলফা কোম্পানিকে হাটাবার জন্যই সরকার এসব করছে।

পরদিন অফিস যাওয়ার পথে সুবোধ দেখল একটা মিশনারি সংস্থা লাগ্না বিতরণ করছে। যেন লঙ্গরখানা। আবার লাগ্না লোড করল। বাড়ি গেল। আমি এনেছি...

ওর ঘরের ঢোকির তলাটা ভরে গেছে। ভবিষ্যতের লাগ্না সঞ্চয়। শেষ হয়ে গেলে আবার ভরে আনবে। এ বাড়ির লোকেরা দেখছে ওর অভাব নেই। দেখুক। এখন দশ-বারোদিন চলে যাবে। শুধু একটু সাবধানে থাকতে হবে। ঘর খোলা রেখে কোথাও যাওয়া চলবে না।

গামা কোম্পানির এজেন্ট খবর দিল-আপনি কানেকশন পাবেন। কনথ্যাচুলেশন। নতুন যারা অ্যাগ্লাই করেছিল, তাদের মধ্যে লটারি হয়েছে। লটারিতে আপনার নম্বর উঠেছে। আপনার ঘরেই কানেকশন চলে



যাবে।

কত খরচ পড়বে?

টাকার অঙ্কটা শুনে ভ্যাচাকা খেয়ে গেল সুবোধ। অ্যা-অ্যা-ন্তো?

হ্যাঁ, বেড়ে গেছে।

তার ওপর আবার লাগ্নার দাম দিতে হবে?

হ্যাঁ! সেটাও বেড়ে গেছে।

তার ওপর সার্ভিস চার্জ।

হ্যাঁ, ওটাও বেড়ে গেছে।

পোর্টেবল নেই? পোর্টেবল? ছোট ছোট কিট? শেষ হয়ে গেলে আবার ভরে নেব?

পোর্টেবলের তো খুব ডিমাণ্ড। শেষ হয়ে গেছে। কাল আবার মাল আসার কথা আছে। রাত থেকেই লাইন পড়বে।

পি এফ এ-র টাকা পেয়ে গেছে সুবোধ। ওই টাকাগুলো পকেটের ভেতরে পুরে রাতে খাওয়াদাওয়া করে লাইনে দাঁড়াল। ওদের বাড়ির দু-একজনকে দেখল। দেখে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। একটু পরে রাস্তায় বসে পড়ল। একজন বৃদ্ধ মানুষ তার ছোটবেলাকার গল্প করতে লাগল। জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার গল্প। তখন অন্য পাড়ায় জল আনতে গিয়ে মারপিট। তারপর পরিবারের সবাই মিলে এখান থেকে ওখান থেকে হাঁড়ি, বালতি, কলসি ভর্তি করে জল স্টক করার গল্প।

এইসব গল্প চলছিল, সবাই শুনছিল। কয়েকজন মহিলাও ছিল। এমন সময় কয়েকটি যুবকের আবির্ভাব হল। হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মতো ওদের পোশাক। ছিট ছিট জামা। ওদের মুখ থেকে মদের গন্ধ। ওরা বলল, এক থেকে কুড়ি নম্বর আমাদের রিজার্ভ। যে লাইনের এক নম্বরে আছে, সে আসলে একুশ নম্বর। কিছু লোক প্রতিবাদ করল। ছেলেগুলো চড়াপড় মারতে লাগল। হুটোপুটি লেগে গেল। মেয়েদের চিৎকার শোনা গেল। একটা নারীকণ্ঠের চিৎকার-আমার ব্লাউজ ছিঁড়েছেন কেন? এই গলাটা দোলনের মতো নয়? ছুটোছুটিতে রাস্তায় পড়ে গেল সুবোধ। মাথা ফেটে গেল। তবু বাড়ি ফিরল না। একটু পরে আগন্তুক যুবকরাই ম্যানেজমেন্টের লোক হয়ে গেল। ওরা প্রথম কুড়িটা নিজেদের জন্য রেখে একুশ থেকে লাইন ঠিক করে দিল। আকাশে শুকতারাটা ম্লান হল। সূর্য উঠল। যাদের মাথা ফেটেছিল, যাদের ঠোঁট কেটেছিল তাদের সব রক্ত চাক হয়ে গেল। ঘরে ঘরে টিভিতে, এফ এম-এ ভৈরবী রাগ বেজে উঠল। বেলা আটটায় লাগ্না গাড়ি এল।

সবাই লাইন ঠিক করল। মেয়েটিও লাইনে দাঁড়িয়ে। ছেঁড়া ব্লাউজ ঝুলে আছে। আঁচল চাপা কাঁধের কাছে রক্তের ছড় দেখা যাচ্ছে, সে দোলন। আর ওই বৃদ্ধটি, যে জলের গল্প বলেছিল, সে লাইনে নেই। রাস্তার একধারে শুয়ে আছে। বোধহয় মৃত।

সুবোধ একটা পেল। পোর্টেবল। দিন কয়েক চলে যাবে। বুক জড়িয়ে ধরে বাড়ি ফিরল সুবোধ আর দোলন। সুবোধের কপালের রক্তের রং এখন কালো। আর দোলনের...

চৌকির তলায় ওরা রাখল ওসব। চৌকির তলাটা ভরে আছে। আহা টইটম্বর। যেন হাঁড়ি, কলসি, জারিকেন, বালতি, ডেকচি ভর্তি জল। যেন বহুদিন কলে জল না এলেও দুঃখ নেই। বৃষ্টি না হলেও দুঃখ নেই। সুবোধ দু-চোখ ভরে লাপ্লা ভরা যন্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। দোলনও বসেছে মেঝেতে। দোলনও তাকিয়ে আছে। একটা সুন্দর সুখে আছে দুজন। এত ঝুঁক ও বাড়ির কারও নেই। কী নিশ্চিন্তি। আড়চোখে দেখল বাড়ির অন্যদের চিন্তামগ্ন পদচারণা। অস্থিরতা। আঃ কী সুখ!

ঠিক এমন সময় একটা শব্দ। হব্ব হব্ব শব্দ, লাপ্লার মূক মেশিন থেকে শব্দটা আসছে। যে শব্দটা আসার কথা ছিল না, সেই শব্দটা আসছে। উঠোনের মানুষরা চিৎকার করে উঠল। হইহই করল, হাততালি দিল, গতকাল রাতে কি কিছু ঘটে গেল?

সরকার কি আবার কিছুটা ভরতুকি দিতে রাজি হয়েছে? শক্তিমন্ত্রীর ছেলে কি শেষ অবধি ইগলুতে হনিমুনে গেল?

চৌকির তলায় পড়ে আছে সুবোধদের পি. এফ. এ টি এম নিংড়ানো টাকা।

সুবোধ কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে। হাতে গতরাতের বাসি রক্ত।

সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে ওই বন্ধ লাপ্লা মেশিনে। লাপ্লা আসছে। হব্ব..হব্ব...।

বাইরে হইহই শব্দ। দোলনের শরীর জুড়ে কান্না আসছে এখন।

## ব্লু সি.ডি নিয়ে একটি গল্প

আমার সারের বিজনেস ছিল, তারপর ট্রাক্টর কিনিচি, ভাড়া খাটাই। আমার ট্রাক্টরটার রং লাল। হবে না। ও কিছু না। কন্ট্রাক্টরিও করি। একটা মারুতি ভ্যান গাড়ি আছে, লাল। হবে। ও কিছু না। একটা ছোটখাটো হলঘর মতো করিচি, ওখানে তিনটে শিক্ষিত বেকারকে চাকরি দিয়িচি। ওখানে ভিডিও সিনেমা দেখানো হয়-মাঝে মাঝে নীল, ও কিছু না।

এগুলোকে কেন যে নীল বলে, বুলু বলে, কে জানে? ওসব সিনেমায় তো সব রং থাকে। এখন যে সিডিটা দেখানো হচ্ছে ওটার নাম তো হট রেড। লাল স্টেজ, লাল পর্দা, লাল আলোর মধ্যে খেলা চলছে। এই সিডিটা আমি কিনেছিলাম পাটেয়াতে। থাইল্যান্ডের পাটেয়া। ওখানে যে এসব হয় আগে জানতাম না। জানার কোনো শেষ নাই।

গঙ্গায় পাথর ফেলার কাজটায় ঠাকুরের ইয়েতে কিছু হল। গঙ্গার ভাঙন আটকাতে পাথর ফেলাটা আর কি। জলে ফেলার সুবিধে অনেক। বিলটা পেয়ে হরিমন্দিরে একটা রাসমঞ্চ করে দিলাম পাথরের, শহিদবেদিটাও বাঁধিয়ে দিলাম পাথরে, স্কুল বাড়ির কুয়োটলটাও বাঁধিয়ে দিলাম, স্কুলটা গাঙের ধারে, কে জানে সামনের বার থাকবে, না কি নদী গর্ভে যাবে।

ইঞ্জিনিয়ারটি বলল আমি কিছু ক্যাশ-ট্যাশ চাই না। আমায় একটু ঘুরিয়ে দিন। চলুন বেড়িয়ে আসি ব্যাংক-পাটেয়া। আমি বললাম-আগ্রার তাজমহলই দেখিনি এখনো, ব্যাংক কী দরকার। ইঞ্জিনিয়ারটি বলল-দরকার, দরকার এখনই দরকার। তাজমহল-তাজমহল তো রইলই। কেউ সেটা নিয়ে যাচ্ছে না। বসন্ত চলিয়া গেলে আসিবে আবার, যৌবন চলিয়া গেলে আসিবে না আর। এরপর ওই ইঞ্জিনিয়ারটা পাটেয়ার গল্প বলল।

ওইসব গল্প শুনে কি বলব। আমার তো, ডিজেল ট্যাংকি গরম। ওই ইঞ্জিনিয়ারটার নাম সব্যসাচী। স্কুলে পড়েছিলাম যে দুই হাত সমান কাজ করতে পারে এককথায় তাকেই বলে সব্যসাচী। ছেলেটা কিন্তু ওর নামের ইজ্জত রেখেছে। ও খুব করিতকর্মা ছেলে। আমার পাসপোর্ট-টাসপোর্ট সব করিয়ে দিল। জীবনে প্রথম প্লেনে উঠলাম। মিসেসকে বললাম মন খারাপ কোরো না, দেখে টেখে আসি, তোমাকেও নিয়ে যাব। প্লেনে মাইরি কিছুই বোঝা যায়না-এটা যে এত জোরে চলেছে কে বলবে। গান শুনতে শুনতে আর স্কচ মারতে মারতে ব্যাংকক পৌঁছে গেলাম। ব্যাংককে এক রাত থেকে পর দিনই পাটেয়া।

পাটেয়া যে কী জায়গা, কি বলব। সমুদ্রের ধারে একটা রাস্তা, যার নাম ওয়াকার স্ট্রিট। ওখানে গাড়ি মানা, শুধু ওয়াক করতে হয়। ওয়াক করছি, দু পাশে নানা রকম দোকান। সেক্স শপ। কাচের শোকেসে কী বলব, ভ্যারাইটিস্ রকমের ফুটি সাটানো। ছবি, মূর্তি, সিডি, রবারের ধন, বড়ো বড়ো। তা ছাড়া রগড়ের খেলনা-ইন্টুপিন্টু করছে। মালের দোকান, দোকানের টুলে খালি গায়ে কটা ব্যাটাছেলে বসে আছে। সব্যসাচী বলল ওরা হ'ল ছেলে বেশ্যা। দাঁড়িয়ে আছি দেখব বলে কোনো মেয়ে ওখানে কিনা, ওমা, দেখি আমাদেরই ডাকছে। আর একটু সামনে দেখি একটা গোল মতো বেদি, আমাদের রাসতলার মতন, বেদিটা স্লো-স্লো

ঘুরছে। বেদিটার উপর অনেকগুলো জাঙিয়া-বডিজ পরা গোপিনী। আমার এই বয়সেও মনটা বলছিল মাঝখানটায় কেঁপে উঠে দাঁড়িয়ে পড়।

মনটা আমার এখনো ইয়ং আছে, কিন্তু টু-ইন ওয়ান যন্ত্রটা, সুগার-ফুগার হয়ে গিয়ে একটু কমজোরি হয়ে আর টু-ইন-ওয়ান নেই। কিন্তু এখানে এসে দেখি ওটা কথা বলে। মেয়েগুলোর গলায় একটা করে নম্বর ঝোলানো। সব্যসাচী বলল কাউন্টারে গিয়ে পছন্দের নম্বরটা বলতে হয়। চোখের ইশারা করল আমায়। ওর তো বয়েস কম, সবটাতেই ছড়োছড়ি। আমি বলি হবে খনে স্যার, গেলেই তো হয়ে গেল। সামনে ওয়াক করি। ওয়াকার স্ট্রিট। কত সাহেব-সুবো।

ওদের দেশে এইসব ফুর্তি কিনতে অনেক টাকা, এশিয়ায় সস্তা ডলার ভাঙালে, পাউণ্ড ভাঙালে, ইয়োরো ভাঙালে এক গাদা এশিয়ান টাকা। একটা সুট পরা কালো রং-এর সাহেব ঘাড়ের একটা মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা। কালো সাহেবের কোঁকড়া চুল ধরে আছে, সাহেবের গলায় দুপাশ থেকে বেরিয়ে বুকের ঝুলে থাকা পা দুটোকে খাবলে ধরে আছে সাহেবের হাত। সাহেব চলেছে। ডান দিকে ওয়াটার গেমস, বাঁ দিকে ডল্‌স হাউস। ডান দিকে সান্না সান্না বাঁ দিকে তাজমহল। ডানদিকে বুগি বগি শো তো বাঁ দিকে হট রেড শো। হট রেড শো-র বাইরে কিছু ছবি দেখে পছন্দ হ'ল। দুশো ভাট করে টিকিট। এমন কিছু না। একশো কুড়ি টাকায় একশো ভাট হয়। ঢুকে গেলাম। লাল কার্পেট, লালপর্দা, লাল আলো।

তারপর কী সব কাণ্ড রে ভাই, একটা মেয়ে ওর অসভ্য জায়গায় একটা বল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আবার সেই বল ফক্ করে বার করে দিচ্ছে। তারপর তিনটে মেয়ে চেয়ারে বসল, চেয়ারের হাতলে পা তুলে দিল, একটা লোক এসে ওদের অসভ্য জায়গায় পিচকিরি দিয়ে জল ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল, তারপর মিউজিক বেজে উঠল, আর মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে খারাপ জায়গা থেকে ফোয়ারার মতো জল বেরোতে লাগল, আর ওই জলে আলোক সম্পাত। তারপর পাঁচটা ল্যাংটো মেয়ে সারা গায়ে রিং ঘোরাতে লাগল। এরকম ধারা কয়েকটা শো-এর পর থপথপ করতে করতে একটা মোটা ছেলে এল। খালি গা। থলথল করছে গাদা গাদা চর্বি। গলা থেকে মাংস ঝুলে পড়েছে, চোখটাও বেরিয়ে পড়েছে। পরনে সিল্কের লুঙ্গি। আলোয় চকচক করছে। ছেলেটা হাত দুটো উপরে তুলে দিল, দাঁত বের করল, ফেং সুই-এর লাফিং বুদ্ধ যে রকম, ভুঁড়ি দোলাতে লাগল ঘুরে ঘুরে, আর হট করে লুঙ্গিটা খসে গেল। দেখি, যন্ত্রটা বিরাট বড়ো পিন মারা বইতে যেমন ড্রেসক্রাইব করা থাকে। ছেলেটা থপাস থপাস নাচছে। মিউজিকে মিলছে না। হাতে ধরে দণ্ডটা নাচাচ্ছে। দর্শকদের হই-হই। এবার চলে এল কয়েকটা মেয়ে। কত রকম রং ঢং করল, ছেলেটাকে বারবার জড়িয়ে ধরতে লাগল আর মুখ দিয়ে কত রকমের আওয়াজ করতে লাগল। যে যার পরনের বসন খসিয়ে ফেলল, তারপর ছেলেটার পুরুষ-অঙ্গটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল, টানাটানি হাতে হাতে ঝং করে একটা মিউজিক বাজল আর দেখি ছেলেটার দেহ থেকে ওই পুরুষ অঙ্গ খসে গেছে। পুরো জিনিসটা একটা মেয়ের হাতে, ছেলেটা বাংলায়, চিৎকার করে উঠল, একেবারে বাংলায় ও-মা... দেখদিকি আমারটা লিয়ে পলাই'ল...।

ছেলেটার তলপেটে তখন আলোর ফোকাস। ছেলেটার কিছু নেই, ছোট্ট একটুখানি, দুটো করমচার মতো অণুকোষ। ছেলেটা আবার মাথা চাপড়াচ্ছে। ও মা...

এক্কেবারে আমার দেশের টান। আমার বাংলা। ছেলেটার দিকে ভালো করে তাকাই, কেমন চেনা লাগে  
কিন্তু পর্দা পড়ে যায়। এটাই ছিল শেষ আইটেম।

সব্যসাচী স্যারকে বললাম এই ছেলেটা আমার গাঁয়ের। ছোটবয়স থেকেই খুব বেশি খেত বলে ওর মা  
বেচে দিয়েছিল। একবার কি জিজ্ঞাসা করে আসা যায় ছেলেটার গাঁয়ের নাম চন্দন পিঁড়ি কিনা? সব্যসাচী  
ওধারে গেল, ফিরে এসে বলল এখন ঢাকা গেল না! এফুনি আবার শো আছে। কাল আসা যাবে।

হল-এর বাইরে একটা ছোট করে মালের দোকান। এসব ছোট দোকানকে পাব বলে। শিখেছি। ওখানে  
বসা হল। সব্যসাচী স্যার ওর এক বন্ধুর দেখা পেয়ে গেল। ডাক্তার। এই শো দেখেই বেরিয়েছে। একটা  
ওষুধ কোম্পানি কয়েকজন ডাক্তারকে ফুটি করাতে এখানে নিয়ে এসেছে-আমি যেমন সব্যসাচী স্যারকে।  
আমরা বসলাম। বিয়ার নিলাম। আমি বললাম ছেলেটাকে আমি চিনি। বাগদি ঘরের ছেলে। ওর মায়ের নাম  
বিমলি। বিমলি এক সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করত। ছোটাবেলা থেকেই ছেলের খুব খাই খাই ছিল।  
ছেলের চেহারাটাও ছিল বড়ো। ছেলের যখন দু-বছর বয়েস, তখন বিমলির স্বামী ফুটে যায়। বিমলি তিন  
মাইল দূরের বলরাম গোঁসাইয়ের শ্রী পাটে গিয়ে ছেলেকে খিচুড়ি খাইয়ে আনত, আমাদের বাড়িতেও  
এনেছিল। তিন বছরের ছেলে আধ সের চালের ভাত সাবড়ে দিত। পালোয়ানের মতো চেহারা হচ্ছিল। দেখে  
কে বলবে মোটে তিন বছর। বিমলি ওই আশ্রমেই কাজ পায়। শুনেছিলাম কারা নাকি ওই খাই খাই  
ছেলেটাকে পছন্দ করে নিয়ে গিয়েছিল।

বিমলি তারপর বোষ্টমী হয়ে যায়। এ পাট সে পাট ঘুরে আবার এই এসেছে। ওর ভিটে দখল হয়ে  
গিয়েছিল, পঞ্চায়েতের চেষ্ঠায় ভিটে ফিরে পেয়েছে। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে এটাই বিমলির সেই  
ছেলে।

কত বছর আগে বিমলির ছেলেটা হয়েছিল? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করে। আমি হিসেব-টিসেব করে বলি-  
তা কুড়িবছর হয়ে যাবে।

ডাক্তার বলল-এসব ছেলেপিলেরা বেশি দিন বাঁচে না কিন্তু। কুড়ি বছর রেয়ার কেস। এর একটা ছবি  
পেলে ভালো হ'ত। ফুল বডি, উইথ গোনাডস্।

মানে?

মানে ওর জনন যন্ত্র সমেত। এদের রিপ্ৰোডাক্টিভ অরগান্স খুব ছোট হয়ে যায়। হাইপোগোনডিজম বলে  
একে। বিয়ারে চুমুক দেন ডাক্তার।

কী অদ্ভুত বলুন তো, এই এন্তবড়ো একটা পেনিস, দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম  
ওইতো জবুথবু চেহারা, তার এত দামি সম্পত্তি! আর আমার এই ডিগ্রি, ব্যাংক বাল্যান্স- কিছু না!-  
সব্যসাচী স্যার বললেন।

তারপর যখন দেখা গেল কিছু নেই, ওটা ফলস, আনন্দ হ'ল তো?

-ডাক্তারবাবু বললেন।

সবাই হাসল। বিয়ার ঢালা হল। ফেনা।

সব্যসাচী স্যার বললেন-লোকমান কেসটা মনে আছে? খবর কাগজে খুব বেরিয়েছিল। ছেলেটার জন্য মায়া পড়ে গিয়েছিল।

ফালতু ফালতু মারা গেল ছেলেটা।

ওর মাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারবাবু বললেন।

আমার খুব জানার ইচ্ছা। আমার চোখ দেখেই ডাক্তারবাবু বুঝতে পেরে ছিলেন চোখের মধ্যে জিজ্ঞাসাচিহ্ন। ডাক্তার বললেন - মাথার হাইপো থ্যালামাসের ডিসফাংশনের জন্য বেশি পরিমাণে গ্রোথ হরমোন বেরোতে থাকে। ফলে দেহটা অস্বাভাবিক ভাবে বড়ো হয়ে যায়, আর বড়ির প্রয়োজনেই খাই খাই রোগ। খুব খায় এরা, আর বুদ্ধি হয় না এদের। সব হরমোনের খেলা, বুঝলেন?

হরমোনটা আমি বুঝি। সারের কারবার কিনা, বালির মধ্যে শেকড় ছেড়ে দেয় চন্দ্রমল্লিকার শুকনো ভাল শুধু দু-ফোঁটা হরমোনে। শীতকালে জুঁই ফুটিয়ে দিচ্ছি, গ্রীষ্মে শেফালি। গন্ধটা অবিশ্যি হয় না। বিশাল বিশাল ভোসকা মূলো আর পানসে শালগম বানিয়ে দিতে পারি হরমোনে। সামনের টেবিলে একটা মেয়েছেলে। বিশাল বিশাল স্তন। হরমোন? এই যে পাটেয়া, ব্যাংকক থেকে গম্ফ হাইওয়ে, রাস্তা-পার্ক, স্পিডবোট, প্যারাসুট-পাব-এইসব ঝলমল, সব বিনচ্যাগ, সব হরমোন? বিয়ার খাই।

রাত মোটে আটটা। নাইট ইজ ইয়ং। কোথায় যাওয়া যায়? ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার যাবে ডল্‌স হাউস-এ, আমি তবে ম্যাসাজ পার্লারে। ওরা বলল আপনিও ডল্‌স হাউস এ চলুন। আমি বললাম-না, ওখানে সুবিধে হবে না। সাতান্ন বছর চলছে। ডাক্তার বলল তাতে কী হয়েছে, একটু হরমোন নিয়ে নিতে পারতেন।

বিমলির ওই হরমোন ছানার সঙ্গে আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। সব্যসাচী খোঁজ নিয়ে জেনেছিল রোজ বিকেলে তিনটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত পেন্ডল্যাড-এর দেখা পাওয়া যায়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফি কুড়ি ভাট, পাঁচ মিনিট সময়। ওরা ওই ছেলেটার নাম রেখেছে পেন্ডল্যাড।

হোটেল ফিরলাম রাত দেড়টা নাগাদ। পরদিন একটা কোরাল আইল্যান্ড গেলাম। স্পিডবোটে সাহেব, সাহেবের কোলে থাই কিশোরী। রঙিন ছাতার তলায় সাহেব, সাহেবের গা টিপে দিচ্ছে থাই কিশোরী। প্যারাসুটে উড়ছে সাহেব, স্পিডবোটে ঘুরছে সাহেব, টাকা উড়ছে-ডলার, ইয়োরো- ইয়েন। আমি সব্যসাচী স্যারকে ফুটি করছি।

চারটের সময় গিয়ে বসে রইলাম। চারটে কুড়ি মিনিটে ডাকল। আমরাই শেষ ভিজিটার। লাল কার্পেট বিছানো ঘরে লাল সোফায় বসে আছে ছেলেটা। চোখের ভিতরে ধানকাটা মাঠ। মেশিনের মতো উঠে দাঁড়াল। খালি গা। কোমর থেকে খসিয়ে দিল আচ্ছাদন। দুই বিশাল থাইয়ের মাঝখানে দু' ফোঁটা চোখের জলের মতো দুঃখী অণুকোষ। সব্যসাচী ছবি তুলতে গেল। পাশে দাঁড়ানো একজন বলে উঠল নো ফোতো, নো ফোতো সিডি ইজ দেয়ার। পারচেজ প্লিজ।

ছেলেটার কোমরে আবার সিল্কের চাদরটা পরিয়ে দেয় লোকটা। বোঝা গেল ভিজিটাররা ওর উলঙ্গ শরীরটাকে সামনে থেকে দেখতে আসে। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ছেলেটা বলে, মাই নেম ইজ পেন্ডলাদ। থ্যাং কিউ ফর ভিজিট, হ্যাভ ওয়ান্ডারফুল ইভিনিং। বলেই চোখ বুজে ফেলে।

আমি ঝপ করে বলে ফেলি-এই শোন, তোর গায়ের নাম কি চন্দন পিঁড়ি, আর মায়ের নাম কি বিমলি?

ছেলেটা চোখ খোলে। চোখ থেকে যেন হঠাৎ বের হয় চার ব্যাটারির এভারেডি আলো। লক গেট খোলার মতো দু হাত খুলে দিল, বলল মা...হুড় হুড় জল বেরুচ্ছে শুকনো লালায়। মা...। ছেলেটা থপথপ করে এগিয়ে আসে। বলে দেশ। মা। গোরু।

বলো মা দেখেছ? মা গুড? মা ওকে? আমি বলি তোমার মা ভালো আছে। গুড, গুড, ভেরি গুড। তোমার মা খুশি হবে যদি তোমার ছবি দেখে। সব্যসাচীকে ফটো তুলতে বলি।

পাশে দাঁড়ানো লোকটা বলে-নো ফোতো, নো ফোতো। পারচেজ সি.ডি। হানদ্রেড ভাট ইচ্।

আমি বলি তোমার মাকে তোমার কথা বলব। তুমি ভালো আছো তো?

নো-নো-নো। নট ভালো। নুতি ছাং।

-কী কষ্ট তোমার?

চোখ দিয়ে জল বের হয় ছেলেটার আর মাথা নাড়ে।

পাশের লোকটা বলে প্লিজ গো স্যার। টাইম ইজ ওভার।

ছেলেটা বলে নো গো। চিনগোতে। আরও কি সব বলল ওদের ভাষায়। ছেলেটা আমার দিকে কাতর তাকায়। তারপর বলে বাড়ি দাবো। কী সহজ সরল একটা প্রার্থনা। আমি চুপ। সব্যসাচীর দিকে তাকাই।

একটা লোক ঘরে। হাতে ট্রে।

লোকটা বলে-গো আউট স্যার। প্লিজ। নাও ইজ দি টাইম অফ ফুড।

ছেলেটার দু-হাতে নিষেধ। নো। চিন গোতে।

আমাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চায়।

লোকটা আমাদের বলে-আই অ্যাম কেয়ারতেকার। আই কেয়ার। হি ইজ গুত।

পেংলাদ কিছু বলে। ওর গলকষলে ঢেউ ওঠে, মুখ থেকে থুথু ছিটোয়।

কেয়ারটেকারটি আমাদের বলে, স্টে হিয়ার সাম মোরটাইম। পেংলাদ টক্স উইথ ইউ। পেংলাদ বলে দল।

ওকি জল বলতে চাইছে? আমি মাথা নাড়ি,

ও বলে-ভাত।

মাথা নাড়ি।

আমি জানি ও ওর বাল্যবয়স বলতে চাইছে। পারছেন। ও ওর পাঁচ কিংবা ছ বছর বয়সে দেশ ছাড়া হয়েছে। বাংলা ভুলে গেছে। কিন্তু কথা রয়ে গেছে।

কেয়ারটেকারটি খাবারের ট্রে ঢাকনাটা উঠিয়ে দেয়। বাটি ভরা জ্যাম, চিজ, মধু, ডিম...। পেংলাদ নিতদুম নিতদুম বলে চ্যাঁচিয়ে ওঠে। কেয়ারটেকার ওকে চিংকার করে কিছু বলে। আর একজন লোক এগিয়ে আসে। চামচ করে খাবার গেলায়, গলায় মধু ঢেলে দেয়। পেংলাদের সারা শরীরে নিষেধ। প্রতিবাদ। ও খাবে না। ওর আর খেতে ভালো লাগে না। তবু ওকে খেতেই হবে। ওকে চর্বি বানাতে হবে। লোক হাসাতে হবে। ওর থলথলে দুই উরুর ফাঁকের অন্ধকারটার গায়েই তো হাততালি আছাড় খায়। ওর দামের লেবেল ওখানেই সাঁটা।

ওর খাওয়া হয়ে যায়। সাদা ধপধপে ন্যাপকিনে মোছানো হয় ওর মুখ। ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। পোশাক পরানো হবে। পোশাক পরানো হলে ও আমাদের ওর নিজস্ব ঘরে ডাকে। ওর ঘরে যাই। ওর সাদা ধপধপে বিছানা দুপুরের গঙ্গার চরের মতো পড়ে আছে। দেয়ালে একটা বুদ্ধদেবের ছবি। টেবিলে ট্রের উপর একটা ধূপদানীতে ধূপকাঠি, তার পাশেই যত্নে রাখা দুটি রবারের পুংলিঙ্গ।

পেংলাদ একটি ডায়েরি বের করে। আমার দিকে চেয়ে হাসে। বলে আংকেল, আড্ডেস।

আমার অ্যাড্রেস? আমার?

মা। আমি মা-দাব।

তোমার মায়ের ঠিকানা চাও?

মাথা নাড়ে ও। হাসে।

আমি লিখি বিমলা বাগদি।

কেয়ারঅফ-এ আমার ঠিকানা।

খুব মন দিয়ে ঠিকানাটা দেখতে থাকে পেংলাদ, যেন ওই অক্ষরগুলির মধ্যে ওর মা লুকিয়ে আছে কোথাও।

সময় হয়ে গেছে। পাঁচটা বেজে গেছে। শো-তে যেতে হবে। তার আগে মেকআপ। একটা ছোট্ট ব্যাগ কাঁধে ঝোলে। ব্যাগের ভিতর থেকে থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতে থাকে রক্তমুখ রবার শিশু।

ওই হটরেড-এর একটা অফিসঘর ছিল। অফিসঘরে বসে ছিল রিমলেস্ চশমা পরা এক যুবক। ঠোঁটে লম্বা সিগারেট। ও খবর পেয়ে গেছে। আমরা ঢুকতেই বলল-সিট ডাউন প্লিজ কন্ট্রিমেন অফ পেংলাদ।

আমরা বসলাম।

হি ইজ এ ভেরি গুড গাই।

মাথা নাড়ি।

কী করে পেলেন ওকে? সব্যসাচী জিজ্ঞাসা করে। শুনেছি একটা সার্কাসে ছিল। আমার বাবা ওকে কালেক্ট করেছিল।

কিনে নিয়েছিল?

জানি না কী টার্মস অ্যাণ্ড কন্ডিশন ছিল। আমার বাবা মারা গেছেন ছ'বছর হ'ল।

ও কি মাইনে পায়?

খাওয়া পায়, অ্যাকোমডেশন পায়। মেডিসিন পায়। এ ছাড়া ওর নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টও করে রেখেছি। কিন্তু ওর তো কোনো ওয়ারিশার নেই।

আমি বলি ওর মা কিন্তু বেঁচে আছে। উনি বলেন-ওর কাছে বেঁচে আছে তা বুঝি। ওর শো টা দেখেছেন তো, যখন ওর - জিনিসটা তলপেট থেকে খুলে নেয়া হয়, ও চিৎকার করে মাকেই তো কমপ্লেন করে। কিছু হারিয়ে গেলে মাকে ডাকে, এখনো। আমরা তো ওর ঠিকানা জানি না, জানলে ওর মাকে আনিয় নিতে পারতাম। ওকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠিকানাটা ঠিক করে বলতে পারে না।



আমি বললাম ঠিকানাতো দিয়ে গেলাম। কেমন থাকে জানাবেন। ফটো পাঠিয়ে দেবেন। বাইরের কাউন্টার থেকে সিডি কিনে নিলাম। নানান রকম সিডি বিক্রি হচ্ছে। ন্যুড নডিউল্‌স, ফান ফ্যান্টাসি, ফ্রেজি গার্লস, এরকম কয়েকটা। বাইরে আলোর ফুলঝুরি, সমুদ্র কিনারে হই হল্লা। হাইওয়ে। সব ইন্ট-পাথর-আলোর মধ্যে চুপিচুপি রয়ে গেছে ‘ওমা-নিয়ে যাচ্ছে...’।

ওই সিডি এখন চলছে। এখানে, আমার গ্রাম এ একেবারে অন্যরকমের জিনিস। এ জিনিস আগে দেখিনি। গ্রামের উন্নতি হচ্ছে। হরিসভায় মার্বেল বসেছে, পার্টি অফিস দোতলা হয়েছে, কাঁচা রাস্তায় মোরাম পড়েছে। বটার চায়ের দোকানে এখন চাউমিন পাওয়া যায়। নসুর ভাটিখানায় ব্ল্যাক হুইস্কির নিপ মেলে। গায়ের লোকজন জেনে গেছে-এ গায়ের ছেলে থাইল্যান্ড গিয়ে কামাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে কোনো কাজই খারাপ না। গায়ের লোকজনের মত কত পালটে গেছে। যাকে বলে প্রোগোতিশীল। নমোপাড়ার দুটি মেয়ে কলকাতায় বডি বেচে, সবাই জানে। ওরা মাঝে মাঝে গায়ে আসে হাতে ছানাবড়ার হাঁড়ি নিয়ে। বাপ মাকে নতুন জামা কাপড় দিয়ে যায়। খাসির মাংস কেনে। ভোটের সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে যায়।

ভিডিও হল থেকে কেউ কেউ বলে-আমি তো বুলু দেখতে আসিনি, গায়ের ছেলেটাকে দেখতে এসেছিলাম।

আমি ফিরে এসে বিমলির খোঁজ করতে ওদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। বিমলি তখন শাক সেদ্ধ করছিল। একটা জায়গায় চাল, ডাল, এক প্যাকেট ট্রেনের বাদাম। ইটের উপরে বসে বিড়ি খাচ্ছে রোগা মতে একটা লোক। গলায় কণ্ঠি। বিমলির বোষ্টম।

আমি বলি-তোমার ছেলেকে দেখে এলাম গো। ভালোই আছে সে।

পেল্লাদ? আমার পেল্লাদ?

বলি হ্যাঁ। তোমার পেল্লাদ।

বড়ো আহ্লাদী হয়ে যায় বিমলি।

জয় হরি। সত্যি? নিজের চোখে?

-হ্যাঁ গো, নিজের চোখে। কথাও কয়ে এসেছি।

-কোথায় দেখা পেলো?

-বহুদূরে। ফরেন দেশে।

-কত বড়ো হল?

-অনেক বড়ো।

-ঠিক মতো খেতে পায়?

-ও নিয়ে ভেবো না। খাচ্ছে। নিজের রোজগারে খাচ্ছে। মেলাই রোজগার ওর।

-আমার কথা মনে আছে ওর?

-আছে। তোমার কথা বলছিল যে।

-আর কী দেখলে বিতাং করে বল।

-খুব ভালো ঘরে থাকে। মাছ-মাংস-ফল-দুধ-মাখন সব খায়। খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে ওর। সার্কাসে জোকারি করে ও।

-সার্কাসে? বাব্বারে...। পারে?

-পারে।

ছোটবেলায় হাঁটতে দেরি করিছিল ও। ভারী শরীল, জুত করতি পারত না। ভালো করে কতাও তো ফটেনি মুকে। এখন কতাও ও বলল?

-একটু একটু বলল।

-কি কথা শুনালে, আহা। জয় হরি।

কিছুক্ষণ ছিলাম। বিমলি জিজ্ঞাসা করে দেশে কি ফিরে আসতে পারে? কত বড়ো হল, সঙ্গে কে থাকে... বললাম, শুধু সার্কাসে কী খেলা দেখায় বললাম না।

বিমলি কত কথা বলল-প্রহ্লাদের ছোটবেলাকার কথা। ওর নাম তো প্রহ্লাদ ছিল না প্রথমে। ডিংলা বলে ডাকতো সব। কুমড়ার মতো চেহারা ছিল কিনা। আশ্রমে বাবাজিরা ওর নাম রাখল পেল্লাদ। কারণ পেল্লাদের কিছু হয় না। জলে ফেলে দিলে বেঁচে থাকে, পাহাড় থেকে ছুড়ে দিলেও কিছু হয় না। প্রহ্লাদ ভোগের খিচুড়ি খেত। বড়ো বেশি খেত। বিরক্ত হত। গাছের কলার কাদির দিকে তাকিয়ে বলত,খাবো। এক গোঁসাইয়ের সঙ্গে কণ্ঠীবদলের কথা হ'ল, কিন্তু গোঁসাই বলল পেল্লাদকে রাখা চলবেনা। গোঁসাইরা কেউ কেউ বলল এ ছেলের নাম পেল্লাদ হ'লে কি হবে, এ হ'ল দানো। চোখে-কু আছে। আশ্রমে গোরুর পালান শুকিয়ে গেছে ওর দৃষ্টিতে। বিজয় ডাক্তার বলল, এ এক বদরোগ। দিনে দিনে আরও খাবে সে। নররাক্ষস হয়ে যাবে। এমন সময় সেই লোক দুটো এল। বলল তোমাদের ওই দানো ছেলেটারে আমাদের দাও...।

সেই পেল্লাদ এখন পেংল্যাদ। পেংল্যাদ এখন পপুলার। খুব ভিড় হচ্ছে এখন। দূর থেকেও দেখতে আসছে লোকজন। বিমলিও খবর পেয়ে গেছে এখানে ভিজে হলে পেল্লাদের খেলা দেখা যায়। বিমলি দেখতে এসেছিল। আমার ছেলেরা ওকে ঢুকতে দেয়নি। ওরা জেনেছে পেংল্যাদ বিমলির ছেলে। ছেলের ওই খেলা কী মাকে দেখানো যায়? বিমলি বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল।যারা দেখে ফিরছে, ওদের জিজ্ঞাসা করেছে বিমলি-পেল্লাদকে কেমন দেখলে?

হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল। খামে থাইল্যাণ্ডের স্টাম্প মারা। ইংরিজি চিঠি। আর একটা চেক। চিঠিটায় মৃত্যুসংবাদ আছে। ডলারের চেক। দু হাজার ডলার। চেকটা আমার নামে ভাঙিয়ে ফেলি? আমার নামেই তো চেক। কন্ট্রাকটারিতে দু-নম্বর যি করিনি তা নয়, কিন্তু এই চেকটা নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দিতে খচখচ করতে লাগল। কী করা যায় ? কাউকে কিছু না বলে স্কুলের মিড ডে মিলে কয়েকদিন মুরগি খাইয়ে দি? হরিসভায় আসর বসিয়ে দি? বিমলির ঘরটায় নতুন করে টিন করে দি? বিমলিকে কি করে বলি ছেলের মৃত্যু কথা।

বিমলি আবার এল ভিডিও হল-এ। বলল আজ আমি দেখবই আমার পেল্লাদ। দেখবই। তোমরা দেখতে দাও না কেন শুনি? টিকিট কেটেই ঢুকব।

আমি বলি দেখাব। তোমায় আলাদা করে দ্যাখাব।

ওদের বলি দেখিয়ে দাও। শেষটা দেখিও না।

বুড়ি দেখল ওর পেল্লাদ। একটু দেখিয়েই অফ করে দেয়া হ'ল।

বিমলি যখন বেরিয়ে এল ওর মুখে বাজনা বাজছে। ইউরিয়া খাওয়া লাউগাছের মতো আঁকশি বাড়িয়ে  
আমার হাত ধরল!

বে-এ-শ দেখলাম আমার পেল্লাদকে। খুব আনন্দ পালাম। ও তবে বংশরক্ষাও করতে পারবে, বল?

ও কিছু না।

## প্রায় জ্যান্ত মেশিন বনাম প্রায় মৃত মানুষ

রামকে ভক্তি না করলে নিমকহারামি হবে। রামই তো খোকন মান্নাকে বাঁচিয়েছে। খোকন কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছে একটা ঠিকঠাক রামভজন রচনা করার। গান্ধীজী রামধুন গাইতেন ‘জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ... সব কো সুমতি দে ভগবান’। খোকন এই টাইপের গান গাইতে চায় না। সবাইকে সুমতি দেবে না কুমতি দেবে সেটা রাম বুঝবে। দিনে গড়ে সাতশো টাকার মতো ব্যবস্থা করে দেবার মতো একটা প্রার্থনা গান। ‘...রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ...ডেলি সাতশো টাকা দে ভগবান’। খাতা-ডটপেন নিয়ে বসেছে কয়েকবার, কিন্তু পছন্দমতো একটাও রামভজন লিখতে পারেনি। খোকন যা হোক করে কয়েকটি রচনা করেছে। – যথা

হনুমানের গুরু তুমি দশরথের ছেলে।

কাকিমার চক্রান্তে তুমি বনবাসে গেলে।।

লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিলে আর গেল সীতা।

সীতা যদি না যাইত রামায়ণ বৃথা।। (পাঁচালী ছন্দে)

ধুর কিছু হচ্ছে না বলে এটা বাদ। এরকম আরও কিছু ধুর কিছু হচ্ছে না গুলো এরকম:

১. ভোটের যবে হেরে গেল যাবতীয় বাম

নবরূপে দেখা দিলে রঘুপতি রাম ...

তোমারে লইয়া শিরে, ঘুরি ধাম ধাম

অগতির গতি তুমি পুরাও মনস্কাম। (রঘুপতি রাঘব সুরে)

২. এ আমার রাম দক্ষিণা রামকে জানাই প্রণাম

যার কৃপাতে আমি মোটরসাইকেল কিনলাম। (এ আমার গুরুদক্ষিণা সুরে)

৩. জয় রাম, হাম সেবক তোহারি

মাস মাস চলো কম খাও ব্যাটারি (মীরার ভজন সুরে)

শেষ রচনাটিকে নিয়ে পাঠকের একটু অসুবিধা হতে পারে। ব্যাটারি কী ব্যাপার, কেন লেখা হল ক্রমশ প্রকাশ্য।

খোকন মান্নার দাদা একটা ছোটোখাটো লেদমিস্ত্রি। দেশের বাড়ি হাওড়া জেলায়, কিন্তু কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিট অঞ্চলের খালপাড়ে যে সারিবদ্ধ লেদ কারখানাগুলি আছে, তার একটাতে খোকনের বড়দা কাজ করে। খোকনকেও ওই কাজে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু খোকনের নজর বেশি ছিল অন্য দিকে। লেদ কারখানাগুলিতে যে ছাঁটগুলি হয়, সেগুলো কিনতে একজন আসত। মাসে একবার এসে একটা ছোটো মেটাডোর গাড়ি ভরে নিয়ে যেত। খোকন চেয়েছিল ব্যবসাটা নিজেই করবে। কিন্তু ছাঁট ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্কে ঢুকতে পারেনি। ব্যবসায় অনেক গাঁট। ছাঁট ছেড়ে গুঁড়ো ব্যবসার চেষ্টা করেছিল। লোহার গুঁড়োর একটা চাহিদা হয়

কালীপুজোর আগে। লোহাচুর তুবড়িতে লাগে। আর লোহার ছোটো-ছোটো টুকরোরও একটা বাজার আছে। পেটোয় লাগে। শুধু ভোটের আগেই নয়, এর ডিমাণ্ড সারা বছরই আছে।

বোমার জরুরি উপকরণ হল ‘ইসপিলিন্টার’। পেরেক দিয়ে সবসময় কাজ হয় না। লোহার ছোটো ছোটো টুকরোও লাগে-যা বোমার ভিতর থেকে ‘হাই ইস্পিডে’ ঠিকরে গিয়ে পেরায় পেরায় বুলেটের মতো কাজ করবে। এই ব্যবসাটায় মন দিয়েছিল এবং মোটামুটি ভালো করছিল। লক্ষ্মীও আসছিল। তারপর একটা পেটোর ঠেকে পুলিশের রেইড হয়, কয়েক জন ধরা পড়ে, ইসপিলিন্টার সাপ্লায়ার হিসেবে খোকনকেও পুলিশ ধরে। এগারো দিন জেল-হাজতে থেকে জামিন পায়।

খোকনের বাবার গলায় তুলসীর মালা। খোকনের বাবা বলেছিল তোর ব্যবসায় মন গেছে, ভালো কথা তবে বাপ, অধর্ম করে ব্যবসা করিস নে। খোকন বাপের কথার অমান্য করেনি, ও ধর্ম নিয়েই ব্যবসা করছে। ব্যবসার আইডিয়াটা পেয়েছিল ওর প্রাইমারি বন্ধু ভণ্ডুলের কাছ থেকে। ও জন্মাষ্টমীর আগে কৃষ্ণ সাজত, চৈত্রসংক্রান্তির আগে শিব, কখনো কালী। কালী সাজাটা বেশ ঝামেলার, কিন্তু কালীতে পয়সা আছে-ভণ্ডুল বলেছিল। কালী ঝামেলার কারণ রংটা করতে হয়, জিভটা করতে হয়, বুকটা করতে হয়। টাইট জুতো পায়ে পরার একটা জিনিস পাওয়া যায়, ওটা লাল রং করে নিলে ভালো জিভ হয়। নইলে সুপুরির খোল আলতায় ভিজিয়ে। মাথায় কালো রং করা পাটের চুল, হাতে ছোবড়াসুদ্ধ নারকোল, চোখ-মুখ এঁকে নরমুণ্ড। একটা অন্তত নরমুণ্ড দরকার, নইলে পাবলিক ভয় পায় না, ভয় না পেলে পয়সা দেয় না।

খোকন ইস্কুলে যেমন ইচ্ছা সেজে প্রাইজ পেয়েছিল। ভণ্ডুল যদি সিক্স অর্ড পড়ত, তবে ওটা ভণ্ডুলই পেত। ভণ্ডুল ফোরের পর আর পড়েনি। খোকন ছাই-টাই মেখে সন্ন্যাসী হয়েছিল। পরের বার মাতাল। মাতাল হয়ে ও সামান্য গালাগালও দিচ্ছিল। ও মাতাল হয়ে বলেছিল আমি হলদিয়ার সব চে’ বড়ো শেঠ। আমি হলাম মনতিরি। এটা না বললে বোধ হয় ঝামেলাটা হত না। তখন হলদিয়ার শেঠ বলতে একজনকেই বোঝাত। তেনাকে নিয়ে এ-সব ইয়ারকি ফাজলামি চলে না। ওকে বের করে দেয়া হয়। বের করে দেয়া নিয়ে বিতর্ক হয়। একদল বলে, ও কোনও অন্যায় করেনি। আইটেমটার নাম যেমন ইচ্ছা সাজো। ইংরিজিতে যাকে বলে গো অ্যাজ ইউ লাইক। সুতরাং খোকনের দোষ নেই। অন্যরা বলল-তাহলে কেউ হেডস্যার হয়ে আমাদের হেডমাষ্টার মশাইকে মিমিক্রি করবে। হেডমাষ্টারের মতো বগল চুলকোবে, আর বলবে পেটে বড্ড গ্যাস হয়েছে গা...সেটা ভালো হবে? তার চে’ এটা তুলেই দাও। এটা কোনও খেলাধুলোই না। তারপর খোকন আর কিছু সাজেনি, তবে সন্ন্যাসী সেজে দেখেছে ছাই মাখলে বড্ড গা চুলকোয় আর আঠা দিয়ে চুলদাড়ি আটাকলেও বড্ড চিড়িক-চিড়িক করে। সঙ সাজাতে ঝামেলা আছে।

ভণ্ডুলের বাবা ঘর ছাওয়ার কাজ জানত, ভণ্ডুল শিখেছিল কিন্তু ঘর ছাওয়ার কাজ এখন কম। খড়ের ঘর প্রায় উঠেই গেছে। ও রাজমিস্ত্রিদের জোগাড়ের কাজ করে, আর মেলা-পরব-পার্বণে ঠাকুরদেবতা সাজে। ও বলেছে ঠাকুরদেবতাতেই পয়সা বেশি।

খোকনের বাবা যখন বলেছিল ব্যবসা ভালো, কিন্তু ব্যবসায় যেন ধর্ম থাকে, তখনই ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে এই আইডিয়াটা মাথায় আসে। খোকন ওর দাদাকে বলে-দাদা, লেদের কাজ আমার পোষাবে না, আমার ধর্মে মতি হয়েছে। আমায় একটা দ্যাবতা বানিয়ে দাও। বডি থাকবে, হাত-পা থাকবে। আমি

কুমুরটুলি থে’ কয়েকটা দ্যাবতার মাথা কিনে রেখে দেব। আর প্যাটের ভিতরে একটা ম্যাশিনের ব্যবস্থা করে দিও, সেই ম্যাশিনে হাত-পা নড়বে। খোকনের দাদা হতভম্ব। কি চায় ছোটোভাই ঠিক বুঝতে পারল না। খোকন বলল, শোন তবে, বুঝিয়ে বলি।

এই যে আমাদের হাত, এই হাতের মর্মটা বুঝতো? সেই ছোটোবেলায় পিসিমা বলত হাত ঘুরালে নাড়ু দিব নইলে নাড়ু কুথায় পাব? বলত কিনা? শোলে সিনিমার ডায়ালগটা মনে কর। ইয়ে হাত নেহি ফাঁসি কা ফান্দা হয়। এই হাত চিহ্নে ভোট দে’ছ-আচ্ছা দাও নাই। কিন্তু কালো হাত ভেঙে দ্যাও ক’ছো কিনা? এই হাত দে খেলা, ঘুড়ি উড়ান যাবতীয় কাজকন্মো সে সব সবাই জানি। কিন্তু এই হাতটা, দ্যাবতাদের জন্য খুব ইমপটেন। দেখবা সব দ্যাবতাদের হাতের কায়দা আলাদা আলাদা। কার্তিক এইরকম, গণেশ এইরকম, দুর্গা এইরকম, দশ হাতের মধ্যে দুই হাতটা ত্রিশূল মরার কায়দায়, কৃষ্ণ এইরকম বাঁশি বাজানোর কায়দায়... খোকন তার নিজের হস্তসজ্জায় বিভিন্ন দেবতার হাতের কায়দা দেখাতে থাকে। এবার শুন দাদা। বেশিরভাগ দ্যাবতাদের একটা হাত এইরকম।

ভোট চিহ্নের হাতের মতো সংলগ্ন করে হাতটা এগিয়ে দেখায় খোকন। এর কী মানে বুঝল। এর মানে হল কুন ভয় নাই, আমি আছি।

দেবতাদের আমরা হাতে বুঝি, সিটা বুঝালাম, এবার বুঝাই মনীষীদিগকে আমরা কীভাবে বুঝি। যেমন দেখ শ্রীগৌরান্দ। হাত দুটা উপরে এইভাবে তোলা, যিশুখ্রিস্ট হলে হাত দুটা তোলা থাকবে কিন্তু হাতের পাতা দুটা বেঁকা থাকবে। কিংবা দু’হাত কাঁধের সঙ্গে লম্বা। সোজা। এরকম। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের একটা হাত মাথার উপরে এইরকম, আর একটা হাত বুকের কাছে এইরকম। উপর থেকে হাত ইবার নিচে নামাচ্ছি। কবি সুকান্তর হাতখানা গালে। স্বামী বিবেকানন্দর হাতদুটো বুকে, একটার উপর একটা। এইভাবে। নেতাজী একখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখেছেন। গান্ধীজীর একটা হাত বাড়ানো। কিন্তু লাঠি ধরার মতো। রবীন্দ্রনাথের হাত দুটো পিছনে। কেমন কিনা? বলে-বৃক্ষ তোমার নাম কী? -না ফলেই পরিচয়। তেমন মনীষী তোমার নাম কী-না হাতেই পরিচয়।

এইবার আসল কথাটা বলি। একটা পারমেন বডি বানাতে হবে। আর হাত দুটো দু পাশে। পা নিয়া অত ভাবনা নাই। প্যাটের মধ্যে ম্যাশিন থাকবে। তার সঙ্গে সুতো থাকবে। বা তার। সেটা হাতের সঙ্গে ফিট। হাতদুটো আলাগা, উটা কান্ধের সঙ্গে ফিট। হ্যাণ্ডেল থাকবে, কিংবা সুইচ থাকবে। কারেন্টে ম্যাশিন চলবে। যেমন মহিষাদলের রাজবাড়ির ঝুলনে হয়। কংসরাজা পেলাদকে ছুঁড়ে দেয়, কেষ্ঠঠাকুর কদমগাছে গোপিনীদের কাপড় চুরি করে ঝুলিয়ে রেখেছে, গোপীগণ হাত নেড়ে বলছে অমন কোরোনি, কাপড় ফিরায়ে দাও। রামচন্দ্র হরধনু উঠিয়ে দিল, নারায়ণ সুদর্শন চক্র ঘুরিয়ে দিল, কিষ্ঠঠাকুর গোবর্ধন পাহাড় উঠিয়ে দিল, সবই একটা মোটর আর সুতার খেলা। কতগুলি গাঁট আর ঘাট করতে হবে, ব্যাস। আর ঘাড়ের উপর একটা চাকতি থাকবে সেখানে একটা স্লট করতে হবে, যেন মুণ্ডুখানা বসিয়ে দেয়া যায়। একদম খাপে খাপ। দরকারমতো মুণ্ডু চেঞ্জ করে দেব। শিব, কৃষ্ণ, রাম, হনুমান। কালী-মনসাও। ফিমেলদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে পোশাকের ভিতরে। পোশাক তো লাগবেই। মহাদেবের জন্য বাঘছাল ছিটের কাপড়,

কৃষ্ণের জন্য ইলিক-ঝিলিক কাপড়, হনুমানের জন্য রোঁয়া ওঠার কম্বলের ড্রেস-সে-সব পরে হবেখনে। গলার চাকতিখানা নড়বে এধার-ওধার, আর মুণ্ডুখানাও ঘুরবে ডান দিক বাঁ দিক। উপর নিচ।

হ্যাঁ, আর একটা জিনিস ফিট করতে হবে। একটা ইসপিকার, সেটা মুখে রাখা যাবে না, কারণ মুখ তো পালটাবে। পেটে জালি কেটে দিয়ে, তার পিছনে স্পিকার ফিট, আর পেনড্রাইভটা পোঁ-পেছনে গুঁজে দেব। ওখানে ওঁ স্বস্তি, দীর্ঘজীবী হও বেটা, জয় শ্রীরাম সব ঠিক হো যায়গা, হরি-ই বোল, এসব কথা থাকবে। একটু অনুপ জালোটাজীর ভজনও পুরে রাখব, হনুমানের পেট থেকে রামভজন বেরুবে।

খোকনের দাদা তপন মান্না বলল যা ফিরিস্তি দিলি, খরচা আছে কিন্তু...

খোকন বলল, সে আমি দিয়ে দেব। একবার না পারি কিস্তিতে দেব। ধম্মপথে থাকলে পয়সা আসবে।

ভগবান মানুষ তৈরি করেছিল। ধর্মপথে থাকবার জন্য মানুষ ভগবান বানালো। সেমিটিক ধারণায় ঈশ্বর মাটি দিয়ে মানুষ বানিয়েছিল আর শয়তানকে আগুন দিয়ে। এরা লোহা দিয়ে বানালো। লোহার পাত। আগুনও লেগেছে বৈকি। ওয়েল্ডিং করতে হয়েছে তো।

দশ নম্বর গ্যালিফ স্ট্রিটের সম্মুখবর্তী ফুটপাথে দেবতার জন্ম হল। তিনি একের মধ্যে বহু। তিনি বহুরূপে বিদ্যমান, আদতে এক-এই শাস্ত্রবচন সত্য প্রমাণ করে দেখালেন লেদমিস্ত্রি তপন কুমার মান্নার নেতৃত্বে তিন-চার জনের একটি দল। এরমধ্যে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি আছে, পেটাই কারিগর আছে, মোটর গ্যারেজের ‘ইলেকট্রিক মাস্টার’ ব্যাটারিআখতারও ছিল। গাড়ির সাউণ্ড সিস্টেমের ব্যাপারটা আখতার খুব ভালো বোঝে।

দেবতার পেটে ইসপিকার ফিট করা, পেছনে পেনড্রাইভ পয়েন্ট। ভিতরে ব্যাটারি রাখার খুপরি আর চার্জ দেবার ব্যবস্থা-সব এই টিমটা সাফল্যের সঙ্গে করল। এইজন্যই তো বলে বাঙালির প্রতিভা বিশ্বসেরা। এই যে দেবতাটির জন্ম হল, এর বুকের মধ্যে অনায়াসে একটা ‘ব’ লোগো বসিয়ে দেয়া যেত।

খোকন মান্না এবার ধর্মপথে নেমে পড়ল। হাত-পা আলাদা করে একটা বাক্সে ভরে মেলায় মেলায় ঘুরতে লাগল।

শুরু করেছিল গঙ্গাসাগর মেলা দিয়ে। জটাওলা মহাদেবের মুখ ঘাড়ে বসানো ছিল, কাঁধে রবারের সাপ, পেনড্রাইভের বোম বোম বোম বোম পেটের স্পিকার থেকে বের হচ্ছে। মাঝে মাঝে ডান হাতটা তুলে সামনের দিকে, ওঁ তৎসৎ শব্দ বেরুচ্ছে। মানুষ পয়সা দিচ্ছে। সাধু বাবারাও অবাক হয়ে দেখছে। যন্ত্রের মহাদেব যখন ওঁ তৎসৎ বলছে, সাধুবারাও জয় জয় মহাদেও, জয় শিবশংকর এই সব বলছে। খুব মজা লেগেছিল একটা জ্যাস্ত মহাদেবকে দেখে। মানে, ভণ্ডুলের মতোই কেউ মহাদেব সেজেছে, সে অবাক হয়ে মেশিন মহাদেবকে দেখলে। হাতজোড় করে প্রণাম করল, আবার একটাকার কয়েনও ফেলে দিল। মেলা থেকে মেলা ধর্মপরিক্রমায় খোকন দেখেছে, একেকটা মেলাতে একেকটা দেবতার ক্রিয়া বেশি হয়। রাস-জন্মাষ্টমীর মেলায় মহাদেব চলে না, কৃষ্ণ। চড়ক মেলায় শিব, তারাপীঠে কালী বানিয়েছিল, পাণ্ডুরা সরিয়ে দিয়েছে। পাণ্ডুরা তারামায়ের কোনও শরিক বরদাস্ত করে না। অগত্যা রাম লাগিয়েছিল। রাম এখন সর্বত্র চলে। কাজ শুরু করার পর পর শোনপুর, পূর্ণিয়া, বক্তিয়ারপুর, ধানবাদ এ-সব মেলায় গিয়ে দেখত রাম আর হনুমান বেশি কৃপা করে। মানে, ওরাই বেশি পয়সা দেয় আর কি। আজকাল রাম আর হনুমান এধারেও ভালো কৃপা করছে। জয়দেবের মেলা, উদ্ধারনপুরের মেলা, মহিষাদলের রথের মেলা, পরকুলের মকর

মেলা, এমনকি শান্তিনিকেতনের পৌষমেলাতেও রাম এবং হনুমান ভালো খাচ্ছে। খোকন ভাবল এতগুলো মুণ্ডু, এতরকম পোশাক বইবার দরকার নেই। মিছিমিছি বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি। রামেই যখন পয়সা হচ্ছে, রামটাই ভালো করে করা যাক। গায়ে একটা বেশ সবুজ কালার পেন্ট করিয়ে, গলায় রত্নহার দিয়ে, কাঁধে ধনু, পিঠে একটা বেতের লম্বাপানা বুড়িতে তির। পেটের স্পিকার থেকে সব সময় ওঁ ধ্বনি, মাঝে মাঝে হাতটা সামনের দিকে উঠে গেলে দীর্ঘজীবী ভব, কিংবা হরি তৎসৎ, আর মাঝে মাঝে ভারতমাতা কী জয় লাগিয়ে দিয়ে দারুণ রেজান্ট পেল খোকন। বিশেষ করে বিহার আর ওড়িশ্যার মেলাগুলিতে। কপালে তিলক পরা লোকগুলি রামের মুখে ভারত মাতা কী জয় শুনে কেয়া বাত কেয়া বাত করে ওঠে। দশ-বিশ পঞ্চাশ এমনকি একশো টাকার নোটও ছুঁড়ে দেয়। মুখে সবুজ রং মেখে সঙ সাজা মানুষ রাম এত রোজগার করতে পারে না। মানুষ মানুষের চাইতে মেশিনকেই ভালোবাসে। মানুষ রামের চেয়ে মেশিন রামই বেশি রোজগার করতে পারে, এটা খোকন মান্নার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

অল্পদিনের মধ্যেই মেশিন-রামের কৃপায় খোকন মান্নার বেশ ভালো রোজগারপাতি হল। খোকন রামভক্ত হয়ে পড়ল। রামের নানা রূপ। বোতল রামও একটা। খোকন রামসেবা করতে লাগল, এবং প্রথম যে রামভজন গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সে সবই ভক্তিবোধের ফসল। খোকন মান্নার সুরজ্ঞান ভালো নয়। কিন্তু রামরসে ভক্তিভাব প্রবল হলে খোকন গেয়েও ওঠে –রাম তেরা বিন দিন মেরা না গুজরে। তখন ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা মেশিন রাম বলে-বহোত বহোত আচ্ছা। বহোত খুশ হুয়া ম্যায়। সে কী গো রাম, তুমি কথা বললে? আমি তো ভাবতেই পারছি না। আরও দুটো কথা বলো। খাঁটি বাংলায় মিনতি জানায় খোকন। কিন্তু রাম আর কথা বলে না। রাম বোধ হয় বাংলাটা বুঝতে পারছে না। অযোধ্যায় জন্ম কিনা...। কিন্তু এই রামের জন্ম তো বাগবাজারে। এতো বাগবাজারি রাম। বাংলা তো বোঝা উচিত। হে রামজী, আপ বাংলা নেহি সমঝাতে? বাংলা বহোত আচ্ছা ভাষা হ্যায়, মিঠি ভাষা হ্যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কা বাংলা, নজরুল কা বাংলা। আপ বাংলা নেহি জানতে? আপ কেতনা বড়া দেবতা হ্যায়। কেতনা পাওয়ার হ্যায়। রাবণজীকা ভাই বিভীষণ শ্রীলঙ্কা ল্যাংগুয়েজ সমঝ লিয়া, লেकिन বাংলা কাঁহে নেহি...। মেরা হিন্দি আচ্ছা নেহি হ্যায় রামজী। আপনি দয়াময়। আমাকে দুটো পয়সার মুখ দেখাচ্ছেন। আমি তো ফুল বেকার ছিলাম রামজী, ছাঁট লোহার একটা ছোটো বিজনেসে ফেঁসে গেলাম, তারপর তুমিই তো আমাকে বাঁচালে।

চোখ দিয়ে জল গড়ায় খোকনের। রামভক্তি সুধারস। রামের পায়ের তলায় শুয়ে পড়ে খোকন। পাটা জড়িয়ে ধরে।

কী হল? পাটা সরিয়ে নিলেন নাকি শ্রীরাম? খোকনের তো তাই মনে হল।

খোকন বলল, হে রামচন্দ্র, কেন বঞ্চিত করো চরণে...। রেডিওর গানটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ একেবারে খাপেখাপ টাইমে। রামচন্দ্র বলল-লজ্জা দিও না বস, তুমি আমার সখা। তুমি তো বন্ধু। পা ধরছ কেন?

তা বললে কি হয়? তুমি যখন জাগ্রত হয়েই গেছ, আমি প্রণাম করবই। খোকা পা আঁকড়ে ধরতে চায়। আবার পা সরিয়ে নেয় রাম।

অবশেষে জয়রাম জয়রাম করতে করতে রামের পায়ের কাছেই ঘুষিয়ে পড়ে। পরদিন আবার রামকে নিয়ে হাটে যায়। হিন্দু-মুসলমান সবাই পয়সা দেয়। মোসলমানরা কি ভক্তির পয়সা দিয়েছে? রগড়ের পয়সা। কিন্তু



বিনে পয়সায় তো রগড় দেখতে পারত। কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। খোকন বাড়ি ফিরে রামভজনা করেছে। একবাক্স লাড্ডু কিনে ডালা খুলে রামের সামনে রেখেছে, তারপর শুয়ে পড়েছে। সকালে উঠে দেখল-দুটে লাড্ডু নেই। লাড্ডুর গুঁড়ো ছড়ানো-ছিটোনো।

খোকন বাড়ির লোক, প্রতিবেশী সবাইকে দেখাল। কেউ কেউ বলল বটে হুঁদুরের কাজ, কিন্তু অনেকেই বলল-এখন রামের হাওয়া চলছে, সেই হাওয়ায় রামও চলে আসতে পারে। দেব-দেবী-অবতার-মন্ত্রীরা অনেক কিছু করতে পারতে পারে।

এতে করে খোকন মান্নার রাম বিখ্যাত হয়ে গেল। ভালোই পয়সা পিটতে লাগল। আজ এ-হাটে কাল ও-হাটে ঘুরছে। রামের সেবা করছে হনুমানের মতোই। শ্রীরামের পেটের ব্যাটারিতে নিয়মিত চার্জ দিচ্ছে, ব্যাটারিতে জল দিচ্ছে, পুলি-লিভারে তেল দিচ্ছে। ড্রেস পালটে দিচ্ছে এবং গায়ত্রী মন্ত্রর পেনড্রাইভ রামের পশ্চাতে গর্তে গুঁজে দিচ্ছে, ওর ঘরে এখন সর্বক্ষণ রামচরিতমানসের সিডি বাজে। চাইনিজ খায়, কোক খায়। রামের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়। সীতার বাপারে রাম যে একটু ভুল ডিসিশন নিয়েছিল, সেটাও একদিন বলে। রামের প্রসাদী রাম নিয়মিতই খায়।

এবার একটা বিয়ে করতেই পারে।রামই আদেশ দিয়েছেন।তবে বিয়ে করে ঘরে থাকাটাই উচিত।  
বাক্সপেটরা নিয়ে মেলা থেকে মেলায় ঘুরলে নববধূ কি একা থাকবে?

খোকন ঠিক করে লাইন পালটাবে।

একদিন রাতে একটু ভাবসমাপ্তি হলে খোকন মান্না হাতজোড় করে নিবেদন করল

(রামপ্রসাদীর সুরে )

হে রঘুপতি রাঘব

আমার মনের কথা কব

বলি এবার গৃহস্তি হব

বল আমাকে ঘুরাবি কত-

মোটরের চাক্কির মতো

তোমার অনুমতি যদি পাই হে রাম,

হব সংসার ধর্মে রত।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন-তাতা বটেই। তোমার বিয়ের বয়েস কবেই হয়ে গেছে। গৃহস্তি ধর্ম বড়ো ধর্ম। তুমি বিবাহের পুষ্প প্রস্তুতি করো।

খোকন আবার গাইল :

বড়ো দয়াময় তুমি হে রাম

তোমাকে থ্যাংকিউ দিলাম

তোমার অনুমতি পেলে পরে

তোমায় আমি বেচে দিয়ে

দীঘায় গিয়ে হোটেল দিতাম।

শ্রীরামচন্দ্র তখন ছড়া কেটেই বললেন—

আপনি আমার মালিক

আর আমি হলাম মাল

আমায় রাখবেন না বেচবেন

তার আমি কি বলব বাল?

খোকন বুঝলে রামচন্দ্র রেগে গেছেন। খোকন বলল, হে রাম মুখ খারাপ করছেন কেন? আপনি তো সত্ত্বগুণের লোক। আমি ভাবছিলাম—যদি একটা হোটেল দি, আপনার যত্ন হবে না। যে নেবে তাকে বলব রোজ রামচরিত মানসের সিঁড়ি বাজাতে, ভোগ দিতে, মালা দিতে। ও যদি আপনাকে নিয়ে মেলাতেও যায় আমার মতো, সে তো আপনারই ভালো। কত জনসংযোগ...।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—

অভিমান হুঁৎএছিল ক্ষণিকের তরে,

চেক করে লইয়াছি অতি ত্বরায় করে।

তোমার কার্যসিদ্ধি হইয়াছে এবে।

নিজস্বার্থ প্রত্যেকেই বুঝে লয় ভবে।

কি আর বলার আছে। কী-বা কব আর

তোমাদেরই হস্তে গড়া রাম অবতার

মোরে বেচিবে না মন্দিরিবে তুমি করো ঠিক

আমি রাম, মাল মাত্র তুমিই মালিক।

সামান্য নিবেদন করি করজোড়ে

সের দরে বেচিও না কালোয়ার ঘরে।

হাতুড়ি পিটানি আমি সহিব কেমনে

নাকি গলাইয়া দিবে মোরে তাই বা কে জানে!

খোকন বুঝল এই রাম সত্যিই জাগ্রত। নইলে ব্যাথলাগার কথা বলছেন কেন? একবার মনে হল—শাস্ত্রে দেহ কিছু নয়, সামান্য ভাণ্ড মাত্র। রাম দেহ নিয়ে এত ভাবছেন কেন? আচ্ছা, মুণ্ডুটা চেঞ্জ করে যদি কার্তিক করে দেয়া যায়। যদিও কার্তিক ওর স্তকে ছিল না, কৃষ্ণ ছিল। কৃষ্ণর মুণ্ডু বসিয়ে দিলে কি হয় দেখতে ইচ্ছে করল।

কিন্তু ঘাড়ে রামের মালা এঁটে বসে আছে। সরানো যাচ্ছে না।

তবে কোনও সন্দেহ নেই এই রাম মহিমাবান।

খোকন মল্লিক বাইরে বলতে লাগলো এটা কথা-বলা রাম। লোকে বলে জানি তো পেটে ইসপিকার পিছনে পেনডেরাইড। খোকন বলতে চেয়েছে—তা নয়, অন্য কথাও রামের সঙ্গে হয়। লোকে বিশ্বাস করেনি। একজনই বিশ্বাস করল, ওর নাম হারুন শেখ। ছেলোটো বেকার। টুকটাক ব্যবসাপাতি করে। আনাজপাতি, গুড়, মাছ যখন যা হয়। হারুনের ডাকনাম হারু। খোকনের গাঁয়ের ছেলে। খোকনের চেয়ে বয়সে একটু

ছোটো। বে-থা করেনি। অবস্থা আর একটু ফিরলে ও-সব করবে। তবে এই মেশিনরাম যে খোকনকে কৃপা করে খোকনের অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে, ও শুনেছে। খোকনদা এটা বেচে দিয়ে হোটেল করে থিতু হতে চায়। হারুন ভাবে ওকেও তো হাটেবাজারে ঘুরতে হয়, ও না হয় লাউ-কচু-কুমড়ো না নিয়ে রাম নিয়েই ঘুরবে। কচু-কুমড়োর চেয়ে রামেই পয়সা বেশি হবে সেটা হারুন ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছে।

হারুন খোকনকে বলে-তোমার রাম অন্য কারার কাছে বেচো না, আমি বলে রাখলাম বেচলে আমাকেই বেচবে।

খোকন বলল, দাম দিতে পারবি?

হারুন, মানে হারুও তো বেচাকেনা করে খায়। ও দরাদরি জানে। ও বলে কত আর দাম হবে? সলিড লোহা তো নয়, ভিতরটা ফাঁপা। পাতলা চাদরে বানানো। পনেরো কেজির বেশি হবে না। যন্ত্রপাতির দামও ধরে নাও। কত আর হবে? খোকন বলে শুধু লোহা আর যন্ত্রপাতি, ব্যাস?

হারু সংশোধন করে হ্যাঁ হ্যাঁ। মেকিং চার্জও আছে।

খোকন বলে-হয়ে গেল? মহিমার দাম নেই? দেবত্বর দাম নেই?

হারু বলে-সে আর কত।

খোকন বলে-আরে তুই দেবত্বর কী বুঝবি! এই রাম খুব জাগ্রত হয়ে গেছে। অনেক টাকা দাম হয়ে গেছে এখন। খোকন আর-এক ধাপ উপরে উঠলে হয়তো বলত ভ্যালু অ্যাডিশন হয়ে গেছে।

হারু বলল-বুঝেছি। গুডউইলের কথা বলছ, সে জন্য না হয় কিছু ধরে দেয়া যাবে।

খোকন বলল, গুডউইল নয় রে, দেবত্ব। দেবত্ব। তুই এর মর্ম বুঝবি না। তোদের ধর্মে এসব থাকে না।

হারু বলে-ধর্মের কথা আসে কেন? মোসলমানের ছেলে বলে আমার কাছে যদি রাম বেচতে না চাও তবে আমার বলার কিছু নেই। তবে যদি...

খোকন খেঁকিয়ে উঠল।-বিজনেসে ধর্মের কথা আসে কেন? ধর্ম নিয়ে বিভেদ আমার পছন্দ নয়। যে আমাকে উপযুক্ত দাম দেবে, আমি রাম তাকে দেব। বিজনেসে ধর্ম ঢোকাতে আমি রাজি নই।

খোকন রামের মহিমার কথা প্রচার করেছিল, এটা করে দুটো পয়সা করেছে খোকন, সেটা নিয়ে কিছু বলার নেই। ম্যাজিক দেখিয়ে বা পুতুল খেলা দেখিয়ে যে-কেউ পয়সা করতেই পারে।

যে দু-এক জন কিনতে চেয়েছিল, তারা মহিমার জন্য বেশি পয়সা যোগ করেনি। বলেছে এটা বানাতে তোমার যা খরচ হয়েছে সেটা দুব আর না হয় দুশো বেশি ল্যাও। তার চেয়ে হারুর কাছেই বেশি টাকা পাওয়া গেল। তাই হারুকেই বেচে দিল।

একজন পড়শি বলল,এটা কিন্তু ঠিক হল না। একজন মোসলমানের কাছে রামকে বিক্রির করা ঠিক হল নি। খোকন বলতেই পারত-এই রামকে যারা তৈরি করেছিল সেইটি যে একটা মুসলমান ছিল। কিন্তু বলল-রাম কোন যুগে জন্মেছিল? ত্রেতা যুগে। আর মোসলমান ধর্ম হয়েছে কলিযুগে। রামের সময় মোসলমান ধর্মই ছিল না। সুতরাং রাম মোসলমান কি ব্যাপার কী বৃত্তান্ত জানেই না। তাছাড়া তুমি যখন কিছু বিক্রির করো কারো কী ধম্মো জেনে বিক্রির করো?

এবার হারুন শেখ ধর্মপথের পথিক হল। মানুষ দেখে তো ধর্ম বোঝা যায় না। গাঁয়ের লোকজন হারুনের ধর্ম জানে, কিন্তু বাইরের লোক তো জানে না তা। খোকনের পথেই হারু ওই মেশিনে রামের লীলা দেখাতে লাগল। এবং সত্যিই কচু-কুমড়োর চেয়ে বেশি পয়সাই দিতে লাগল। হাতে দুটো পয়সা আসায় একটু শখ আহ্লাদ গজাতে লাগল। একটু বিলিতি-টিলিতি...

বিলিতির মধ্যে আবার রামটাই সস্তা। খোকনও বলেছিল-রামচন্দ্রর সঙ্গে কথা বলতে গেলে একটু রামপ্রসাদ খাস। তাছাড়া খোকন যা-যা বলেছিল তাই-তাই করার চেষ্টা করেছে। রামধুন, ধূপকাঠি, সব। আর রামশরণ নেবার পর থেকে বিবেকের আহ্বানে বড়ো গোস্ত খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে হারু। তবে রামকে-মানে রামের শরীরটা একটু অন্যভাবেও ব্যবহার করে হারু। যখন অরিজিত সিং, শ্রেয়া ঘোষাল, কুমার শানু শুনতে ইচ্ছে হয়, তখন রামের পিছনের সকেট আর পেটের স্পিকারটা ব্যবহার করতেই হয়। তাতে রাম কিছু মনে করেন না। সেটা বলেও দিয়েছেন তিনি। শরীরটা কিছু নয়। হস্ত পদং শরীরং কীসব বলেও ছিলেন শ্রীরাম, অত মনে নেই। হ্যাঁ, রামের সঙ্গে হারুনের একটা কথা হয় বৈকি। খোকনদা মিথ্যে বলেনি। রাম তো বলেছে হারুকে-পারতিস তোরা, তাদের নবিকে নিয়ে এসব করতে! দেহের ছাল ছাড়িয়ে নুন লাগিয়ে দিত। হারু বলেছে- একদম ঠিক কথা বলেছেন স্যার।

কাছাকাছি মেলাস্থলগুলি ঘোরা হয়ে গেল।কয়েকটি অঞ্চল বাকি আছে। মুসলমান-প্রধান হাটগুলিতে শতকরা ৭০-৮০ জনই মুসলমান।ওসব জায়গায় একদম যাওয়া হয়নি। ওখান থেকে ভালো রোজগারপাতির সম্ভাবনা আছে।

হারু ভাবল ওসব জায়গায় যাবে।

প্রথমে করিমপুর।

পেনড্রাইভে নতুন কয়েকটি কথা সংযোজন করল। দোকানে বললেই পেনড্রাইভে ভরে দেয়। যেমন কলেমা। লা-এলাহা ইলাল্লাহো মোহম্মাদুর রাসুলউল্লাহ। কয়েকটা দোয়া। সোভানাকা আল্লা হোম্মা অ বেহামদেকা...। তাছাড়া আর একটা কাজও করেছে হারুন।এক গ্রাম্যকবির মুখে শোনা দুটো লাইন ও পেনড্রাইভে দুঃসাহসিক ভাবে ঢুকিয়ে নিয়েছে।

সীতারে তালাক দিয়া বড় মনস্তাপ

হে আল্লা হে আল্লা তুমি করো মোরে মাপ।

এইসব হাটে যখন রামকে নিয়ে যায়,রামের মাথায় একটা টুপি পরিয়ে দেয়। রামের পেট থেকে দোয়াদরুদ, কলেমা বের হয়। আবার মাঝেমাঝে সীতারে তালাক দিয়া বড়ো মনস্তাপও শোনা যায়। আবার তৎসৎ কিংবা গায়ত্রী মন্ত্রও পুরো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

বেশ সুখে আছে হারুন শেখ।

আহা রামরাজ্য এমনই।

একদিন খোকন মান্না রাত্রিবেলা হারুন শেখের বাড়ি এল। একটু টলছিল।

প্রসাদ নিয়েছে।খোকন বলল-আমার শ্রীশ্রী রামচন্দ্রকে দেখতে এলাম।

হারুন বলল-ভালো কথা। দেখবে এসো।

জয় শ্রীরাম।

ভেতরে যায়।

প্রসাদ পায়।

খোকন রামের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে সে কী? মাথায় টুপি, মুখেতে দাড়ি? রামের থুতনিতে দাড়ি  
গজালো কী করে? তুই শালা দাড়ি পরিয়েছিস নাকি?

হারুন বলল রাম বড় দয়ালু। কোনরকম আপত্তি করেনি। ভক্তের ভালো চান তিনি। ব্যবসা করি দুটো  
খাই। রামচন্দর সেডা বোঝেন কিনা।

## বহুজাতিক

আধ্যাপক সমাদ্দার দক্ষিণের বারান্দায় সিনট্যাক্স জলট্যাক্সির ছায়ায় একটা সাধারণ ইজিচেয়ারে শুয়ে গীতা পড়ছিলেন, এ সময়ে কলিংবেল বাজল।

অধ্যাপক সমাদ্দার নিজেই দরজা খুলতে গেলেন। তিনি একজন বিশ্ব বিখ্যাত অসাধারণ বিজ্ঞানী হলে কী হবে, অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন। সন্টলেক এলাকায় সরকার একটা বাংলা দিয়েছে তাতে ছ'খানি ঘরের তিনটি অব্যবহাত। রান্না ব্যাপারটা কেমিস্ত্রি, ফিজিক্স, বটানি, জুলজির সমন্বয় বলে প্রায়শই ওটা নিজেই করেন। একটি সাধারণ তক্তপোশে ঘুমান। একটি সাধারণ কলমে সাধারণ কাগজে অসাধারণ অঙ্ক করেন।

পদার্থের অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎসেচকরূপী একটি নতুন কণা আবিষ্কার করেছেন তিনি, কণাটির নাম ড্যারন।

আসলে ওটা সমাদ্দারন। সত্যেন বোস আবিষ্কৃত কণাটি যেমন বোসন। বিশ্ববিজ্ঞান কংগ্রেসে ইঙ্গ-আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মুখে সমাদ্দারন ঠিক আসছিল না বলে ওরা একটা রেজিলিউশন নিয়ে ওটাকে ড্যারন করে নিয়েছিলেন। ড্যারন কণিকার জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। শুধু ড্যারনই নয়, আরও বহু যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তিনি পৃথিবীবিখ্যাত। ওজন গ্যাসের সাহায্যে ভোজন নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বের ফলে স্লিমপত্নী সুন্দরীরা খুবই উপকৃত। সদ্যপ্রসূত বাছুরের প্রতি গাভীসত্তার হাম্বা ডাক বিশ্লেষণ করে বাৎসল্যের জন্য নির্দিষ্ট শব্দতরঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। এজন্য গোপূজারিদের কাছে ডঃ সমাদ্দার অত্যন্ত সমাদৃত। ওই গোমাতার হাম্বা শব্দের বিশ্লেষণ তাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। তার ওই আবিষ্কার নানাভাবে কাজে লেগেছে। যেমন রোবট মায়েদের কণ্ঠে বাৎসল্য আনতে। ছাগলের নাদির পালিশ এবং তাদের আকারের সমতার নতুন ব্যাখ্যা ওষুধ নির্মাতাদের কাজে লেগেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেশিরভাগ পেটেন্ট আমেরিকা কবজা করে নিয়েছে। এ নিয়ে ওঁর খুব একটা আফশোশ নেই। সন্ন্যাসীপ্রতিম এই মানুষটি টাকা মাটি টাকা- তত্ত্বে বিশ্বাসী। ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ তাকে প্রচুর অর্থ সহ নাগরিকত্ব দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি হেলায় ত্যাগ করেছেন। তিনি যা টাকাপয়সা উপায় করেছেন, এখনও যা আয় হয়, তার সামান্য অংশ নিজের জন্য রেখে বাকিটা বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যয় করে দেন। তিনি একটা প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা। প্রভা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ। প্রচুর প্রতিভাবান সেখানে গবেষণা করে। প্রভা ওঁর মায়ের নাম। তিনি অকৃতদার। বিদেশে গিয়ে দু-চারবার ওয়াশিংটন ছাড়া কোনোরকম মদ্য স্পর্শ করেননি। গত পাঁচ বছর যাবৎ নিরামিষ খান। বাড়িতে প্রচুর বই, একটি সেতার, একটি কম্পিউটার, তক্তপোশ, ও সোফাসেট। সোফা সেটটি রাখতে হয়েছে অতিথিদের জন্য। সারা পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষেরা আসেন। একটিমাত্র কাজের লোক, দীর্ঘদিনের, নাম কানাই, এই সময়টা ও একটু বেরোয়। হাতে একটা বাজারের থলে থাকে যদিও, তবে বাজারে নয়, ও স্কুলের দিকেই যায়। এই সময়ে সব মায়েরা ওদের বাচ্চাদের নিতে

আসে। স্কুলের সামনে অপেক্ষা করে ওরা। কানাইও একটু অপেক্ষা করে সেখানে। ওটাই ওর ফ্যাশন টিভি, এনার্জি ক্যাপসুল, আনন্দলোক।

কানাই এখন নেই, তাই ড. সমাদ্দার নিজেই দ্বার খুললেন এবং দেখলেন এক পরমাসুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে তার মায়াবী হাসি, ঘাড়ের তার কেশরাশি। বললেন নমস্কার স্যার, আমি এফ ডি আই থেকে আসছি। ফ্রি ড্রিম ইন্টারন্যাশনাল। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। মেয়েটির হাতে ল্যাপটপ। ড. সমাদ্দার ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

ওই সুন্দরী মহিলাটি সোফায় বসে প্রথমেই নিজের ঠোঁটদুটো ঘষটে নিলেন। ড. সমাদ্দার দেখলেন পদার্থবিজ্ঞানের একটি সাধারণ ব্যাপার। হোমোজিনিয়াস ডিস্ট্রিবিউশন অফ ম্যাটার। লিপিস্টিকের ফিল্মটাকে ঠোঁটের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে ওই এফ ডি আই সুন্দরী কলিংবেলটা টিপবার পূর্ব মুহূর্তে আরও একবার লিপিস্টিক বুলিয়ে নিয়েছিলেন।

সুন্দরী আবার হাসলেন। বললেন, স্যার, আপনি হয়তো জানেন আমাদের এই গ্লোবাল ইনস্টিটিউটটির অ্যাক্টিভিটি। ইন্ডিয়াতেও কাজ করছে। আমি ওদের স্পার্ম ব্যাংক ডিভিশনে আছি। আমাদের ব্যাংকে আপনি অ্যাকাউন্ট করুন না স্যার।

-আমার তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে...

-না স্যার, আপনি বড্ড অন্যমনস্ক। আমি স্পার্ম ব্যাংকের কথা বলছি। আপনার স্পার্ম চাই।

-স্পার্ম মানে শুক্রবীজের কথা বলছ তো?

-রাইট স্যার।

-তো আমার কাছে কেন?

-আপনি জানেন না গ্লোবালি আপনার কী ডিম্যাণ্ড। অনেক মহিলাই তাদের সন্তানের পিতা হিসেবে আপনাকেই চায়। এটা অনেকেরই ড্রিম। এ জন্যই ফ্রি ড্রিম ইন্টারন্যাশনাল আপনার সঙ্গে একটা ডিল করতে চায়।

-স্ট্রেঞ্জ! কী ডিল?

-তা হলে স্যার একটু ডিটেল-এ বলতে হয়। আমাদের কোম্পানির অনেকগুলো ডিভিশন আছে, তার মধ্যে একটা হল স্পার্ম ব্যাংক ডিভিশন। সারা পৃথিবীর ইমপারট্যান্ট পুরুষের স্পার্ম আমরা কালেক্ট করি। অনেক আনম্যারেড উওম্যান মা হতে চাইলে আমাদের সার্ভিস নেন। আবার অনেক দম্পতি আছেন যেখানে পুরুষের স্পার্ম কাউন্ট কম, তারাও আমাদের সার্ভিস নেন। আবার অনেক অ্যামবিশাস দম্পতি আছেন, যারা ভালো সন্তানের জন্য আমাদের কাছে আসেন। আমাদের স্টকে নানা রকম জিনের স্পার্ম আছে। কবি, সাহিত্যিক, বঙ্কর, সুমো, টেরিস্ট, টি-টেস্টার, দাবাড়ু, পাদ্রি, ফিল্ম আর্টিস্ট, ইকনমিস্ট, সাইনটিস্ট, স-অ-ব, সবরকম ভ্যারাইটি আমাদের কাছে আছে।

পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের স্পার্ম অ্যাকাউন্ট আমাদের আছে। অবশ্য আমরা গোপনীয়তা বজায় রাখি। তবে আমাদের কিছু কাস্টমার আছেন যারা স্পেসিফিকালি কিছু জিন চান একেবারে নাম করে। ধরুন ওসামা বিন লাদেন, শচীন তেণ্ডুলকার, ক্রিস্টন, সলমন রুশদি, স্টিফেন স্পিলবার্গ, দাউদ ইব্রাহিম...। আপনাকেও

চায়। এই যে আপনার একটা ঋষি ইমেজ, এর একটা আপিল আছে। এ জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আমাদের কাস্টমারদের বিট্টে করি না। দাউদ ইব্রাহিমের বদলে কিছুতেই আমরা হাতকাটা বাবলু সাপ্লাই করব না। একদম আসল জিনিটাই আমরা দিই। এ জন্যই আপনার কাছে আসা। আমরা স্যার ভালো। খুব ভালো মানে...

ড. সমাদ্দার এতক্ষণ শুনছিলেন। টাকার কথা উঠতেই হাত নাড়িয়ে বললেন, টাকার লোভ দেখাবেন না আমাকে। আমার টাকার দরকার নেই।

-জানি। আপনার পার্সোনাল লাইফ খুব সিম্পল। খুব কম টাকাই আপনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্যার, আপনার নিজের তৈরি একটা ইনস্টিটিউট আছে স্যার, ওখানে কত কী হচ্ছে। কত ছেলেমেয়ে পি এইচ ডি করছে। কিন্তু টাকার অভাবে কত প্রোজেক্ট আটকে আছে তাও তো জানি। যেমন ধরুন আপনারই আবিষ্কার করা ড্যারন পার্টিকেল-এর একটা ফ্যানটাস্টিক ইউজ ঘটাতে চাইছেন। ইলেকট্রন স্রোতের মধ্যে অল্প পরিমাণে ড্যারন মিশিয়ে দিয়ে আপনি মোর স্মুদ অ্যাণ্ড অ্যাকটিভেটেড কারেন্ট পেতে চাইছেন, যেমন পেট্রোলে মবিল মিশিয়ে দেয়। কিন্তু টাকার অভাবে আটকে আছে।

-সে কি! এটা তো কনফিডেনসিয়াল ব্যাপার। তুমি কী করে জানলে?

-স্যার, জানতে হয় স্যার।

-তুমি কি সায়েন্সের স্টুডেন্ট?

-হ্যাঁ স্যার, এবং আপনার ফ্যান।

-আমার ওই প্রজেক্টের কথা কাউকে বোলো না।

-না-না। কেন বলব? কাউকে বলব না, শুধু আমাদের কোম্পানির ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ জানে। আপনার ওই প্রজেক্টে আমাদের কোম্পানি অনেক টাকা দেবে।

-আমায় কী করতে হবে?

-সিম্পল ব্যাপার স্যার আমরা কিছু টেস্টিং দিয়ে দেব, আপনি মাসে বারদুয়েক আপনার স্পার্ম দেবেন, কবে দরকার সেটা ফোন করে বলে দেব, আমাদের লোক এসে নিয়ে যাবে। আপনি স্যার এই -এইভাবে দেবেন। একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছি।

মেয়েটি ল্যাপটপ খোলে। কয়েকটা বোতাম টিপে ডেমনস্ট্রেশন দেখায়। কী প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পদার্থটি টেস্টিংটিবে সংগ্রহ করা হচ্ছে তারই একটা লাইভ ডেমনস্ট্রেশনের রেকর্ডিং।

ড. সমাদ্দার কয়েক সেকেন্ড দেখেই চোঁচিয়ে ওঠেন, বলেন বুঝিছি, বুঝিছি, বন্ধ করো। ও সব যে করতে বলছ, আমার বয়স কত জানো? সিক্সটি এইট।

-ওটা কোনো প্রবলেমই নয় স্যার! আমরা আপনাকে কয়েকটা সিডি দিয়ে যাব, অডিয়ো ভিসুয়াল। কম্পিউটারে চালাবেন। ওগুলো স্যার বেশ কাজ দেয় একটা সিডি দেখবেন নাকি?

একটা লাস্য ঙ্গকুণ্ণন দিল মেয়েটি।

-ওরে বাবা, না, না-না, ওসব কী বলছ?



-স্যার, যা ভাবছেন তা নয়। ঋষ্যশৃঙ্গ মূনির সিঁড়ি। পৌরাণিক। দেখুন না। সিঁড়ি চালিয়ে দিল মেয়েটি। বলল স্যার ঋষ্যশৃঙ্গ মূনির গল্পটা তো জানেন নিশ্চয়। উনি বনে থাকতেন, কোনোদিন নারীমুখ দর্শন করেননি। অষ্টদেশে অনাবৃষ্টি হলে সেখানকার রাজা লোকপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অষ্টদেশে নিয়ে এলেন, নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, তাতেই বৃষ্টি এল, কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়ে আসাই কঠিন ছিল কিছুতেই আসবেন না। রাজা লোকপাদ কয়েকজন নারীকে পাঠিয়েছিলেন...। ড. সমাদ্দার দেখতে পাচ্ছেন নারীরা কীভাবে নিরাবরণা হয়ে যাচ্ছে, ঋষি অবাক হতে হতে শেষ পর্যন্ত কীভাবে...।

-স্যার, আমিও মাঝে মাঝে আসব স্যার...। আঁচল খসল মেয়েটির।

-স্যার এ ছাড়াও যদি দরকার হয়, হরমোন থেরাপি করে দেবে কোম্পানি। টেস্টাস্টেরন থেরাপি। যযাতির গল্প মনে আছে স্যার? ভাবুন তো, আবার যৌবনের দিনগুলো...। স্যার, ছোটবেলায় নিশ্চয়ই কোনো কোনো বাড়ির দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো লেখা দেখতে পেতেন-বসন্ত চলিয়া গেলে আসিবে আবার / যৌবন চলিয়া গেলে ফিরিবে না আর। মিথ্যে কথা স্যার। বিজ্ঞান মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে। আমরা আবার ফিরিয়ে দেব যৌবন।

ড. সমাদ্দার কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন- নাঃ, আমায় ছেড়ে দাও। বড্ড ঝামেলা, পেরে উঠব না। মেয়েটা বলে আই ডু এগ্রি। ঠিকই বলেছেন স্যার, ঝামেলা। কিন্তু আপনার সামান্য একটু ঝামেলার বদলে কত মায়ের স্বপ্নপূরণ হবে ভেবে দেখুন। তা ছাড়া পৃথিবীটার কথাও ভাবুন। কিন্তু মনুষ্যশরীরে আপনার জিনের অংশ থাকলেও পৃথিবীর কল্যাণ হবে। নিজের জিনকে পৃথিবীতে রেখে যাওয়া জীবের ধর্ম। আপনি স্যার ধারণা ধর্ম পালন করুন। ধার্মিক হন।

শেষ পর্যন্ত ড. সমাদ্দার রাজি হলেন। একজন কোম্পানির ডাক্তার এসে সমাদ্দারকে হরমোন ইঞ্জেকশন দিয়ে যান। ওই ইঞ্জেকশনের প্রভাবে ওর উত্তেজক অডিয়ো ভিসুয়াল দেখার আগ্রহ জন্মায় উনি দেখেন, এবং এর কিয়ৎকাল পরই তাঁর ২৩টি ক্রোমোজোমযুক্ত দেহনির্যাস একটা টেস্টটিউবে জমা হয়। টেস্টটিউবের গায়ে তিনি কোম্পানির দেওয়া লেবেল সাঁটেন ISO-9090 এটা নোবেল জয়ী ড. সমাদ্দারের কোড। কোম্পানি এই নম্বরেই গুঁকে জানে।

ড. সমাদ্দার ছোটবেলায় একটি অতি সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। ওখানে ড্রিল স্যার প্রায়ই বলতেন বীর্য বড় মূল্যবান জিনিস। ওটা নষ্ট করবি না। এটা যে এত মূল্যবান হতে পারে সমাদ্দার কল্পনাও করতে পারেননি। এক সিসি-র দাম কয়েক লক্ষ টাকা। মাসে দশ সিসি-র মতো চাহিদা আছে বিশ্ব বীর্যবাজারে। তবে বাজারের যা হাওয়া আগামী কয়েকবছরে চাহিদা বাড়তে পারে। মার্কেটিং ডিভিশন দারুণ কাজ করছে বিশ্বজুড়ে। ইউরোপ-আমেরিকা তো বটেই, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও প্রচার অভিযান চলছে। টিভিতে চটকা গানের সুরে বিখ্যাত গায়িকার কণ্ঠে এই জিংগলটা এখন খুবই জনপ্রিয়।

ও সাধের ঠারিন রে

কি ছাওয়াল নিবিরে তুই ক’

ব্যাংক খেলাপি নিবি গ’

আদম ব্যাপারি নিবি

ছেলে নাকি প্রকৌশলী পুত্র নিবি  
তোর স্বপ্ন পূরণ দিবে এফ ডি আই  
নাকি তোর ভোলেভালা কবি সন্তান চাই

তাছাড়া টাই-পরা বেশ কিছু ক্যানভাসার ছাড়া হয়েছে, ওরা অবশ্য বলে কাউনসিলার। ওরা কাউনসিলিং করে :

-শুনুন, আপনারা তো নতুন বিয়ে করেছেন। সন্তানের কথা কি ভাবছেন? কোনো রিস্ক নেবেন না। দাম্পত্যে কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করুন, যখন সন্তানের কথা ভাববেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। একদম একনম্বর স্পার্ম। খাঁটি। এই দেখুন ক্যাটালগ।

### বিজ্ঞানী

- A+ গ্রেড পাঁচ লাখ।
- A গ্রেড তিন লাখ।
- B গ্রেড দু লাখ।
- C গ্রেড এক লাখ।

### সাহিত্যিক

- A গ্রেড (আন্তর্জাতিক খ্যাতি - নোবেল, বুকার ইত্যাদি) তিন লাখ।
- B গ্রেড (জাতীয় খ্যাতি - আকাদেমি ইত্যাদি) এক লাখ।
- C গ্রেড (প্রাদেশিক খ্যাতি - বঙ্কিম ইত্যাদি) পঞ্চাশ হাজার।
- D গ্রেড (লিটল ম্যাগাজিন) দশ হাজার।

### খেলোয়াড়

- A গ্রেড ক্রিকেট দশ লাখ।
- B গ্রেড টেনিস আট লাখ।
- C গ্রেড ফুটবল পাঁচ লাখ।

এই সময় হয়তো ক্লায়েন্ট বলছে: ‘এত টাকা? বলবেই তো’।

তখন কাউনসিলার বলবে: এত টাকা বলছেন? বেশি হল? এই দেখুন না, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ – ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাড। কত টাকা ক্যাপিটেশন ফি চাইছে ভর্তি হতে? এটাও ধরে নিন ক্যাপিটেশন ফি। সন্তানের ফিউচার গ্যারান্টিড।

যদি থামের ক্লায়েন্ট হয় তা হলে হয়তো বলবে: ইঞ্জেকশনের ছানা সব সময় ভালো হয় না। গরুদের দেখিচি পাল ছেড়ে দেয়।

কাউনসিলার বলবে: বাচ্চা না হলে টাকাটা পুরো ফেরত। আমাদের গ্যারান্টি কার্ড আছে।

একজন আঁতেল ক্লায়েন্ট: সায়েন্টিস্টের বাচ্চা যে সায়েন্টিস্ট হবে এমন কি কথা আছে? আইনস্টাইনের সন্তানের নাম জানেন? বিদ্যাসাগরের ছেলে কী ছিলেন?

কাউনসিলার বলবে: এটুকু রিস্ক তো নিতেই হবে। ইলেকট্রনিক গুডস যেমন লাকের ব্যাপার, জেনেটিক গুডসও তেমন একটু লাকের ব্যাপার। দরকার এলে একটু ফেংশুই করে নেবেন।

নারীবাদী: এটা কী করে ভাবছেন পুরুষের বীর্যই সব। ওরা তো মাত্র তেইশটা ক্রোমোজম দিচ্ছে। বাকি তেইশটা তো দিচ্ছে ওভা। মানে নারী দিচ্ছে, নারী। তা হলে কী করে বলছেন ডাক্তারের সন্তান, খেলোয়াড়ের সন্তান? নারীকে অস্বীকার করছেন কী করে?

কাউনসিলার: ছি ছি। অস্বীকার করব কী করে? অর্ধেক তার রচিয়াছে নারী... অর্ধেক তার নর... রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন...

নারীবাদী: রবীন্দ্রনাথ নয়। নজরুল।

কাউনসিলার: সরি, সরি। নারীকে অস্বীকার করা মানে তো বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা। ঘি এবং ভাত মিলে হয় ঘি-ভাত। ভাত ছাড়া ঘি-ভাত হবে কী করে। ডিম্বাণু হল ভাত, আর স্পার্ম হল ঘি। ভালো ঘি যদি হয়, ভাত যাই হোক না কেন, ভাতে গন্ধ হয়। ঘি-টাই আসল। ভালো ঘি-এর ভালো দর।

এদিকে ডঃ সমাদারের জীবনটা গত এক বছরে অনেক পালটে গেছে। সকালে উঠে গীতা পড়েন ঠিকই, তবে জলচৌকির পরিবর্তে হাতির দাতের গীতা-দানি এসেছে। আগের মতোই ফতুয়া পরেন, তবে সিল্কের। বাড়িটা পালটাননি। মেঝেটা মার্বেলের। বেশ শ্বেত, শান্ত। সত্ৰগুণসম্পন্ন। দেওয়ালটাও সত্ৰগুণসম্পন্ন। প্লাস্টার অফ প্যারিস! কিন্তু রক্তের গভীরে ঢুকে যায় তমোগুণ। টেস্টাস্টেরন বলে – আসছি স্যার। আসে। গয়লার মতো আসে। দুইতে আসে। একদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। একা ঘরে ড. সমাদারের হাম্বা ডাকতে ইচ্ছে করছিল।

ইঞ্জেকশনের পর মন চনমনে হলে সিডি দেখা। ওটা খড়ের বাছুর। তারপর দোহন। তার পরে প্রেরণ। সঙ্গে সঙ্গে টাকা। ড. সমাদারের এখন অনেক টাকা।

তবুও কেমন ফাঁকা। তবুও কেমন একা।

তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত, তাঁর মায়ের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী প্রতিষ্ঠানটির এখন রমরমা। কত গবেষণা, কত প্রোজেক্ট। পৃথিবীজোড়া নাম। কদিন আগে ভারতরত্ন পেলেন ড. সমাদার। দেশ বিদেশ থেকে অভিনন্দন। এফ ডি আই এর তরফ থেকেও কনগ্রাচুলেশন জানানো হল ISO-9090 কে।

এখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কিছুদিন আগে বিদেশে গিয়েছিলেন ড. সমাদ্দার। বক্তৃতা দিতে দিতেই লক্ষ করলেন একজন গর্ভবতী মহিলা ওঁর দিকে অপলক চেয়ে আছেন। হ্যাঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছিল গর্ভবতী। প্রফেসর সমাদ্দার তখন ওই গানটা মনে পড়ছিল- কেন চেয়ে আছ গো মা; বক্তৃতার সময়ে ওঁর গলাটা কেঁপে উঠেছিল।

এইভাবে বছর দুই কেটে গেল। ড.সমাদ্দার এখন ওই হরমোন ইঞ্জেকশনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। এটা তার নেশার মতো। জীবনে জড়িয়ে গেছে।

এবার মেয়েটা এল। সেই সুন্দরী ল্যাপটপিনি। বলল স্যার, আজ আমিই এলাম। আমিই ইঞ্জেকশন দেব আপনাকে।

তাই হল।

মেয়েটি বলল স্যার, সিডি চালাতে হবে না। আমিই রেডি।

মেয়েটি ওড়না ওড়াল বাতাসে।

ড. সমাদ্দারের শিরা উপশিরায় কাম হরমোন। রমণ এল মনে।

মেয়েটি দুহাত বাড়াল।

ড. সমাদ্দার জানেন এটা কম্প্যানির গিফট। সেল্‌স প্রমোশন; প্রডাকশন বোনাস। সমাদ্দার খুলে ফেললেন পোশাক।

মেয়েটির শরীর জুড়ে হাততালি বাজল। বিজ্ঞানী উপগত হলেন।

অতঃপর তাঁর রেতঃপাতের সময় আসন্ন মনে হতেই বিজ্ঞানী মেয়েটির থেকে বিযুক্ত হলেন। ওঁর মনে হল এ জিনিস মহার্ঘ। যেখানে সেখানে নষ্ট করার নয়। তিনি দ্রুত টেস্টিটিউবের সন্ধান করলেন এবং তার মধ্যে মহার্ঘ দ্রব্যটি সমর্পণ করত স্তিকার সাঁটলেন। ওই উলঙ্গ বিজ্ঞানী টেস্টিটিউবটির মাথা ধরে বহুজাগতিক জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নিজ দেহনিঃসৃত পণ্যতরলের আয়তন ও আন্দাজ করতে চেষ্টা। করতে থাকেন। মেয়েটি বলে- আমারও স্বপ্ন ছিল স্যার। ফ্রি ড্রিম। আমার তো টাকা ছিল না স্যার...

## জিনে, ক্রোমজমে

দিলাম জলে গুলে  
রাজা উঠল ফুলে  
পেটের ভিতর মিছা।  
বল দেখি কিছা?

এটা ছোটোবেলার ধাঁধা! উত্তর হল চিতই পিঠে। দেখতে বেশ ফুলো ফুলো, কিন্তু পেটের ভিতর মিছা। মানে হাওয়া। বার্গার দেখেও ওরকমই মনে হয়। দেখতে বিরাট বড়ো। এক তলা দুই তলা তিন তলা...ঠাকুর যাচ্ছে বড়োতলা। ফাঁপা ফাঁপা পাউরুটি, ফাঁকে ফাঁকে একটু কাঁচা পাতা। ওরা বলে লেটুস। পাতলা জালি টমেটো আর শশা। মাংস কি থাকে বোঝা যায় না। ওটি খেতে হয়। কে আবার রান্নাবান্না করবে?

বেল বাজল। বাজনা শুনেই বোঝা যায় কে এল। কিকোতে। খুলবে না কোকিলা। বাজাক। বারবার বেল বাজলে পাশের ঘরে অসুবিধা হয় বলে চেয়ারে উঠে ফিউজটাই খুলে নেয় কোকিলা। এরপর শুনতে পায় হাই খোকি... খোকি...ওপেন ওপেন ইয়োর ডোর। কয়েকবার দরজা ধাক্কা দিয়ে চলে যায় কিকোতে।

ওর পুরো নাম কিকোতে পুনারা ওয়াতু। ওদের সহিলি ভাষায় ওয়াতু মানে ক্রীতদাস। শ্লেভ। ওর পূর্বপুরুষ ছিল শ্লেভ। ও এখনও ওর নামের সঙ্গে ওটা বহন করছে। কোকিলা বলেছিল এখনও কেন এই ওয়ার্ডটা ক্যারি করছ তুমি, মুছে দাও। ও বলেছিল, কেন মুছে দেব ইতিহাস? এত সহজে?

কোকিলা অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক্ করছে। ওর গবেষণাটা গন্ধ নিয়ে। গন্ধ এক আশ্চর্য ব্যাপার। কোনও কোনও পদার্থের গন্ধ নেই। ওদের অণুগুলো খুব ঘন ভাবে আটকানো। যেমন সোনা, রূপো, বালি, পাথর, জল। কিন্তু কোকিলাদের গায়ের মহাদেব কাকু বলত জোছনার গন্ধ পাই। আজ খুব বড়ো চাঁদ উঠেছে, নারে? মহাদেব কাকু অন্ধ ছিল। মহাদেব কাকু নাকি আলাদা মানুষেরও আলাদা আলাদা গন্ধ পেত। বলতে কে এলি, কোকিলা? অন্ধ মানুষদের গন্ধ-বোধ বেশি থাকে। ওরা বলে পাথরেরও গন্ধ হয়। সাদা পাথরের আলাদা গন্ধ, কালো পাথরের আলাদা। পদার্থের অণু নাকের ভিতরে যায়, নাকের ভিতরে লক্ষ লক্ষ অলফ্যাক্টরি রিসেপটারে ঐ অণুগুলো আলাদা আলাদা ভাবে সাড়া দেয়, সেটা আবার স্মৃতিতে আটকে থাকে, আমরা বলি এটা বিড়ির গন্ধ, এটা দুধের। এই তথ্য তো সবাই জানে। কোকিলা জানতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে মানুষের ভালো লাগা বা না-লাগা গন্ধ। ও দেখেছে ধাঙড় পাড়ার লোকেরা যখন শুকনো মাংস রান্না করত, ওদের সেই গন্ধ ভালো লাগত না। নাকে কাপড় দিত। শুটকি মাছও ভালো লাগত না। কিন্তু ধাঙড়দের ঐ গন্ধে অসুবিধে হত না। কেউ কেউ হিং-এর গন্ধ ভালোবাসে, কেউ সহ্যই করতে পারে না। আবার যে হিং-এর গন্ধ ফুলকপিতে ভালো লাগে, কিংবা কচুরিতে ভালো লাগে, সেই হিং-এর গুঁড়ো যদি কোনো মানুষ মাখে, ধরা যাক হিংয়ের গুঁড়ো মেশানো ট্যালকম পাউডার মেখে দাঁড়াল

কেউ। ভালো লাগবে সেটা? খুব কষা করে খাসির মাংস রান্না করা হয়েছে। একদম ভুরভুর করছে গন্ধ। বলা হচ্ছে দারুণ গন্ধ। কিন্তু সেই গন্ধ যদি কারুর গা থেকে বেরোয়? ঘরে ফিনাইলের গন্ধ মন্দ লাগে না। পায়েরে কি দু'ফোঁটা ফিনাইল ফেলে দেয়া যায়? যে বডি লোশন গায়ে মাখলে কেউ বলবে বা কী ভালো গন্ধ, সেটা ভাতে ছড়িয়ে দিলে বমি পাবে না? গন্ধেরও কতরকম ভাঁজ। কালচারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে, মনের সঙ্গে গন্ধ মিশে আছে। একজন বইপড়ুয়ার কাছে নতুন বইয়ের গন্ধ যে আনন্দ এনে দেবে, না-পড়ুয়াকে সে আনন্দ দেবে না। ক্ষিদের পেটে মাছভাজার গন্ধ সুখ দেয়। ভরা পেটে বিরক্তি আনে। এইসব গন্ধ-অণু লিম্বিক সিস্টেমের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক ঠিক করে গন্ধটা ভালো না খারাপ। গন্ধ নিজেও কি মস্তিষ্কের ঐ অংশকে প্রভাবিত করতে পারে? গন্ধ কি মানুষের মুড পালটে দিতে পারে, অনুপ্রেরণা কিংবা সাহস? গন্ধ কি ভালোবাসাও এনে দিতে পারে। যদি পারে, তবে কীভাবে? এই ব্যাপারটা বোঝা গেলে অ্যারোমাথেরাপিটা ঠিকঠাক বোঝা যাবে।

আর কিকোতের কাজ হিউম্যান ফেরোমন নিয়ে। অনেক জীব জন্তু শরীর থেকে ফেরোমন নিঃসরণ করে। এটা একটা কেমিকাল-বার্তা। পুরুষ বাঘেরা বলে আমি এসেছি। বলে এই এলাকা আমার। স্ত্রী বাঘেরা ঐ বার্তা পায় গন্ধ বিধুর সমীরণে।

শুধু বাঘ কেন বহু প্রাণীই ফেরোমন নিঃসরণ করে। পতঙ্গও। শুধু ভালোবাসার বার্তা নয়, আরও নানারকম বার্তা পাঠায় শরীর গন্ধ। বিপদের বার্তা, খাদ্য সম্পর্কিত বার্তা...। মানুষ যখন কথা শেখেনি, মানুষেরও ফেরোমন বের হত। মানুষের ঘামে কি এখনও সেই ফেরোমনের অংশ আছে? তবে কি সেই রাসায়নিক? কিকোতে এখন এই কাজটা করছে। ওদের দুজনেরই গাইড যোসেফ মুর বিখ্যাত অ্যাল্ফ্যাকসন সায়েন্টিস্ট। গন্ধ-বৈজ্ঞানিক। ওরা পি এইচ ডি করেছিল একই ল্যাবরেটরিতে। এখন ল্যাব দুটো আলাদা হয়ে গেছে।

কিকোতের আদিপুরুষ থাকত টাঙ্গানিকায়। এখন টাঙ্গানিকা আর জাঞ্জিবার দেশ দুটো মিলে তানজানিয়া হয়ে গেছে। জাঞ্জিবার একটা বিখ্যাত বন্দর। শুধু এলাচ লবঙ্গ জয়ত্রি জায়ফল নয়, জাঞ্জিবার বন্দর থেকে মানুষও রপ্তানি হত। কালো মানুষ। এখান থেকে মানুষ কিনে নিত সস্তায় বা লুঠ করে নিত আরব বণিকরা।

আলেকজান্দ্রিয়াতে নিয়ে যেতে পারলে দাম বেড়ে যায়। ব্যবসা তো একেই বলে। যেখানে যা সস্তা, ওখান থেকে কিনে নাও, যেখানে দাম বেশি, সেখানে গিয়ে বিক্রি করো। তখন তো সুয়েজ খাল ছিল না। ফায়েদ পর্যন্ত জাহাজ, তারপর মরুভূমির ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কেউ যেত ইয়োরোপে, কেউ বা জাহাজের খোলে ঠাসাঠাসি হয়ে আমেরিকা। পথে মরে যেত কেউ কেউ। মরে গেলে কালো মানুষদেরই পরিষ্কার করতে হত, মানে মড়াটাকে চ্যাংদোলা করে সমুদ্রে ফেলে দিতে হত। অনেক মানুষই মরে যেত যাবার পথে। মানুষ-মাংসের লোভে এইসব জাহাজের পিছন পিছন ছুটত হাঙর। এইসব গল্প বলেছে কিকোতে। ওদের সহিলি ভাষায় হাঙরের একটা নাম আছে চর্বিডকোতা। মানে সমুদ্রের চিতা। কিকোতে কোকিলা বলতে পারে না। গত কয়েক পুরুষে ওর ইংরেজি উচ্চারণে আমেরিকান অ্যাক্সেন্ট এসে গেছে। ও বলে খোকিল্লা। কোকিলা বলেছে আমাকে বরং খোকি বলেই ডাকো। কিকোতে একদিন উইকিপিডিয়ায় দেখিয়েছিল শ্লেভ ট্রেডের রুট। দেখিয়েছিল মরোক্কো থেকে, কঙ্গো থেকে, ঘানা থেকে

কীভাবে মানুষ রপ্তানি হত আমেরিকার আখের খেতে, ভুট্টার খেতে। এসব ছেলেটা ভুলতে পারে না কিছুতেই।

কোকিলা রায় বাঁকুড়া জেলার মেয়ে। ও হল খয়রা জাতের। ওর মায়ের কাছে শুনেছে ওরা হল চিড়াকুটা খয়রা। মল্লরাজাদের সৈন্যবাহিনীতে নাকি অনেক বাগদি, ডোম এবং খয়রা ছিল। খয়রাদের একটা অংশ ছিল লেঠেল। লাঠির যুগ শেষ হয়ে গেছে কবে। ওরা কেউ হল চিড়াকুটা, কেউ হল মাছমারা। কোকিলার ঠাকুরমা বাবুদের বাড়িতে ধানভানা চিড়ে কোটার কাজে যেত। উঠোন, টেকিঘর, আর বারান্দা পর্যন্তই ঢুকবার অধিকার ছিল ওর। ঘরে যেতে পারত না। ওঁর দাদু ছিল কাশীপুরের নায়েববাড়ির মাইন্দর। মাইন্দর মানে তো দাস। সারা বছরের জন্য সবরকমের কাজ করতে হত। তার বদলে বছরে কয়েক মন চাল আর সামান্য কিছু টাকা। কোকিলার বাবা কি করে যেন পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের দারোয়ানের চাকরি পায়। পূর্বপুরুষ লেঠেল ছিল কর্তৃপক্ষের এরকম কোনো বোধ কাজ করেছিল কিনা কে জানে!

সার্কিট হাউসে কোয়ার্টার ছিল কোকিলার বাবার। ছোটবেলা থেকেই কোকিলা দেখত গাড়ি করে বড়োমানুষরা আসছে, গাড়ি ঢুকলেই কোকিলার বাবাকে সেলুট মারতে হত। গাড়ি বেরুলেও। কত ম্যাডামও আসত-ওদের পোশাক বুলত ‘বেলকোনি’তে। জুঁইলতার ফাঁকে-বুলত ‘বেসিয়ার’ ওদের জন্য কিচেন-এ চিকেন রান্না হত, সুবাস আসত ওদের ঘরে। কোকিলা ভেবেছিল ও এরকম ম্যাডাম হবে। ম্যাডাম হতে গেলে ভালো করে ‘নেকাপড়া’ করতে হবে।

ইস্কুলে সত্যি ভালো রেজাল্ট করত। স্বর্ণবালা বালিকা বিদ্যালয়ের ফাস্ট গার্ল। কাছেই ডি এম সাহেবের বাংলা। ডি এম সাহেবের বউ কি করে জেনেছে এখবর। ওর সময় কাটে না। বলেন আমার কাছে আসবি তুই। ঐ বনানী ম্যাডামের অঙ্কে খুব মাথা। খুব ভালো অঙ্ক করাত, ইংরাজিটাও। কী অবাক কাণ্ড, মাধ্যমিকে পুরুলিয়া জেলার ফাস্ট কোকিলা।

কোকিলার ঠাকুরমা তখনও বেঁচে ছিল। ঠাকুরমা এত কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিল লাতনীটা খুব ডক্কাবাজা মেয়া হয়েছে। খুব হাত বুলিয়েছিল মাথায়। টুসু গানের কায়দায় বলেছিল

লাতিন আমার সরস্বতী

বল তুকে আজ কী দিব

ময়রা দুকান লিয়ে গিয়ে

লাল জিলিবি খাওয়াব।

সত্যি সত্যি কয়েন দিয়েছিল ঠাকুরমা, জিলিপি খাওয়ার জন্য।

মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট হল বলে কোকিলার মা-বাবার খুব কদর হল। ইস্কুলের দিদিমণিরা বাড়ি এল। ঐ ইস্কুলেই ভর্তি করিয়ে দিল এগারো ক্লাসে। কোকিলার বাবা বলত আমার কেমন যেন কানের ভিতরে ভেঁ ভেঁ করে। ছিনছাতুর লাগে। সব্বাই কি বুলাবুলি করছে, মেয়েটা কী হবে! ডাগদার, ইনজেনিয়ার, না বিডিও, না ডি এম? মাথাটো ঠিক রাখতে লারছি।

কোকিলা স্কলারশিপ পেল, এম-এস-সি করল, এখানেও স্কলারশিপ পায়, সব খরচ হয় না। বাড়িতে টাকা পাঠায়। আরও দুটো ভাই আছে, অত ভালো হয়নি, পড়াশুনো করে। ঠাকুরমা মারা গেছে। ফাংগাস লাগা

একটা বিশেষ কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে কোকিলা ওর ঠাকুরমার গায়ের গন্ধ পেয়েছিল।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কিকোতে প্রায়ই বলত খোকি, তোমার গায়ে আমি আমার ঠাকুরমার গায়ের গন্ধ পাই। খুব ঘন করে গায়ের গন্ধ নিত। কিন্তু কিকোতের গায়ের গন্ধ কোকিলার ভালো লাগত না। কিকোতে রাগ করত। জিজ্ঞাসা করত কেন ভালো লাগে না তোমার? এতো তোমার পূর্বপুরুষের গায়ের গন্ধ। ঘামের সঙ্গে ইলেকট্রোলাইটস ছাড়া যা যা অ্যারোমেটিক্স বেরোয়-তা পূর্বপুরুষের দান। জিনেটিক। কোকিলা, তোমার রং কালো, তোমার নাক সাহেবদের মতো শার্প নয়, তোমার চোখের মণির রং নীল নয়। তুমি তো আমাদেরই আত্মীয় কোকিলা, আমি জানি, অনেক অনেক বছর আগে ভারতবর্ষ আর আফ্রিকা এক সঙ্গে ছিল। জড়াজড়ি করে ছিল। গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। তোমার মধ্যে নেগ্রয়েড রক্ত আছে, আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ না কেন? আরও একটু ভালোবাসো, তাহলে পাবে।

যখন স্কলারশিপ পেয়েছিল এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, আসতে চায়নি কোকিলা। কোকিলার মা বাবা তো আরও নয়। ওদের সাহস দিয়েছিল স্বর্ণবালা ইস্কুলের বড়ো দিদিমণি। এসে এসে বলত আমাদের মেয়ে আমেরিকায় স্কলারশিপ পেয়েছে, ওখানেই যাবে। আমেরিকায় পৌঁছোবার আগে সিডিতে দেখেছিল ইউনিভার্সিটিটা, শহরটাও। কিন্তু প্রথমে নেমে একটা তো শক্ হবেই। এত চওড়া রাস্তা, পরিষ্কার, এত সুন্দর ফুটপাথ, পরিষ্কার, এত সব গাড়ি, পরিষ্কার, শব্দ নেই, ঘাবড়াবার কথা নয়?

তবে অ্যারিজোনার সঙ্গে পুরুলিয়ার একটু মিল আছে। যেখানে মাটি দেখা যায়, মাটির রং লাল, ধুলো ওড়ে, দিনের বেলায় বেশ গরম লাগে। ক্যাম্পাস থেকে পাহাড় দেখা যায়।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে কিকোতেই আলাপ করে ওর সঙ্গে। বলে এত কম মাখন নিচ্ছ কেন, নাও। খাও। ওটা গুয়াভা জ্যাম। ওটা স্ট্রবেরি।

কিকোতের সঙ্গে টেবিলে বসেছিল ও। কিকোতে বলেছিল এই যে দেশটা কালারাদো নদী ঘেরা দেশটা, এটা ইন্ডিয়ানদেরই ছিল। আমার স্টেট হল টেক্সাস। ওখানেও একসময় ইন্ডিয়ানরা ছিল। স্প্যানিশরা এসে ওদের শেষ করে দিয়েছে।

কোকিলা বলছিল-ওরা তো অন্য ইন্ডিয়ান। রেড ইন্ডিয়ান। উই আর অ্যানআদার ইনডিয়ান। উই আর অ্যাকচুয়াল ইনডিয়ান। ও বলতে চাইছিল কলম্বাস এই ইন্ডিয়ান খোঁজেই তো অভিযানটা করেছিল, তারপর ভুল করে... বলতে গেলে তো অনেক বলতে হবে। বোঝাতে পারবে তো। ইংরিজিটা তো ভালো করে বলতে পারে না...।

কিকোতে বলেছিল-আই নো, আই নো ইউ আর নেগ্রয়েড ইনডিয়ান। নেটিভ আমেরিকানস ওয়ার প্রবাবলি মোঙ্গলয়ডস্। বাই মিসটেক দে কলড দেম ইনডিয়ান্স। প্রথম দিনেই কোকিলাকে নেগ্রিটো বলতে শুরু করেছিল ও। ওর মনে হয়েছিল ও কি সত্যিই এত কালো? ওকে কি নিগ্রোদের মতো দেখতে? কিন্তু বেশ তর্ক করেনি। অত তর্ক করার মতো ইংরিজির দখল ছিল না।

পরদিনই কোকিলার হাতের উপরের দিকে একটা উষ্ণি দেখে ফেলেছিল ও! গরম ছিল, ছোটো হাতার শার্ট পরেছিল। অন্য মেয়েরা তো আরও ছোটো পরে। উষ্ণিটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল কিকোতে। ওয়াও... ট্যাটু...। উষ্ণিটার উপরে হাত রেখেছিল। পরে ওখানেই চুমু খেয়েছিল। উষ্ণিটার উপরেই প্রথম চুমু।



বলেছিল তুমি তো আমাদেরই মতো। আমাদের ট্রাইবে ছোটোবেলায় ট্যাটু করা হত। যেন নজর না লাগে। আফ্রিকা থেকে এ দেশে স্লেভ হয়ে এসেও আমরা আমাদের সেই অভ্যেস ছাড়তে পারিনি। এই দ্যাখো আমার শরীরেও তোমার মতো। ARIZONA লেখা গেঞ্জিটা উঠিয়ে দিলে দেখল ওর বাঁদিকের বুকের উপর একটা উল্কি, একটা মাকড়সার ছবি।

কোকিলার হাতের উপরেও, যেখানে আগে বসন্তের টিকার দাগ থাকত, ওখানে ও তো মাকড়সাই। ছোটোবেলায় করিয়ে দিয়েছিল, যেন নজর না লাগে। এতদিন তো খেয়ালই করেনি কোকিলা ওর হাতে কোনো ট্যাটু আছে। কিকোতে বলল-তোমার ট্যাটুও আমারই মত। ছোটোবেলায় করা। এখনকার ছেলেমেয়েদের স্টাইলের ট্যাটু নয় যে এক মাসেই উঠে যাবে। এগুলো আমাদের চামড়ার ভিতরে গাঁথা।

ও যত বলত তুমি আমাদেরই লোক, কোকিলা মানতে চাইত না। কী করে এক হবে? ও তো ইতিহাসে পড়েছিল ভারতীয়রা আর্য জাতির বংশধর। তবে এটাও জানে ও এস সি-সিডিউল কাস্ট। এজন্য কিছু সুযোগ সুবিধাও পেয়েছে, কিন্তু এটাও জানত কোকিলার দাদু ঠাকুরমা বামুন-কায়েতদের বাড়িতে ঢুকতে পারত না।

কোকিলা ওর অলস সময়ে শুয়ে শুয়ে ভেবেছে দেশে ওর বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে বিদেশ ফেরত বৈজ্ঞানিকের জন্য উপযুক্ত সুপাত্র চাই। উচ্চ অসবর্ণে আপত্তি নাই। তখন সিডিউল কাস্ট কেন, বামুন কায়েতের ঘরের ছেলের বাপরা চিঠি লিখবে। ওর বাবাকে বামুনরাও তেল মারবে, বলবে দিন, আপনার মেয়েকে দিন। ওর বাবা বলবে আরও তো অনেক পাত্র আছে, ভেবে দেখছি।

দেশের ফেরার কথা এখন আর ততটা ভাবে না। ও জানে এখানেই চাকরি পাবে, ভালো চাকরি। আরও গবেষণার সুযোগ পাবে। দেশে বড়ো বাড়ি করবে, মাঝেমধ্যে যাবে, বামুন কায়েতের বাচ্চারা হা করে থাকবে।

কিকোতে দরজা ধাক্কা দিয়ে ফিরে গেছে। ও কি বুঝছে না ওকে এখন আর পান্ডা দিচ্ছে না কোকিলা? ওর সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব হয়েছিল ঠিকই, একটু শরীরও। ঘন ব্রাশের মতো কোঁকড়া চুলে ভরা ওর মাথাটা শরীরে ঘষতে ভালো লাগত কোকিলার, তাই বলে কী করে ভাবছে, ওর সঙ্গে ঘর করবে, একসঙ্গে থাকবে, বিয়ে করবে? ও তো কালো। নিথো। কোকিলা কি এতটা কালো নাকি। ও হল শ্যামলা। শ্যামবর্ণ। এই রংটা সাহেবরা খুব ভালোবাসে। কোকিলার হাতে মাকড়সার আঁকা উল্কি রয়েছে তো কী হয়েছে? কোকিলারও ঠোঁট মোটা তো কী হয়েছে? ওর নামের সঙ্গে কিকোতে নামের মিল আছে তো কী হয়েছে? ওর তো বোঝা উচিত কোকিলা ওকে পান্ডা দিচ্ছে না। গতকাল ও দেখেছিল পেড্রোর সঙ্গে। পেড্রো চুমু খাচ্ছিল। পেড্রো বলেছিল তোমার ঠোঁটটা মোটা বলে চুমু খেতে ভালো লাগে আমার।

ও বোধ হয় আজ একটা কিছু হেস্টেনেস্ট করতে এসেছিল কিকোতে চলে গেছে। কোকিলা ব্যালকনি থেকে ঈষৎ কুঁজো হয়ে, ঘাড় গুঁজে চলে যাওয়া দেখল।

পেড্রো অ্যালভারেজ একই ইউনিভার্সিটির ছেলে। অন্য ডিপার্টমেন্টের। জিনোমিক্স এর। ও স্প্যানিশ আমেরিকান। কিকোতে ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কারণ স্প্যানিশরাই প্রথম আমেরিকা এসেছে, আমেরিকান আদিবাসীদের শেষ করেছে। স্লেভ বানিয়েছে। স্লেভ খাটিয়েছে। কোকিলা বলেছে-এখন তারখচিত আমেরিকান ফ্লাগের তলায় সবাই এক। দাসরা মুক্ত। এখনও ওসব রাগ পুষে রাখে নাকি?

বলেছিল,কিন্তু কোকিলা নিজে কি এখনও একটুও রাগ পুষে রাখেনি? নইলে বামুন ছেলেদের হ্যাটা করার কথা ভাবে কেন?

পুরুলিয়া সার্কিট হাউসের ছোট্ট কোয়ার্টারটা ফুল-পাতায় সাজানো। আজ কোকিলার ছেলের মুখে ভাত। গত তিন মাস হল এখানেই আছে। এখনও নতুন বাড়ি কেনা হয়নি, কিছুদিন চাকরি করে ডলার জমিয়ে পাঠিয়ে দেবে, তখন বাড়ি হবে।

কোকিলা পেড্রোকেই বিয়ে করেছিল। বামুন। মানে সাহেব আর কি। লালচে গায়ের রং। খুব একটা লম্বা নয়। নীলচে চোখ।

পেড্রো কয়েক পুরুষের আমেরিকান। এখনও মাঝে মাঝে দু-চারটে স্প্যানিশ বলে।কোকিলার কাজটা নিয়ে বলেছিল ত আদোরো। তোমায় আদর করির মতো শোনাতেও মানেটা হচ্ছে তোমায় অ্যাডমায়ার করি বা আডোর করি। ওটাই পালটে গিয়েছিল তে কুইরোতে। মানে আই লাভ ইউ।

এই পরিবর্তনটা হতে মাস ছয়েক লেগেছিল।ওরা দুজনেই আলাবামাতে চাকরি পেয়ে যায়। ওরা চলে যায়। ওরা আলাবামা গিয়ে বিয়ে করে। কোকিলার মা বাবা চেয়েছিল পোয়াতী মেয়েটা দেশে ফিরে বাপের বাড়ি আসুক।এসে থাকুক, সাধভক্ষণ হোক-উঁচু জাতের মেয়েদের যেমন হয়। ওরা চায়নি। বাচ্চাটা ওদেশের মাটিতে জন্মালে সিটিজেন বাই বার্থ হয়ে যাবে। আমেরিকার নাগরিক। বাচ্চাটা ওদেশেই ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু স্প্যানিশ বরকে নিয়ে পুরুলিয়া এসেছিল কোকিলা। ডি এম সাহেব, বিডিও সাহেব, স্কুলের হেড দিদিমণি, তৃণমূল এবং সিপিএম নেতারা কোকিলার সাহেব বর দেখতে এসেছিল।সবাইকে কালাকান্দ আর মেচা সন্দেশ খাওয়ানো হয়েছিল। সেবারই বাড়িতে কম্পিউটার বসিয়ে দিয়ে যায়। সঙ্গে স্কাইপ। কম্পিউটারের উপরে একটা ওয়েব ক্যাম বসানো আছে। কোকিলার মা-বাবা কোকিলাকে দেখতে পাবে, কথা বলতে পারবে। কোকিলা ভাইদের স্কাইপ অপারেশন শিখিয়ে দিয়েছে। কোকিলার গন্ধ-সম্পর্কিত যে কাজটা, যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ভালো লাগা না-লাগার সঙ্গে জেনেটিক্স কোনো সম্পর্ক সন্ধানের জন্য ওরা দুজনে কাজ করবে ভেবেছে। পেড্রো জেনেটিক্স ভালো বোঝে। ছেলেটা কাজপাগল। কোকিলার কাজের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে ভালো লেগে গিয়েছিল পেড্রোর।

ওদের ছেলেটা কিন্তু ফর্সাই। মায়ের রং পায়নি। অবশ্য বাচ্চারা ছোটোবেলায় ফর্সাই থাকে। নাম রাখা নিয়ে একটু সমস্যা ছিল। ওদের নাম হবে, নাকি এদিকের নাম।সমাধান করেছিল কোকিলাই। একজন স্প্যানিশ অভিনেতা-নাম গোবিনো নিরো। গোবিনো নামটা শুনতে গোবিন্দের মতোই লাগে। কিন্তু মাস দুই পরে গোবিন্দের মাথায় যখন চুল গজাল তখন সেই চুলে ঝুঁটি বাঁধা সম্ভব হল না।

চুলগুলোর ধরন অন্যরকম হচ্ছিল। লম্বা নয়, কোঁকড়া, ব্রাশের মতো। গত তিন মাসে বাচ্চাটার মাথার চুলটা এমন হয়ে গেল যেন কিকোতের মত।

পেড্রো সামনাসামনি দেখেনি বাচ্চাটাকে অনেক দিন। তিন মাসের বাচ্চাটাকে নিয়ে কোকিলা চলে এসেছিল একাই। মুখে ভাত হলে ফিরে যাবে।

ওর এরকম চুলের ছবি পেড্রোর কাছে নেই। এই চুল পেড্রো দেখেনি। আফ্রিকানদের এই ধরনের চুল হয়। আফ্রোটেক্সচারের। সাহেবরা এই চুলকে বলে কিংকি হেয়ার।

কী করে হল? কিকোতের কোনো জিন শারীরিক ভাবে প্রবেশ করেনি, এটা নিশ্চিত। পেড্রোর সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্বের পর কিকোতের সঙ্গে কোনোদিনই শারীরিক মিলন হয়নি। ওর জিন কোকিলার সন্তানের মধ্যে আসা অসম্ভব। তবে কি অন্য জিন? যে জ্বিন-এর কথা ইসলামিক কেতাবে থাকে।

পেড্রোর সঙ্গে মিলনের সময় কি কিকোতের কথা মনে পড়েছিল?

পড়েছিল তো পড়েছিল, তাতে কি জিন আসে নাকি? তবে কী করে হল?

তবে কি কিকোতের কথাই ঠিক! কোকিলার শরীরেও নিথ্রোয়েড অস্তিত্ব রয়ে গেছে? কোনো-এক জিনের গভীরে গোপনে রয়ে গেছে এক কণা আফ্রিকা?

কোকিলার মা তো এই চুলে খুব খুশি। মাথায় হাত বুলোচ্ছে খুব। কোকিলার বাবা বলছে ওদের কোনো জ্যাঠামশাইয়ের এরকম চুল ছিল।

তার মানে ক্রোমোজোমের ভিতরে জিনের মধ্যে রয়ে গেছে কোনো এক ট্রেইট, যা চোখের মণির রং, চুলের চরিত্র, নাকের গড়ন এসব বহন করেন। নারী পুরুষের মিলন তো কোটি কোটি জিনের সঙ্গে কোটি কোটি জিনের র‍্যাণ্ডম মিলন। র‍্যাণ্ডম শব্দটা খুব ইমপর্টেন্ট এখানে। পেড্রো বুঝবে তো? যখন আরিজোনাতে পেড্রোর সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিল, কিকোতে তো ওখানেই ছিল। এই জিন মাহাত্ম্য কথা বুঝবে তো পেড্রো?

বাড়িতে উৎসব। কোয়ার্টার ছোটো। লোকজন সার্কিট হাউসেই খাবে। ডি.এম. সাহেব আজকের জন্য দিয়েছেন। কোকিলার বাবা অনেক দিন ধরেই আর ছিনাথ নয়। শ্রীনাথ রায়। আজ ধুতি আর টেরিকটের জামা পরেছে। পুরুলিয়ার তপশিল জাতি সমিতি ওকে জোর করে ওদের সংগঠনের সহ সভাপতি করে দিয়েছে। খয়রা সমাজের কেউ কেউ নিমন্ত্রিত। গ্রামের বাড়িরও। ওরা সার্কিট হাউসের গদি আঁটা চেয়ারে বসতে ভয় পেয়েছে। ওরা বাইরের বাগানে। পিছন দিকটায়। দু বোতল ‘ইংলিশ’ কিনে দিয়েছে শ্রীনাথ। ওখানে ওরা গাইছে, নাচছে। ওদের সমাজের একটা মেয়ের সাহেব ছানা হয়েছে। শ্রীনাথ বেশি নয়, দু’টোক মেরে এসেছে।

কোকিলার মায়ের গরদের শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। কপালে অনেকটা সিঁদুর। সবাই বলছে আপনি রত্নগর্ভা।

অন্নপ্রাশনে যজ্ঞ হয়েছিল। বামুন এসে যজ্ঞ করেছে। খয়রাদের ঘরে বামুনরা কাজ করত না। স্কাইপে সেই যজ্ঞ, মুখে ভাত তুলে দেয়া, ছেলের মাথায় মুকুট পরানো, সবই স্কাইপে দেখেছে পেড্রো। বলেছে ওয়াশবারফুল। আই মিস ইট।

যাগ-যজ্ঞ পূজো সব দুপুরেই হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যা। আলো জ্বলে উঠেছে। বাগানের পিছন থেকে ফিরে এসে শ্রীনাথ রায় বলল-অন্নপ্রাশন দিলাম, এবার পৈতেও দেব। আর আমরা আর একুশ দিনে নয়, এগারো দিনে শ্রাদ্ধ করব। মা কোকিলা, তুই সাহেব বে করে আমাদের বামুন বানিয়ে দিলি।

কোকিলা বাচ্চাটাকে ধুতি পরিয়েছে, পাঞ্জাবিও। গলায় মালা। একটু পরই লোকজন আসতে শুরু করবে। সব মান্যজন, গণ্যজন। তখন সময় পাবে না। খুব ইচ্ছে হল-কিকোতের সঙ্গে কথা বলে। বাচ্চাটা একবার

কিকোতেকে দেখায়। মেল করল।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব পেল। ও এখন কম্পিউটারেই আছে।

কিকোতেকে প্রত্যাখ্যান করেছে কোকিলা, কিন্তু কিকোতে খারাপ ব্যবহার করেনি কখনো। ক্রিসমাসে কার্ড, ফ্রেণ্ডশিপ ডে তে-ও। মাঝে মাঝে মেল-হাউ ইজ লাইফ।

কোকিলা বলল স্কাইপটা খোলো, তোমার ভালো লাগবে।

বাচ্চটাকে ক্যামেরার তলায় ধরল কোকিলা, যেন চুলটাকে ভালো করে দেখতে পায় ও।

তালি দিয়ে উঠল কিকোতে। হা হা করে উঠল। বলল শুকে দেখ, শুকে দেখ বেবি, তোমার সন্তানের গায়ে আমার গায়ের গন্ধ পাবে।

বলল-দেখলে তো, আমি আছি। তোমাকে গত দু বছর স্পর্শ না করেও তোমার শরীরে গভীরে আমি গোপনে ছিলাম। স্যালুট, স্যালুট টু দি মিস্টেরিয়াস ডি.এন.এ.।

কিকোতে বলল ওয়ান সেকেন্ড। গিটারটা নিয়ে আসতে দাও।

ঝং করে উঠল গিটার, যেন হঠাৎ জলপ্রপাত।

ও গাইছে। কথাগুলো ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

এক নদী জল, এক গাছ ফুল, এক আকাশ বৃষ্টি...

বোঝা যাচ্ছে শুভেচ্ছা গীতি গাইছে কিকোতে। ও গাইছে তোর জন্য খোলা মাঠ, তোর জন্য একপাল শুয়োর... শুয়োর চরাতে গেলে কড়া রোদ্দুরে তোকে ছায়া দিক এক বাওবাব গাছ...

গানটার ভাষা ইংরিজি, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে ওদের ফেলে আসা জীবনের গান। কয়েক পুরুষ আগেকার আফ্রিকার, নইলে বাওবাব গাছের কথা আসে কেন?

গানও কি গোপনে থাকে, নিজের মতো!

আর, সার্কিট হাউসের পিছনের কাঁঠাল তলায় দেশ থেকে আসা ওদের জ্ঞাতি-আত্মীয়রা গাইছে-

তঁকে যেরে দেখেছিলি শুয়ার বাগালি

শুয়ার টুয়ার ছাড়ে বরা বর সাজে আলি...

...সেই কবেকার ছেড়ে আসা পশুপালক জীবনের গান যা রক্তের ভিতরে বয়ে গেছে।

রাত হয়। জ্ঞাতিরা টলোমনো পায়ে ফিরে যায়। যাবার সময় আশীর্বাদ করে যায় এ ছেলে কাশীপুরের রাজা হবে ফের। কে বলে এম্পি হবেক, এম্পি। একজন বড়োলোকের ব্যাটা লো বলে থেমে যায়। তারপর বলে খাংলা খাংলা চুল, তুয়ার গায়ে বাইয়ে পড়ুক হলুদ কদম ফুল।

## সিলি সিলিকোন

এ ই দ্যাখো না, কী মুশকিল, আমাকে না লিখতে বলেছে। তাও আবার গল্প। আমি কবিতা লিখেছি কয়েকটা, কিন্তু গল্প লিখিনি। আমাকে ওরা বলল তোমার জীবনে কী কম গল্প আছে, ওসবই লেখো।

আছে তো, আমার জীবনে তো সেই ছেলেবেলা থেকেই, সরি, মেয়েবেলা থেকেই গল্প। কাউকে হয়তো গল্প করতে পারি তা নিয়ে, কিন্তু গল্প লেখা যায় না। সব গুলিয়ে যায়। একটার ঘাড়ে আর একটা উঠে – ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের ছবি হয়ে যায়।

চার-পাঁচ বছর আগেকার একটা কথা বলি, অ্যা? রবীন্দ্রসদনে গেছি, পঁচিশে বৈশাখে প্রতিবারই যাই। ওখানে ওই গরমের মধ্যে আলোকাদি ভীষণ সেজেগুজে এসেছে। শাড়ি পরেছে, মাথার খোঁপায় বেলফুলের মালা, আইল্যাশ, কাজল, লিপস্টিক–সব। ওই গরমে ঘামছে। আরে ঘামবেই তো। খোঁপাটা তো ফলস। টাইট করে শাড়ি পরেছে, বুকটা উঁচিয়ে রয়েছে। আমি আলোকাদির সঙ্গে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে গল্প করছি, এমন সময় ওখানে তাপসদা এলেন। তাপসদা কলকাতা দূরদর্শনে আছেন। আলোকাদির সঙ্গে ভালোই পরিচয়-টরিচয় আছে। তাপসদা আলোকাদিকে দেখে বলল–আরে আলোক, কী করে দিয়েছ, অ্যা? চেনাই যাচ্ছে না...।

আলোকাদি তাপসদাকে বলল–শুনুন তাপসদা, আমাকে আর আলোক বলে ডাকবেন না। আমি আলোকা। ভালো লাগছে আমাকে? তাপসদা বলল, দারুণ লাগছে। তখন মনে আছে রবীন্দ্রসংগীত শোনা যাচ্ছিল–এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ...। আলোকাদি বলল–সেক্সি লাগছে?

হেবি।

এমন সময় একটা পাখি গাছ থেকে পটি করে দিল, আর আমার কাঁধে-টাঁধে ওসব পড়ল। তাপসদা তখন ওর পকেট থেকে কাগজ বার করে আমার কাঁধ থেকে পরিষ্কার করে দিল। আমি সালোয়ার-কামিজ পরেছিলাম। তাপসদা ওরকম করছিল বলে আমার লজ্জা করছিল। সবাই ড্যাভড্যাভ করে দেখছিল। একটুখানি আমার বুকোও লেগেছিল। তাপসদা খুব ভদ্রলোক, নিশ্চয়ই বুকো হাত দিত না, তবু আমি সরে গেলাম। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে তাপসদাকে একটু আড়াল করে বুক থেকে মুছে নিলাম। আলোকাদি কী অসভ্য। ও বলল, তোর লিলকি নিয়ে এত ফুন্টির কী আছে রে? কাকও তেমন, তোর গায়েই হাগে। তাপসদার হাত চেপে ধরে আলোকাদি। হাতটা সোজা ওর বুকো টেনে নেয়। বলে; দেখুন কেমন, একদম অরিজিনালের মতো নয়? দেখলে হবে? খরচা আছে। তারপর মুহূর্তেই তাপসদার হাতটা টেনে নিয়ে আমার বুকো লাগিয়ে দেয় আলোকাদি, বলে–ন্যাকড়া, ন্যাকড়া। একটা থার্মিফোর ব্রা-এর ভিতরে ঢোকানো ছেঁড়া ন্যাকড়া...।

কী অপমান লাগল আমার। আমি ভীষণ লজ্জা পেলাম। মাথা নিচু করে চলে গেলান রবীন্দ্রসদন চত্বর ছেড়ে। রূপে তোমায় ভোলাব না ভালোবাসায় ভোলাব ছেড়ে।

আলোকাদি ইংলিশে এম.এ। একটা এন.জি.ও-তে চাকরি করে। বড় চাকরি। ভালো মাইনে। ও বম্বে গিয়ে বুকো সিলিকোন করিয়েছে। অনেক সিনেমা আর্টিস্ট এসব করায়। আলোকাদি বড় বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে হরমোন থেরাপি করেছে। কিছুদিন আগে ভালো প্লাস্টিক সার্জেনকে দিয়ে ছিবড়ে নিয়েছে। ওর ওপর রাগ আছে বলে ‘ছিবড়ে’ বললাম, লিকম্ কেটেছে। ক্যাসট্রেশন। আমি ওসব করতে পারিনি, তাই বলে কি আমি মেয়ে নই। আমার শরীরটা ব্যাটাছেলের হতে পারে, কিন্তু আমি তো মেয়ে। এতগুলো লোকের সামনে রবীন্দ্রসদনের মতো জায়গায় তুমি একটা ছেলের হাত আমার বুকো ঠেকালে। ঠিক করেছিলে এটা? তোমার টাকা ছিল বলে এটা করেছিলে। টাকার অহঙ্কারে। তুমি যদি মেয়ে হতে, এরকম করতে পারতে না। মেয়ে শুধু লিল্কি-চিপটিতে হয় না। মনের ভিতরে থাকে নারীত্ব। সেই দিন থেকে তোমায় আমি ইয়ে করি আলোকাদি। তুমি তো আলোক ছিলে। তুমি তোমার নামের পর একটা লিকম্-এর মতো আকার বসিয়ে মেয়ে হয়ে গেছ। আমি এত সহজে হইনি। আমার স্কুলের নাম সনাতন। আমি সনাতনী হতে পারতাম, সাম্বনাও হতে পারতাম, কাছাকাছি হত। কিন্তু আমি প্রীতি। প্রীতি শব্দটাই ভালো লাগে খুব। যেন জলের ঝাপটা, যেন জুঁইয়ের পাপড়ি, যেন বাচ্চা ফোটাতে বলে ডিমের ওপর হাঁসমায়ের বসে থাকা। প্রীতি থেকেই তো পিরিতি কথাটা এসেছে। প্রেম-পিরিতি। কিছুদিন আগে মার্গারিটা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। গে আর লেসবিয়ানদের নিয়ে একটা ছবি করেছে। ও আমাকে ডাকছিল প্রিটি। প্রিটি শব্দটাও খুব সুন্দর।

নামটার জন্য কম ঝামেলা? সেদিন তো হাজার টাকা লস। তাপসদা টিভিতে একটা কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে ডেকেছিলেন। আমি কবিতা লিখি প্রীতি মিত্র নামে। চেকও তৈরি হল প্রীতি মিত্র নামে। আমি কী করব ওই চেক? তাপসদাকে আগেই বলে রাখতে পারতাম, আমার আসল নাম সনাতন দাস, ওই নামেই যেন চেকটা হয়। বলিনি। আমি প্রীতি মিত্র। আসল নাম, নকল নাম বুঝি না। সনাতন দাস আমার সার্টিফিকেটের নাম। একটা সার্টিফিকেট সব নয়। ওই চেক আমি ভাঙাতে পারিনি। কারণ ব্যাংকে আমি সনাতন দাস। ভোটার হিসেবে আমি সনাতন দাস কিন্তু কবি হিসেবে আরি প্রীতি মিত্র। ওই চেক আমার কবিতার স্বীকৃতি। ওই চেক আমি যত্নে রেখে দিয়েছি। আমি বই করব। কবিতার বই। প্রীতি মিত্র নামে। ওই তো আমি সেদিন হাসপাতালে গেলাম। কার্ড করলাম। নাম বললাম প্রীতি মিত্র। সেক্স-এর ঘরে লোকটা নিজে থেকেই লিখেছিল এফ। আমার খুব বমি বমি পাচ্ছিল। ডাক্তারকে বললাম। ডাক্তার ওষুধ লিখে দিল। বাচ্চা ডাক্তার। ইউরিন টেস্ট করাতে বলল। প্রেগন্যান্ট ভাবল? খুব আনন্দ হল আমার। পরে দেখি বিলিরুবিন টেস্ট করতে লিখেছে। আমার না, মাইরি বলছি, গাইনি সেকশনে দেখাতে ইচ্ছে করে, খুব ইচ্ছে করে...। ও ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আমার খুব বেশি পিরিয়ড হচ্ছে।

ওইসব পিরিয়ড-টরিয়ড আমি খুব ছোট বয়েস থেকেই জানি। আমি ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে মিশতাম। ওদের সঙ্গে একাদোকা খেলতাম। ছন্দা আর মায়ার সঙ্গে পুতুল খেলতাম। পুতুলের বিয়ে দিতাম। পুতুলকে দুদু খাওয়াতাম। মেয়েদের মতোই বসে হিসি করতাম। আমার নুফুটাকে আমি দু’চোখে দেখতে পারতাম না, কিন্তু অন্য ছেলেদের নুফু দেখতে ভালো লাগত। ছন্দা আর মায়ারা ওদের সব কিছু আমায় বলত। পাড়ার ছেলেরা আমাকে লেডিজ বলত। বাবা, মা দু’জনেই আমাকে বকেছে, মেরেছে। আমাকে বলত-একাদোকা নয়, বল খেলগে যা। ঘুড়ি ওড়াগে যা। আমি যেতাম না। বাবা আমাকে ‘একটা মেয়ে

কোথাকার' বলে মেরেছে। মেয়ে একটা খিস্তি। শূয়ার-খচ্চর-গাণ্ডুর মতো একটা খিস্তি। অথচ আমার আগে নাকি একটা বোন হয়েছিল আমার। ও আন্দ্রিকে মারা যায়।ওর জন্য মা-বাবার আফশোশ শুনতাম। কিন্তু আমাকে ওরা মেয়ে ভাবতে পারল না। কী করে ভাববে। আমি নুঙ্কুধারী যে। ওই একটা অঙ্গ দিয়েই তো বিচার করা হয়। আমি মায়ের আলতা ঠোটে লাগাতাম বলে মার খেয়েছি, তবু সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মায়ের শাড়ি পরেছি, বউ হয়েছি, গভীর রাতে বাবার কোলবালিশটাকে চিমটি কেটেছি। কোলবালিশ তো নয়, ওটা আমার বর।

ছন্দা মায়া, ওদের পিরিয়ড হল। ওরা মেয়ে হয়ে গেল। আমি বেশ বুঝলাম ওরা আমাকে অ্যাভয়েড করছে।

স্কুলে ছেলেরা আমায় চাঁটি মারত, স্যারদের মধ্যে কেউ কেউ হিজড়ে বলত। তখনও হিজড়ে ব্যাপারটা বুঝতাম না ভালো। আর ভূগোল স্যর আমাকে ম্যাপ পয়েন্টিং শেখাতেন ছুটির পর। গরমের ছুটিতে বাড়িতে যেতে বলতেন।

মাধ্যমিকটা পাস করেছিলাম। টায়-টায় সেকেণ্ড ডিভিশন হয়েছিল। ইলেভেনে ভর্তি হলাম, কো-এডুকেশন ছিল। ওখানে মেয়েরাও আমাকে হ্যাটা করত। কেউ কেউ আমায় দেখে হাততালি দিত। আমি ওদের বলতাম আমি তোমাদেরই লোক। আমার লালি মাসি হয় না বটে, কিন্তু আমি তো...। আমার মা, কলেজে দু'টো বয়ফ্রেন্ড হয়ে গেল। অশোক আর বিকাশ। ওদের মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসি ঠিক বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আমায় নিয়ে ওদের কোনও প্রবলেম ছিল না। পরে জানলাম অশোক ডাবলডেকার। মানে উভকামী। তখন বিকাশকেই নিজের ভাবতাম। বিকাশ পড়াশোনায় ভালো ছিল; আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম বিকাশ যেন ডাক্তার হয়, মস্ত বড় ডাক্তার হয়ে ও আমাকে অপারেশন করে মেয়ে করে দেবে। আমি আর ও সংসার করব। মাইরি, আপন গড, আমি এসব ভাবতাম। একদিন বিকাশের কাকা আমাকে খুব প্যাদাল। ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। বিকাশ আমার সঙ্গে আড়ি করে দিল। ব্যাপারটা রটে গেল। স্কুলে আমার নাম হয়ে গেল পি.এম। মানেটা নিশ্চয়ই বিতাং করে বলে দিতে হবে না।

গেল আমার কুল। মানে স্কুল। পড়াশুনোয় ফুলস্টপ। বাবা ভীষণ খচে গেল। আমার সঙ্গে কথাবার্তা পুরো বন্ধ। মায়ের সঙ্গেও বেশি কথা হত না। আমি নাচের স্কুলে ভর্তি হলাম। মাইনে নিজেই জোগাড় করতাম। আমার নিজস্ব ইনকামের রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ধুরানি হয়ে গিয়েছিলাম কিনা। পি.এম স্ট্যাম্পটা পড়ে গিয়েছিল আমার সন্তায়।

বাবার ক্যানসারের কথাটা অত ডিটেলে বলতে ইচ্ছে করে না। কাশি। তারপর কাশির সঙ্গে রক্ত। বুকো জল। জল বার করার দৃশ্যটা মনে আছে খুব। বাবার অফিসের লোকরা ঠাকুরপুকুরে ব্যবস্থা করল। ওখানে একমাস। তারপর বলল বাড়ি নিয়ে যান। কিছু করার নেই। আবার বাড়ি। বাড়িতে একটা আয়া রাখা হল। সেই আয়াটা ওর একটা মাস ছয়েকের বাচ্চাকে নিয়ে আসত। ওর নাম ছিল বাসবী। বাসবী মাঝে মাঝে এসে বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাওয়াত, তখন আমাকে ওই ঘর ছেড়ে চলে যেতে হত। কিন্তু অনেকটা সময় আমি বাচ্চাটার গায়ে আলো হয়ে পড়ে থাকতাম। বাচ্চাটির গায়ের গন্ধ নিতাম। বাচ্চাটা হিসি করলে আমি কাথা পালটে দিতাম। বাসবী এসে দেখত কাথা পালটানো হয়ে গেছে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসত। ওই

হাসিতে একটু কৃতজ্ঞতাও মেশানো থাকত। একদিন আমি একটা কাজ করে ফেললাম। বাজে কাজ। আমার গেঞ্জির ভিতরে ইলু ইলু পুরলাম। মানে জল ভরা মোটা পর্দার বেলুন। বাচ্চাটাকে আমার বুকের ওপর চেপে ধরলাম। বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। বাসবী ছুটে চলে এল। ছুটে এসে আমাদের ওই অবস্থায় দেখল আর খুব জোরে চিৎকার করে উঠল। ওর চিৎকার শুনে মা ও বাবা ওপর থেকে বলতে লাগল কী হল? আমি ইচ্ছে করেই আমার গেঞ্জির ভিতর থেকে ইলু ইলু সরাইনি। মা আমার হাত ধরে বাবার ঘরে নিয়ে এল। বাবা আমার দিকে অপলক চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, অমন করে না মা...। বাবার কাছ থেকে পাওয়া ওটাই আমার লাষ্ট প্রাইজ। ওটাই আমার সারপ্রাইজ। কিন্তু মা তখন রাগে কাঁপছে। মেয়ে হয়ে একটা মেয়েকে বুঝতে পারছে না। বাবার ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে আমার ফোলা বুকে খোঁচা দিয়ে বলল, ঢং হচ্ছে, ঢং।

ঝরনাধারার মতো বেলুন থেকে দুখী জল বেরিয়ে গেল মাটিতে। বাবা পরদিনই মারা যান। তখন আমার একুশ বছর বয়েস।

আজ আমি সাতাশ। তখনকার সনাতন দাসের সঙ্গে আজকের এই প্রীতি মিত্রর অনেক তফাত। আমার জীবনে টার্নিং পয়েন্ট রবীন্দ্রসদনের ওই ঘটনাটা, যেটা আগেই বলেছিলাম। সেদিন আলোকাদির মুখ থেকে ছুটে আসা ন্যাকড়া ন্যাকড়া আমাকে পালটে দিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম আমিও দেখে নেব। ততদিনে তো আমার বাবা মারা গেছেন। বাবার মৃত্যুর পর মা কেমন চিপসে গেল। বাবার এল আই সি, পি.এফ. গ্র্যাচুইটি-এসব থেকে অনেক টাকা পাওয়া গেল, তার ওপর পেনশন। তার ওপর আমার নিজস্ব রোজগার। নাচে তেমন পরিসা না পেলেও একটা ইউনিসেক্স বিউটি পার্লার থেকে রোজগার ছিল। ওখানে খোমর করতাম, ভালো ইনকাম। ঠিক করলাম, আমিও হরমোন করাব, সিলিকন করাব, প্লাস্টিক সার্জারি করাব। বাবার মৃত্যু আমাকে ওই সুবিধাটা করে দিল। অনেকেই ছি ছি করে উঠছেন, না? তা আমি কী করব? বাবা মারা গেলে আমি কী করব? কিন্তু শ্মশানে বাবার বন্ধুদের কথাবার্তা কানে আসছিল। বাবার নাকি আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা ছিল। বাবার মৃত্যুর জন্য নাকি আমিই চেষ্টা করলে কমপ্যাশনেট থ্রাউণ্ডে আমার চাকরির জন্য নাকি চেষ্টাও করা যায়, কিন্তু আমার মতো মৌগার জন্য ইউনিয়ন চেষ্টা করবে না...।

হাতে টাকা হলেই সাহস বেড়ে যায়। আগে আমি পুরুষ পোশাক ছাড়তে পারিনি। এবার পারলাম। এবার পারিক নিয়ে ঘুরতে লজ্জা নেই আর। ছমকাতে লাগলাম, আমার পৃথিবীটায় যেন বসন্ত এল। মাইরি, যেন অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে। আমার কবিতা পেতে লাগল। প্রেমের কবিতা নয়, সংগ্রামের, সংগ্রামের। নিজেকে পূর্ণ করতে লাগলাম, আমার অন্তর আর বাহিরকে যে মেলাতে লাগলাম-সেটা কি সংগ্রাম নয়?

আমি যুদ্ধ করলাম। সে অনেক কথা। কথা ও কাহিনি। লিখতে পারলে উপন্যাস হয়ে যাবে। সন্না দিয়ে গৌফ-দাড়ি তুলতাম আগে, হরমোন করার পর ওসব বন্ধ হয়ে গেল। গলার স্বরও পালটে গেল। আমারও চেষ্টা ছিল। সরু গলায় কথা বলা প্রাকটিস করতাম। কেউ শেখায়নি, নিজে নিজে করতাম। ওটাই এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। বুকটা করে ফেলেছি। ডাক্তার দাশগুপ্ত আমাকে একটা কী সুন্দর শ্রী-অঙ্গ করে দিয়েছে। আর আমার জন্ম থেকে পাওয়া লিকম্‌টা-তুলো-রক্ত-গজ ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে কোন ডাস্টবিনে। ওখানে মাছি উড়ুক। আমার একজন প্রেমিকও জুটে গেল। আমার বাড়িতেই থাকে। ঘর জামাই। মা ওকে মেনে নিল।



আমার কবিতা পেতে লাগল। পৃথিবীতে কত কবিতা। কবিতা তো ফেমিনিন জেগার। কবিতা স্ত্রীলিঙ্গ কেন? আর একটু বলব। আমার সুখের কথা। আমার প্রেমিকটা খুব ভালো। আমাকে খুব আদর করে। আমি বলেছি আমি তো তোমায় বাচ্চা দিতে পারব না...ও বলেছে সব মেয়ের কি বাচ্চা হয়?

আমার মায়ের স্ট্রোক হল। হাসপাতাল থেকে ফিরে বাড়িতে। বিছানায় সব কিছু। প্যারালিসিস হয়ে গেল। আয়া রাখতে হল। আবার আয়া। এর নাম সুমিত্রা। এই আয়াটারও একটা দুধের বাচ্চা। বাচ্চাটিকে বুকুর দুধ খাওয়ায় সুমিত্রা দেখে আমার হিংসে হত। হিংসে হওয়া উচিত নয়, আমি জানি। ভগবান ওকে দুধে ভরা স্তন দিয়েছে। ও বাংলার বধু বুকুে তার মধু। আর আমার নয়নে নীরব ভাষা। আমার ওই ভাষার ট্রান্সলেশন হয়? আমার বুকুে যদিও সিলিকোন, তবু আরও ভিতরে, ওই সব সিলিকোন-টিলিকনের আরও গভীরে, গোপনে, একটা রূপকথার কৌটোয় হীরের টুকরোর মতো ভালোবাসা লুকোনো আছে, ডাক্তাররা জানে না। ওই সব ম্যামারি গ্ল্যাণ্ড-ট্যামারি গ্ল্যাণ্ডকে বিলা করে বুকুর ভিতর থেকে কীরকম যেন একটা আহ্বান-দুদু খাবি সোনা?

মাঝে মাঝে আমি আয়নার সামনে সব খুলে-টুলে দাঁড়াই। নিজেকে দেখি। আজি এ নিরলা যজ্ঞে আমার অঙ্গ মাঝে, বরণের ডালা সেজেছে আলোকমালার সাজে। জানি এই সবই ইস্ট্রোজেন প্রজেষ্টেরনের খেলা, জানি ডাক্তার দাশগুপ্তর হাতযশ। তবু তো কবিতা...

নব বসন্তে লতায় পাতায় ফুলে  
বাণী হিল্লোলে উঠে প্রভাতের স্বর্ণকূলে  
আমার দেহের বাণীতে সে গান উঠিছে দুলে...।

আমার দেহের বাণীতে-কেন যে, দুদু খাবি সোনা...। দুদু খাবি সোনা...।

বাচ্চা দত্তক নেবার কথা ভেবেছিলাম। হল না। আইন নেই। বললাম দুধের বাচ্চা নেব না, একটু বড় বাচ্চাই নেবাওরা বলল না, হয় না। আইন নেই। তোমার নারীত্ব বৈধ নয়। তা হলে? আমি যদি পাসপোর্ট করি, কী লেখা হবে? মেল না ফিমেল? মরে গেলে ডেথ সার্টিফিকেটে?

মায়ের আয়া সুমিত্রা জানে আমি অপারেশন করে মেয়ে হয়েছি। সুমিত্রা আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। বলেছি। সুমিত্রাও ওর নিজের মেয়েলি কথা বলে। একদিন দেখতেও চেয়েছিল। দেখিয়েছি। সুমিত্রা অবাক হয়েছিল। বলেছিল বাব্বা, একদম সেম সেম। আমি বললাম ওরা সব করতে পারে, কিন্তু লালি মাসিটা দিতে পারে না। বাচ্চা ধরার থলিটা বানাতে পারে না। সুমিত্রা বলে, একদিন হয়তো সেটাও হবে। আমি বললাম, ততদিনে আমরা মরে যাব।

সুমিত্রার সামনে একদিন বুক খুলে দিলাম, বললাম, তোমার বাচ্চাটাকে একটু দেবে? এখানে ওর মুখ ছোঁয়াব...। ফুল ছোঁয়াব। সুমিত্রা আমার খুব ভালো বান্ধবী। ও দিল। আমার নিপ্ল-এ ওর নিষ্পাপ ঠোঁট রাখল। উঃ। কী আনন্দ।

মাঝে মাঝেই এরকম করতাম। বাচ্চাটা দুধ পেত না বলে ওর কচি হাতে তোলপাড় করত আমার শরীর। আমার সর্ব অঙ্গে বাঁশি বাজত। ওকে দোলাতাম, আমিও দুলাতাম তাই। আমার মায়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপ

হতে লাগল। শূন্য দৃষ্টি। আমি কেবল বলতাম, মা তুমি থাকো। তুমি যতদিন থাকবে, ততদিন বসন্ত।

মা মারা গেল। মা চলে গেল বলে সুমিত্রাও চলে গেল। সুমিত্রার বাচ্চাটাকে শেষবারের মতো...। বাচ্চাটা অস্ফুটে যেন বলল মা... মা...। আমাকে? ওর কি কথা ফুটছে? মুখ থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম শব্দ, আদি শব্দ...। আমাকে?...।

ওরা চলে গেল। সিলিকোন পড়ে থাকল।

## ভ্যাম্পায়ার

স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি হয়েছে সুমিতের। প্রথম পোস্টিং বাঁকুড়া জেলার খুরুল নিত্যানন্দ বিদ্যামন্দিরে। সোনামুখী থেকে দশ কিলোমিটার ভিতরে। কাঁকুরে জমি, জঙ্গলের কিছুটা অবশেষ আছে। জলের কষ্ট। স্কুলে কুয়ো আছে একটা। স্কুলের পাশেই একটা ছোট বাড়ি। ছ'টা ঘর। ওখানে কয়েকজন মাস্টারমশাই থাকেন। বেশিরভাগ মাস্টারমশাইরাই সাইকেলে কিংবা মোপেডে ৭-৮-১০ কিলোমিটার দূর থেকে যাওয়া আসা করেন। এদিকের অনেকটা জমিতে শুধু ঘাস হয়। ওরা বাবুইঘাস বলে। তা দিয়ে এটাসেটা বানায়, দড়িও বানায়। কিছু জমিতে ধান হয়, বছরের একটাই ফসল। অনেকেই ছাগল চরায়। কেউ কেউ পোলট্রিও করেছিল। সুমিত এখানে এসে একটা দারুণ কথা শুনল ওদের স্কুলের একমাত্র পিয়নের মুখে – কালে কালে কী হইল স্যার, মুরগিরও বাটফুলো রোগ হল। বাটফুলো রোগটা গোরু-ছাগলের হয়। এখানে বার্ডফ্লুকে ‘বাটফুলো’ রোগ বলছে। এখানে আর পোলট্রি নেই। ইংরেজির স্যার বলেছেন সব কিলিং করে দেওয়া হয়েছে। কালিংকে কিলিং বলছে আর কী।

এদিককার লোকেরা কাজের খোঁজে পুবে যায়। আর সুমিত কাজের খোঁজে পুবে থেকে এসেছে পশ্চিমে। সুমিতের বাড়ি বর্ধমানে। বর্ধমান শহরে ওদের বাড়ি, গুসকরার দিকে ওদের গ্রামের বাড়ি। বনপাস স্টেশনের দিকে আধঘণ্টার হাঁটপথে। ওদের জমি বেশিটাই বর্গা দেওয়া আছে। সুমিতের বাবা চালের ব্যবসা করতেন, একটা আড়ত ছিল। সুমিতের বাবা গত হয়েছেন তিন বছর হল। সুমিতের উপরের দুই ভাই এখন চালের ব্যবসাটা দেখাশুনো করে। সুমিতের এক দিদিও আছে। জামাইবাবুর একটা কোন্ডস্টোরেজের মালিকানা আছে। হোটেলও আছে। জামাইবাবুর বর্ধমানের উপকণ্ঠে কুনুর নদীর ধারে দারুণ বাড়ি। কলকাতাতেও ফ্ল্যাট আছে। বিয়েটা সুমিতের বাবাই দিয়ে গিয়েছিলেন। সম্বন্ধ করা বিয়ে। কিন্তু দিদি-জামাইবাবুর মনে সুখ নেই।

সুমিতের পুরো নাম সুমিতকুমার যশ। ওরা উগ্রক্ষত্রিয়। উগ্রক্ষত্রিয়কে সংক্ষেপে আগুরি বলা হয়। আগুরিদের নাকি খুব তেজ। খুব সাহসী হয় নাকি ওরা। সুমিতের মনে হয় ও হল আগুরি কুলের কলঙ্ক। একদম রাগ নেই, জেদ নেই, এমনকী অ্যাশিশনও নেই। বি এসসি পাশ করেছিল জুলজি অনার্স নিয়ে। তারপর স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে চাকরিটা পেয়ে গেল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এসসি পড়তেই পারত ও, দাদারা বলেছিল আমাদের তো তেমন হল না, তুই পড়। যতদূর পারিস পড়। সাইনটিস্ট হয়ে যা, না হয় ডি এম হয়ে যা।

কিছু হয়নি সুমিত। মাস্টার হয়েছে। এই স্কুলটা দশ ক্লাস পর্যন্ত ছিল। হালে এগারো-বারো স্যাংশন হয়েছে। ক্লাস ফাইভ থেকেই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই পড়ে। ক্লাস এইটের পর মেয়েদের সংখ্যা কমতে থাকে। এগারো ক্লাসের বিজ্ঞান বিভাগে আটচল্লিশ জনের মধ্যে মাত্র পাঁচজন মেয়ে। স্কুলের কোনো ইউনিফর্ম

নেই। যে সব পোশাক পরে আসে সেগুলো বড় মলিন। সেলাই করা। কলকাতার রাস্তায় চল্লিশ টাকায় যেসব জঙ্গল ছাপ শার্ট ফুটপাতে ঢেলে বিক্রি হয় তা এইসব জঙ্গল অঞ্চলে আসে না।

ক্লাস এইটের একটা ছেলের একদিন প্রচণ্ড পেট ব্যথা। ব্যথায় শুয়ে পড়ল। সুমিত জিজ্ঞাসা করল আজোবাজে খাবার খেয়েছ বুঝি কিছু?

ছেলেটা মাথা নাড়ে।

কী খেয়েছ তবে।

ছেলেটা বলে কিচ্ছু খাইনি স্যার।

কিচ্ছু না খেয়ে স্কুলে এসেছ? বিকেল চারটে পর্যন্ত খালি পেটে থাকবে? আজ তো মিডডে মিলের মাসী আসেনি।

ছেলেটা বলে না খেয়েই তো আসি।

সুমিত জানতে পারল এরকম অনেকেই কিছু না খেয়ে আসে। স্কুলে মিডডে মিল পায়। কেউ কেউ শুধু দুটো মুড়ি খেয়ে আসে। কেউ কেউ পান্তা।

বর্ধমান জেলায় এতটা দরিদ্র গ্রাম বোধহয় নেই। এর মধ্যেও পড়াশুনো করছে ওরা, ভাবতেও ভালো লাগে। কেউ কেউ ধানকাটা বা ধান ওঠার সময়টা স্কুলে আসে না। জন খাটতে যায়। জন খাটতে বর্ধমান জেলাতেই যায়। বর্ধমানের মাটিটা ভালো। তা ছাড়া বর্ধমানে তো সেচ আছে। ডিভিসি।

সেদিন সুমিত তাড়াতাড়ি ওর কোয়ার্টারে গেল। হাঁড়িতে ভাত ছিল। কিছুটা তরকারিও ছিও। বাটি করে নিয়ে এসে ছেলেটাকে দিল। ছেলেটা ভাত খেল।

একটু পরেই পেট ব্যথা কমে গেল ছেলেটার।

সুমিত জানে এটা গ্যাস্ট্রিক পেইন। প্রায়শ পেট খালি থাকলে এরকম ব্যথা হতেই পারে। এর প্রধান চিকিৎসা হল খাওয়া। পেট খালি না রাখা।

ছেলেটার নাম নিবারণ রুইদাস। বোধ হয় মুচি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাগদি আছে, কর্মকার ও কুম্ভকার আছে, মাহাতো আছে কিছু সাঁওতালও আছে। বর্ণহিন্দুও বেশ কিছু আসে। বামুন ও কায়েত খুব কম। যখন জঙ্গল কেটে কৃষি জমি তৈরি হয়, প্রথমেই তখন শিল্প তৈরি করতে হল। আদি শিল্পটি কামারশালা। চাষের জন্য লাঙল, কোদাল এসব দরকার হত। কিন্তু মুচিরা বোধ হয় অনাহুত। গোরু-টোরু মরে গেলে সেই চামড়া ছাড়িয়ে নেবার জন্য ওরা আসত। আর বাঁচতে গেলে কোথাও তো ডেরা বাঁধতেই হয়। সুমিত ওদের গ্রামের বাড়ির শেষ প্রান্তে, তিন-চার ঘর রুইদাস দেখেছিল। ওদের অবস্থা খুব খারাপ।

সেদিন নিবারণকে দুটো ভাত খাওয়ানোর পর নিবারণ আর সুমিতের মধ্যে কেমন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। নিবারণের চাউনিটা কেমন যেন পালটে যায়। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা কৃতজ্ঞতা, কিছুটা ‘আর কখনও করবো না’। সুমিত অন্যের আড়ালে নিবারণকে ডেকে মাঝে মাঝে তিন টাকা দামের বিস্কুট প্যাকেট হাতে গুঁজে দেয়।

নিবারণ পড়াশুনায় মন্দ নয়। ওদের ক্লাসে জীবনবিজ্ঞান পড়ায় সুমিত। বইয়ের ছবিতে ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র, পায়ু এগুলোকে নিবারণো বলে খেটোনাড়ি, ভুকুনারি, পোঁদছ্যাঁদা। অবলীলায় বলে। কারণ এখনও সুযোগ পেলে

এই কাজ করে। পরব-টরবে খাসি কাটা হলে ছাল ছাড়াবার ডাক পায়। তবে ছালটা এখন আর কেউ ফোকটে দেয় না। কিনতে হয়। নিবারণের সঙ্গে মাঝে মধ্যে গল্প করে সুমিত। নিবারণের বাবা নেই। তিন বছর আগে মারা গেছে।

কী হয়েছিল?

পেটে জল। যখন পোড়াতে গেলাম ফয়রার মত জল বেরোল।

সুমিত জানে পেটে জল, মানে অ্যাসাইটিস কোনও রোগ নয়। অন্য রোগের উপসর্গ। লিভারের সিরোসিস হলে পেটে জল জমে।

তোর বাবা মদ খেত?

খুব। সারাদিন। সব পয়সা উড়াত।

নিবারণের মা খাটিতে যায়। ওর এক বড় ভাই আছে, আর দুটো বোন আছে। ওর দাদা ক্লাস ফোরের পর পড়েনি। বোন দুটো স্কুলে যায় দুপুরে। মিঠে মিল পায় বলে। মাঝে মাঝে লুটিস আসে – সাপ্লাই নেই বলে মিঠে মিল হবে না, তখন স্কুলে যায় না। বুঝতে অসুবিধে হয় না। মিঠে মিল মানে মিড-ডে মিল।

-কেউ পড়াশুনো করল না, তুই যে পড়ছিস বড়? দাদা বলে না আমার পয়সায় খাচ্ছিস?

সুমিত জিজ্ঞাসা করে।

-ঠিক স্যার। দাদা কথায় কথায় বাথান করে আমার পয়সায় খাচ্ছিস -লাজ নাই? মাগনার উপর চাখনা? আমি বলি তুমার একার পয়সায় খাচ্ছি নাই। মাও রোজগার করে, নিজেও করি।

-এত গল্পনা নিয়েও পড়াশুনোটা করিস কেন নিবারণ?

-কী করব। পড়তে ভালো লাগে যে। কত কী জানছি।

-কতদূর অবধি পড়াশুনো করতে চাস নিবারণ?

-কে জানে? কমসে কম মাধ্যমিকটা তো পাশ দিব।

-তরপর কী করবি?

ঠোঁটটা উলটে চুপ করে রইল নিবারণ।

তারপর বলল, আপনার মতো স্যার হতে হলে তো কমসে কম বি এসসি পাশ দিতে হবে, তাই না?

সুমিত ঘাড় নাড়ায়।

তখন নিবারণের দীর্ঘশ্বাস জঙ্গুলে বাতাসে মিশে যায়।

সুমিত বলে কী বই পড়তে তোর বেশি ভালো লাগে?

ও বলে ভূগোল।

সুমিত বলে ভারতের পাঁচটা নদীর নাম বলত শুনি। ও বলে কুকুরানি, আঘনি, ডুলুং, কাঁসাই, গঙ্গা। সুমিত বলে ওসব কুকুরানি, আঘনি ডুলুং আবার কী নদী?

কেন ইদিককার নদী ইদিককার দী কি লদী লয়?

স্কুল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির বসবে। যেহেতু সুমিত জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক, ওর উপরই দায়িত্ব পড়ল। একটা এন জি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে। প্রেশার ইত্যাদি যেমন দেখবে, সেই সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রের মল-মূত্রের জন্য আলাদা আলাদা পাত্র দিতে হবে। ওরা একটা স্যাম্পল সার্ভে করছে। ডব্লু এইচ ও নাকি টাকা দিচ্ছে। শতকরা কতজনের মলে কৃমির লার্ভা, ব্যাসিলাস আছে, ইত্যাদি দেখা হবে। রক্তও নেওয়া হবে। পরীক্ষা করা হবে রিপোর্টও দেওয়া হবে। প্রত্যেকের রক্তের গ্রুপও নিয়ে দেওয়া হবে। পরীক্ষাগুলো এখানে হবে না নিশ্চই, বাইরেই হবে। কিন্তু আলাদা আলাদা টেস্টিউবে ঠিকমতো নম্বর দেওয়া, এবং একটা খাতায় সেই নম্বর যার, তার নাম লিখে রাখা – বিরাট কাজ। সুমিত কয়েকজনকে বেছে নিয়েছে। তার মধ্যে নিবারণও আছে। রক্ত টানা হল। রক্তের টেস্টিউবে অ্যান্টিকুয়াণ্টাল্ট মিশিয়ে নেড়ে ছিপি দিয়ে বন্ধ করা – এসব হল। অনেকে জীবনে প্রথম রক্ত পরীক্ষা করছে।

দিন পনেরো পর একটি মেয়ে রিপোর্ট নিয়ে এল। শতকরা ৪১ জনের হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। শতকরা ২৮ জনের মলে কৃমির লার্ভা এসব লেখা একটা সামগ্রিক রিপোর্টও এনেছে। এছাড়া প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে এইসব পরীক্ষার রিপোর্ট দেওয়া হবে। ওই ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করল – নিবারণ রুইদাস কে?

সুমিত বলল কেন বলুন তো? মেয়েটি বলল ওর শরীরে একটা রেয়ার, মানে ভেরি রেয়ার গ্রুপের রক্ত আছে। বোম্বাই গ্রুপ।

বোম্বাই গ্রুপ ব্যাপারটা সুমিত জানে। বোম্বাইতে প্রথম এই রক্তের স্যাম্পল পাওয়া যায় বলে এই রক্তকে বোম্বাই গ্রুপ বলা হয়েছে। তখনও মুম্বই হয়নি। তাই এটা বোম্বাই গ্রুপ। এই রক্তে মাদার অ্যান্টিজেনে H থাকে সিরামে অ্যান্টি H থাকে না। ফলে অন্য গ্রুপের রক্ত এই রক্তে মেশে না।

সুমিতের ভাগ্নেটার বোম্বাই গ্রুপ। সম্প্রতি ধরা পড়েছে ওর অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। যেটা সাধারণ অ্যানিমিয়া থেকে একদম আলাদা। সাধারণ অ্যানিমিয়া ভালো মন্দ খেলে সেরে যায়। এটা সারে না।

ভাগ্নেটার বয়স এখন পাঁচ। চার বছর বয়সেই ছোটোছুটি করতে গিয়ে হাঁপ ধরত মাঝে মাঝেই নাক দিয়ে কিংবা দাঁত দিয়ে রক্ত বেরোত। তখনই ডাক্তার দেখানো শুরু। রক্তে হিমোগ্লোবিন কম, সেই সঙ্গে ব্যাসোফিলও কম। বর্ধমানের ডাক্তাররা সব ফেল। কলকাতার ডাক্তাররা কেবল এই টেস্ট ওই টেস্ট করাল। ইতিমধ্যে গায়ে লাল লাল র্যাশ, মাঝে মাঝে জ্বর। কেউ ভাবল লিউকোমিয়া, কেউ ভাবল থ্যালাসেমিয়া। শেষ অবদি ভেলোরে বোনম্যারো টেস্ট করে এখন বলছে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। রক্ত দিতে হবে। কিন্তু দেখা গেল ওর বোম্বাই গ্রুপ। এ নিয়ে খুব চিন্তা। বোম্বাই গ্রুপের রক্ত তো বোম্বাইতে পাওয়া যায় না, তা হলে যত টাকাই লাগুক, আনানো যেত। এই রক্ত খুব কম মানুষের শরীরেই আছে। কলকাতার একটা নার্সিংহোম বোম্বাই গ্রুপ আনিয়ে দেয়। অনেক টাকা নেয়। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী তো দিতে পারে না। এজন্য দিদি জামাইবাবুর খুব চিন্তা। টাকার অভাব নেই। অথচ রক্ত পাচ্ছে না।

খুব জুলজুল চোখে, লোভীর চোখে, শয়তানের চোখে নিবারণের দিকে দৃষ্টি দেয় সুমিত।

সুমিতের জামাইযায়ু এখন নিবারণদের উঠোনে। কুলগাছের ছায়ায় খাটিয়ায় বসেছেন। খাটিয়ার এক কোণে আধাবসা সুমিত। দাঁড়িয়ে আছে নিবারণ। নিবারণের মা। একটা রোগা দুবলা কুকুর কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে এখন চুপ। সুমিতের জামাইবাবুর নাম রতনকুমার। উনি ঘামছেন।

রতন বলল – তোমার ছেলের কোনো কষ্ট হবে না। বাড়ির ছেলের মত থাকবে। ভালো খাবে, ভালো পরবে। আমরা যা খাই তাই খাবে।

-কী খেতে ভালোবাসিস নিবারণ?

নিবারণ কিছু বলে না।

নিবারণের মা বলে ডিম আর মগু।

রতন বলে – রোজ সকালে ডিমসেদ্ধ পাবে ও। রোজ মাছ। মাছ ছাড়া আমাদের খাওয়াই হয় না। রাতে প্রায়ই চিকেন হয়। স্কুলে ভর্তি করে দেব বর্ধমান টাউনে। মাস্টার রেখে দেব। শুনেছি নিবারণ অনেক পড়াশুনো করতে চায়। সে হবেখনে।

যত পড়তে চায় পড়বে।

-কিন্তু রক্ত শুষে লেবার কথা বলছিলেন যে আমাদের ম্যাস্টার ছ্যার?

-শুষে নেওয়া বলছেন কেন। মাসে একবার একটু টেনে নেওয়া করতে হবে আরেকটা জীবন বাঁচাবার জন্য। এতে ওর পুণ্যি হবে। তোমাদের সবার পুণ্যি হবে। আর রক্তের কথা বলছ মাসি, ওর কি এখানে রক্ত হয়? যা খায় তাতে রক্ত হবে কী করে? আমরা যা খেতে দেব তাতে গায়ে রক্ত হবে। রক্ত একটু টেনে নিলে আবার হয়ে যায়। শরীরের মধ্যে ব্যবস্থা আছে। গোরুর একবার দুধ দুইলে কি দুধ শেষ হয়ে যায়? পরে তো আবার দুধ হয়। তবে হ্যাঁ। জাবনা দিতে হয়। তোমার নিবারণের এখন উঠতি বয়েস। ভালো খাবে, রক্ত ভুরভুর করে তৈরি হবে। তোমাদের মাস্টারকে জিজ্ঞেস কর না।

সুমিতের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকায় নিবারণের মা। সুমিত চোখ সরিয়ে নিয়ে দুবার ঘাড় নাড়ায়। মানে হ্যাঁ বলছে।

নিবারণ তো কিছু রোজগারপাতিও করে শুনেছি। তোমাদের পুষিয়ে দোব'খনে। প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।

-ছেলে ফিরে পাব কবে? নিবারণের মা মাথা চুলকোয়।

ছেলে তো তোমারই থাকছে মাসি। তোমায় মাঝে মাঝেই দেখতে আসবে। বর্ধমান কতদূর আর? চার ঘন্টার তো রাস্তা। স্কুলের ছুটি পড়লে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোব। আমার ঘরে থাকা মানে তোমাদের ওই মাস্টারের ঘরেই থাকা।

নিবারণের মা এবার দু'হাতে নিজের খাংলা চুল চেপে ধরে। বলে রক্ত চুষে নিলে মানুষ বাঁচে নাকি। বাণ মেরে অনেক ওঝা রক্ত চুষে লেয়, মানুষ মরে যায়। ওটা হয় মন্তরে। আর তোমরা তো সত্যিকারের পিচকিরি দিয়ে রক্ত টেনে লেবে।

রতন সুমিতের দিকে তাকায়। রতন চায় সুমিত এবার কিছু বলুক। রতন নিজেকে ঝাঁকিয়ে বলে অ্যাঁই সুমিত...।

কুলগাছের একটা শুকনো পাতা সুমিতের গায়ের উপরে পড়ে। সুমিত পাতাটা সরায় না। সুমিত রতনের চোখের দিকেও তাকায় না। খাটিয়ায় একটা ঝুলে থাকা দড়ি পাকায় শুধু।

রতন দু'হাতের আঙুলে একটা মাপ দেখিয়ে বলে – এইটুকু, এইটুকু মাত্র। কিছু মনে করবেন না মাসি, মা-বোনেদের প্রতি মাসে কত রক্ত বেরিয়ে যায়। তাতে কি কিছু অসুবিধা হয়? কত লোক রক্ত বেচে সংসার চালায়। ওদের ছেলেপুলেও হয়। এইটুকু রক্ত বেরিয়ে গেলে আবার তৈরি হতে কতটা সময় লাগে – বল না সুমিত।

সুমিত বলে – চার-পাঁচ দিন।

এবার সবাই চুপচাপ। একটা ঘুঘু ডাকল। ভাদ্রে গুমোট গরম। রতন ঘাম মোছে।

নিবারণের মা বলে – বড়ছেলেটা থাকলে এখন সুবিধে হত।

নিবারণ এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল। দাদা থাগলে কী আবার বলত। বলত – যা পালা।

আমার লেকাপড়া দাদার পছন্দ না।

নিবারণের মা বলল – এটাই হয়েছে জ্বালা। রেতে কতটা কেঁরাচিনি পোড়ায়। ও কি আর পড়ালেখা করে বাবুদের মতো হতে পারবে?

কুনদিন না।

-কেন পারবে না? বললাম তো ওকে বি এ পাশ দেওয়াব। আমার উপর ছেড়ে দেন না কেনে?

আবার সব চুপচাপ। একটা শালপাতা ছেঁচড়াচ্ছে উঠোনে।

নিবারণের মা বিড়বিড় করল –

‘অবলার সঙ্গে চাষ আর অদেখার সঙ্গে বাস।’

ভালো বাংলায় এই কথাটাকেই লেখা যায় – পরকে করেছে আপন বন্ধু ঘরকে করেছে পর। কিন্তু সুমিত জানে নিবারণের মায়ের কথার ঠিক এই অনুবাদ হয় না। নিবারণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে। সুমিত বলল দাঁড়িয়ে আছিস কেন নিবারণ, বোস।

নিবারণ সংকোচে সুমিতের পাশে বসে। সুমিত ওর পিঠে হাত দেয়।

বলে, কিছু বলরে নিবারণ।

রা কাড়...।

নিবারণ বলে আপনি যা বলবেন স্যার...।

রতনকুমার তাকিয়ে আছে সুমিতের দিকে।

সুমিত দেখতে পায়-ওর বোন আর ভাগনেটাও ওর দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু নিবারণের মায়ের মুখ আকাশের দিকে।

সুমিত বলল লেখাপড়া যদি করতে চাস তো...

কিছুক্ষণ থেমে বলল চলেই যা। নিবারণ ওর মায়ের কাছে যায়। বলে – তবে যাই?

নিবারণের মা নিবারণের মাথায় হাত দিয়ে বলে আশভুলাটা...।

ভালো বাংলায় এর মানে আহারে আশামুগ্ধ ছেলে...।



নিবারণ বলে তবে আজ যাব না। আর সাতদিন পর।

রতন বলে – কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। লোকে বাগড়া দেবে। একদম চুপ মেরে থেকো। রতন একটা হাজার টাকার নোট বার করে নিবারণের দিকে এগিয়ে ধরে। নিবারণ হাত বাড়ায় না। নিবারণের মায়ের দিকে তারপর। নিবারণের মা বলে – এটা দিয়ে কী করব?

-কেন টাকা কত দরকার তোমাদের...।

-তবে খুচরো দাও না কেনে। দশ-বিশ। এই এত্ত ভারি টাকা আমরা ভাঙাইতে লাইরব।

রতন পাঁচটা একশো বার করে। পাঁচটা গান্ধিজির ছবি নিবারণের মায়ের সামনে সাজানো।

নিবারণ রোজই সকালে ডিম সেদ্ধ পায়, একটা করে। কলা, দুধ। ছাদের চিলে কোঠাটা ওর পুরো। ঘরে টেবিল, চেয়ার, বইয়ের তাক, এমনকী একটা আয়নাও।

আয়নায় এর আগে নিজেকে কখনও এভাবে দেখেনি। ওর গায়ে শ্রাবণের বীজতলা। নতুন নতুন রোম উঠছে। হাতে চামড়া আর খরখর করছে না।

কেমন বাবুদের ছেলেদের মতো লাগছে চেয়ার টেবিলে। এই কি নিবারণ রুইদাস? যেন অচেনা।

বইপত্র নিয়ে এসেছে এখানে। একজন মাস্টারমশাই রেখে দিয়েছেন রতন। সুমিত বলেছে পরীক্ষার সময় স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিলেই চলবে। ক্লাস নাইনে উঠে গেলে বর্ধমান শহরের স্কুলে ভর্তি করে দেবে বলেছে।

রতনকে কাকা ডাকে নিবারণ। রতনের ছেলেটা তা হলে ভাই। ভাই খুব সুন্দর দেখতে। ফরসা, কিন্তু ফ্যাকাশে ফরসা। ওর কত খেলনা। ঢাক পেটানো, মাথা দোলানো মানুষ, হরেন মারা গাড়ি, পুতুল হাসে হাহা হিহি। ছেলেটার নাম রাজা। রাজার সঙ্গে নিবারণের বেশ ভাব হয়ে গেছে। কাকিমা বলেছে রান্নাঘরটায় ঢুকিস না। ঢোকে না নিবারণ।

নিবারণ জানে ও মুচি। ওদের শোবার ঘরেও যায় না নিবারণ।

ওদের বাড়ির টুকটাক কাজ করে, বিকেলে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশটা একটু ঘুরে আসে।

ও আসার পরের দিনই নিবারণের গা থেকে রক্ত নিয়ে গেল। কলকাতায় টেস্ট হল। বাড়িতে রক্তের রিপোর্ট আর মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এল রতনকুমার। সব ঠিক আছে। বোম্বাই গ্রুপ।

দশদিন পর বর্ধমানের একটা নার্সিংহোমে নিয়ে গেল নিবারণকে। রক্ত টেনে নিল। কতটা নিল নিবারণ জানতে পারল না। ও তখন চোখ বুজে ছিল। চোখ বুজে ওদের গাঁয়ের পোড়া থানটার কথা ভাবছিল। জারুল গাছ, পোড়া মায়ের পাথরের পাশে মাটির ঘোড়া। হাতের রবারটা আলগা হয়ে গেল। বলল হয়ে গেছে। টেবিলে একটা ট্রেতে দুধ, ডিম সেদ্ধ, সন্দেশ।

এরকম করে মাঝে মাঝে রক্ত দিতে হবে নিবারণকে। উপরের চেয়ার টেবিল আয়না লাগানো ঘরটা কি গোয়াল? আর ডিম, কলা, দুধ বুঝি খোল খড় ভুসি?

ডিম, দুধ, কলা, খাবার সময় ওর প্রথম প্রথম লজ্জা করত। আবার একটু ভয়ও করত। কখনও কষ্টও হত – ওর বাড়ির লোকেদের জন্য। এখন যেন ও খায় না-গাদায়। ও জানে ও তো নিজের জন্য খাচ্ছে না। ও খাচ্ছে অন্যের জন্য।

পুজো এল। নতুন জামা পেল নিবারণ। একেবারে চকচকাইয়া। একশো টাকা বখশিস পেল হাতে। আর ওর মায়ের জন্য একটা শাড়ি। কাকা বলল দেশ থেকে ঘুরে আয়। মায়ের জন্য কিছু কিনবার জন্য বাজারে গেল। একটা আয়না কিনবে ভাবল। কী মুখ দেখবে মা? কিনল না। দুটো জামা কিনবে দুই বোনের জন্য? ফুটপাতে ফ্রক বিক্রি হচ্ছে। - পঁয়ষাটি করে। দুটো জামা কি করে হবে? সারা বাজার জুড়ে কত জিনিসপত্র ছড়ানো। হাতা-চিরুনি-গলার মালা-বিস্কুট প্যাকেট-মিহিদানা...। পকেটে একশো টাকা নিয়ে কখনও এভাবে বেরোয়নি নিবারণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কিনে উঠতে পারে না।

কার্জন গোটের পিছন দিকটায় একটু ভিড়। একটা লোক কালো কালো বড়ি বিক্রি করছে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যায় নিবারণ। রক্ত-রক্ত-রক্ত। লাল লাল রক্ত। শরীরের রক্ত যদি ঠিক থাকে, সার্বিসিয়েন্ট থাকে মাননীয়গণ, তবে গায়ে শক্তি থাকে। বুকে ভরা বল আর তেজে ভরা মন মানুষ হইতে হবে আমায় এখন। এই একেকটা বড়ি মানে এক কাপ রক্ত। এর এক একটা বড়ি মানে দু সের দুধ, এক সের আপেল এক পো কাজু-কিশমিশ...

একটা শিশিতে পঞ্চাশটা বড়ি। চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনল নিবারণ ওর মায়ের জন্য।

মা বলল - অ-মা, চিনাই যায় না রে তুকে। বাবুদের ছাঁ হঞে ইসেহিস... বলেই নিবারণের হাত ধরল। 'লজর লাগবে যে', বলেই নিবারণের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কামড়ে বলল ধূলার ছা, ধূলার ছা।

শাড়িটা, রক্তের ওষুধটা দিল। আর দিল বাবুদের দেওয়া টাকা, বাবুরা কথা নড়চড় করেনি।

টাকাটা নিয়ে নিবারণের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল নিবারণের মা।

মা বলল রক্ত দিহিস মাথা ঘুরে না?

নিবারণ বলে কিছু বুঝি না। বরং আগে যখন ঘরে থাকতাম, মাথা ঘুরত। খাওয়া ঠিকঠাক হলে শরীরের মধ্যে রক্ত আপনা-আপনি হয়ে যায়। মা বলে নিবারণ, রক্ত যখন টেনে লেয়, খুব কি ব্যথা লাগে? নিবারণ বলে ধুর। পিমেড়ে কামড়ের মতো। কিছু বুঝা যায় না।

দু'দিন ধরে মায়ে পুতে গল্প করল। কী কী খায় নিবারণ বিতাং করে তব্ব তালাশ নিল। নিবারণ একটু কমিয়ে কমিয়ে বলল। এত ভালো ভালো খাবারদাবারের কথা দুই ছোট বোনের সামনে বলতে লজ্জা করছিল খুব।

এমনি করে কেটে গেল আরও দু'মাস। নতুন বছর এল। নতুন বছরে নতুন স্কুলে ভর্তি হবে নিবারণ। নিবারণ খুব ভালো সুদ কষা, লাভক্ষতির অঙ্ক পারে। অ্যালজাবরাও পারে। নিবারণ হিসেব করে দেখেছে ওর পিছনে বাবুদের দেড় হাজার টাকার উপর মাসে খরচ হয়। মাস্তারই তো নেয় চারশো টাকা।

দুনিয়াতে কত সুখ। চপ-কাটলেটের সঙ্গে বেগুনি সুতোর মতো পেঁয়াজে কত সুখ লেগে থাকে। পাউরুটির গায়ে লেপটে থাকা মাখনে কত সুখ। ফ্যানের হাওয়ায় পর্দা নড়ে সুখে। কলিং বেলে টুংটাং শব্দ ফোটে সুখে। না পারা অঙ্ক যখন গোপাল স্যার বুঝিয়ে দেয়, কী সুখ। আর একটা সুখও আছে। ওই বাচ্চাটাকে দেখলে সুখ হয় বড়। বাচ্চাটা কথা বলে, ছুটোছুটি করে, নিবারণের মনে হয় ওর মধ্যেও নিবারণ আছে। নিবারণের রক্ত তো ওর শরীরে। ছেলেটা যখন স্নেটের উপর চক দিয়ে A লেখে, B লেখে, নিবারণের মনে হয় নিবারণ লিখছে। নিবারণের গাঁয়ের মুচির রক্ত আঙুরি ছানার প্রাণ বাঁচাচ্ছে। সুখ। বড় সুখ।

চার মাস হল এ বাড়িতে এসেছে নিবারণ। দশ-বারো বার রক্ত দিয়েছে। এত সুখের বদলে এটুকু এমন কী।

বাড়িতে খুব তোড়জোড়। রাজাকে নিয়ে ভেলোর যাবে ওরা। ওখানে কি একটা চিকিৎসা कराবে আর অন্যদের শরীর থেকে রক্ত নিতে হবে না। অন্য শরীর মানে তো নিবারণ। কারণ রাজা আর নিবারণ দু'জনেরই বোম্বাই গ্রুপ। হতে পারে একজন মুচি অন্যজন আগুরি। ভেলোরে গিয়ে যদি রাজা ভালো হয়ে যায়, তাহলে তো আর নিবারণকে দরকার হবে না।

ধক করে উঠে নিবারণের বুক। খাঁচার মধ্যকার সুখে থাকা একটা টিয়াপাখি ককিয়ে ওঠে।

একদিন সুমিত স্যার এ বাড়ি আসে। নিবারণের পিঠে হাত দিয়ে বলে ভালো আছিস তো? মাথার চুল নাড়িয়ে দেয়। তারপর রতনকাকার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেক কথা বলে। তারপর যাবার সময় নিবারণকে বলে তোদের বাড়ি আর একবার যেতে হবে। তোদের ভাইবোনদেরও রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে।

নিবারণ ওর চোখে প্রশ্ন চিহ্ন ধরে রাখলে, সুমিত বলে দরকার আছে। সে পরে দেখা যাবে।

ক্রমশ ওদের বাড়ির বিভিন্ন কথাবার্তায় জানতে পারল – ভেলোরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজার বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যানটেশন সম্ভব কিনা খতিয়ে দেখতে। গোপাল স্যারকে বোনম্যারো মানে কি জিজ্ঞাসা করাতে নিবারণ জানতে পারল হাত পায়ের হাড়ের মধ্যে যে তুলতুলে মজ্জা, ওটাই হল রক্ত তৈরির কারখানা। নিবারণ বুঝল রাজার ওই হাড়ের ভিতরের মজ্জার ভিতরে কিছু ওষুধপত্র-ইঞ্জেকশন দিয়ে চিকিৎসা করা হবে। টাকা থাকলে কত কী হয়।

ওরা ভেলোর গেল। নিবারণ তখন দেশের ঘরে। গাঁয়ে তখন পোড়ামার পরব চলছে। আগে মুরগি বলি হত খুব। এবার সেরকম হল না। পোড়ামা খুব জাগ্রত। পরবের সময় অনেকেই মানত করে ঢেলা বাঁধে।

নিবারণ পোড়ামায়ের থানে গেল। উবু হয়ে বসল।

কী চাইবে ও?

এখানে আসার আগে ও ভেবে এসেছিল মায়ের কাছে বলবে ভেলোরে গিয়ে রাজা যেন ভালো না হয় মা।

রাজা ভালো হয়ে গেলে তো নিবারণ বাতিল।

কিন্তু উবু হয়ে ও কথা বলতে পারল না। কিছুতেই পারল না। বরং ছেলেটাকে ভালো করে দাও বলে জারুল গাছের ডালে একটা ঢিল বেঁধে দিল।

কিন্তু নিবারণ তো জানে না বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যানটেশন করতে গেলে আবার দরকার হবে সেই বোম্বাই গ্রুপ। বোম্বাই গ্রুপের মজ্জা। সেই মজ্জা একটা শরীরের হাড়ের ভিতর থেকে টেনে অন্য শরীরের হাড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আর বোম্বাই গ্রুপ যদি কোনো শরীরে পাওয়া যায়, তার পরিবারের অন্যদেরও সেই রক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়।

বেচারি ঢেলাটাও তো জানে না এতসব। পোড়ামায়ের থানে সরল গ্রাম্য বালকের সুখে দোল খাচ্ছে মানসিকের ঢেলাটা।

## রান্সসায়ন

কি ছুদিন ধরে সুখময় সারা গায়ে একটা লোশন মাখছে। এই লোশনটি একজন রসায়নবিদের কাছ থেকে পাওয়া। অত্যন্ত তেতো, দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিশ্বাদ এই লোশন। বেশ ভালরকম টাকা খরচ করে এই লোশনটা তৈরি করতে হয়েছে জীবনের জন্য। ওর স্ত্রীর সঙ্গে ওর দাম্পত্য বন্ধ। রাত্রে দামি ফরাসি পারফিউম মেখেও জীবন-লোশনের দুর্গন্ধ তাড়াতে পারেনি সুখময়। সুখময়ের যুবতি বউ, রূপসী বউ, পাশের ক্যাম্প খাটে শোয়। সুখময়ের গায়ে রেতে মশা দিনে মাছি বসে না।

সুখময় শোবার সময় দরজা বন্ধ করে। দক্ষিণ খোলা জানালাও। খিল, ছিটকিনি, তালা সবকিছু দিয়ে শোয়। শোয়, কিন্তু ঘুমোয় না।

সুখময় এতদিন ধরে বউকে না জানিয়ে যে টাকাপয়সা জমাচ্ছিল, একদিন সেটা বউয়ের কাছে ফাঁস করে দেয়। বউকে ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে। বলে ওগো, আমি মরে গেলে একদম বিধবার মতো থেকে না। মুরগিটুরগি সব খেয়ো। আবার বিয়ে করে নিয়ো। বলতে গিয়ে গলা ধরে এসেছিল।

সুখময় হল এই নব্যবিজ্ঞানকালের মানুষ। ইলেকট্রনিক্স-তথ্যপ্রযুক্তি-কলসেন্টার- জিনেটিক যুগের সন্তান। তাই তার মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের প্রস্তাব নিজের প্রেয়সীকেও দিতে পারল। গলা কাঁপলেও।

সুখময়ের বাঁ হাতে একটি মাদুলি বাঁধা আছে। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ কর্তৃক প্রশংসিত ঈশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সুযোগ্য পৌত্র; অটলবিহারী বাজপেয়ী ও ঐশ্বর্য্য রাই কর্তৃক প্রশংসিত শ্রীউত্তমেশ্বর ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া। হাওড়ার জানবাড়িতে। নিজের জানের জন্যই এই কবচ পিটার ইংল্যান্ড বা ভ্যান হুসেন সার্টের তলায় ঢাকা থাকে, না, রাখা থাকে।

রসায়নবিদ প্রদত্ত ওই বিশ্বাদ ও বীভৎস লোশনটিও সুখময় জানবাড়িতে গিয়ে মহারক্ষা ‘ফু’ দিয়ে নিয়ে এসেছে। ওটাই মাখে। মাখতে হয়। জীবনের জন্য। কে না ভালবাসে জীবন? সুখময় আজ ছুটি নিয়েছে। ও এখন যাচ্ছে এক তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে তন্ত্রকে মিলিয়ে তিনি তন্ত্রবিজ্ঞানী। নাম ডা. বি সি বটব্যাল এম ডি-এফ ডব্লু টি (ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ট্রেনিং) বৈজ্ঞানিক কায়দায় তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ করেন তিনি। তিনি কবচের বদলে ইনজেকশন দেন। তার আবিষ্কৃত ইনজেকশনগুলির নাম এরকম।

মাদার টেরিজা ইনজেকশন (কোমল ভাব আনবার জন্য)।

রবি ইনজেকশন (পণ্ডিত রবিশঙ্করের নামে। উল্লেখ্য, রবিশঙ্কর সন্তর বছরেও পিতৃহলাভ করেছিলেন)।

লাদেন ইনজেকশন (বোঝা যাচ্ছে। ব্যাখ্যার দরকার নাই)।

মমতা ইনজেকশন (এটা কিন্তু মনের মমতাময়তার জন্য নয়। অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জির নামে। লাদেন ইনজেকশনের তুলনায় অনেক মৃদু কাজ)।

তিনি একটা ওয়েবসাইট-ও খুলেছেন। তার ওয়েবসাইট খুললে কামদায়িনী ইনজেকশন নেবার পর নরনারীর কী অবস্থা হয় তা দেখানো হয়। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ইনজেকশন, অপারেশন ও থেরাপির কথা

বলা আছে। এসব পাবেন, যদি খোলেন।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরি করেন? অথচ সন্তান দুরন্ত? তাকে শান্ত রাখার জন্য মাসে একদিন লুলুপু ইনজেকশনেই কাজ হয়।

লজ্জা লজ্জা ভাব? নিজেকে প্রকাশ করতে অনিচ্ছা! লালু থেরাপি। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চনমনে থাকতে চান। জ্যোতি থেরাপি (জ্যোতিবাবুর নামে উৎসর্গীকৃত)। মেয়েরা পান্ডা না দিলেও আমরা পাশে আছি। শাহরুকারির সাবান মাখুন (শাহরুক খান + আমির খানের মিলিত ফল)। এ ছাড়া দুর্যোধন ক্যাপসুল, বুশ ট্যাবলেট, দ্রৌপদী পাউডার, নৃসিংহ অবতার ইনজেকশন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা আছে। ওয়েবসাইটে নৃসিংহ অবতারকে দেখানো হয়। একবার সিংহের মতো মুখ ও নখ হয়ে গিয়েছিল বিষ্ণুর। নৃসিংহ অবতার হয়ে হিরণ্যকশিপুকে কোলে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন। খাওয়া নয়, ভক্ষণ। খাওয়ার মধ্যে ততটা সম্মান প্রকাশ নেই, যতটা ভক্ষণে আছে।

সুখময় এখন যাচ্ছে ওই তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে। কারণ ওর খুব ভয়। সবসময় মৃত্যুভয়। ও বাচতে চায়।

বিজ্ঞানী বটব্যাল যে-সমস্ত কাজকর্ম করেন, আগেই বলেছি, তিনি ওয়েবসাইটে বলেছেন তার মধ্যে বিজ্ঞান ভরপুর থাকে। ঝোড়ো হাওয়া আর ভাঙা দরজাটা... ইত্যাদি তিনি পড়েননি নিশ্চয়ই, না পড়ুন, তিনি তন্ত্রবিজ্ঞানী। তিনি বলেন বিভিন্ন হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি মিশিয়ে তিনি একধরনের পাঁচন ইনজেকশন তৈরি করেন। এই তন্ত্রবিজ্ঞানীর সঙ্গে আগেভাগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। প্রথমে মোবাইলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়। কেসটা কী জানতে চান। পছন্দ হলে টেক আপ করেন। সুখময়ের কেসটা খুব জটিল। ও ফোনে বলছিল, কিন্তু তন্ত্রবিজ্ঞানী বুঝতে পারছিলেন না। ওরা ব্যস্ত মানুষ। এত সময় কোথায়? তাই সুখময়কে বললেন - কেস হিষ্টিটা লিখে নিয়ে যেতে। ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট পড়ে দেখবে। অ্যাসিস্ট্যান্টের পছন্দ হলে ওকে দেবে, তখন উনি দেখবেন। সুখময় তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে যাবার আগে কেস হিষ্টিটা লিখবে। অফিসে পারেনি। এ কেসের হিষ্টি অফিসে বসে লেখা যায় না। বাড়িতেও নয়। বাড়িতে এসব লিখলে যদি বউ পড়ে ফেলে, তো নিদারুণ ভয় পাবে। বউ ভাবছে লোকটা পাগল হয়ে গেছে। তাই ভাবুক।

যে-লোশনটা সুখময় গায়ে মাখে, তার একটা কী যেন নাম বলেছিল রসায়নবিদ। ডাই মিথাইল মনো সালফো প্যারা হাইড্রো কুইনো কী যেন। কিন্তু ও নিজেই এই লোশনটার নিজের মতো করে একটা নাম রেখেছে। 'জীবনামৃত'। বেঁচে থাকার জন্য এটা মেখেই যেতে হবে? সারাজীবন? কিন্তু শুধু এই লোশনেই বাঁচা যাবে? আরও কিছু চাই। কিছু থেরাপি। সাহস চাই মনে। প্রতিশোধস্পৃহা চাই। কী থেরাপি নেবে ও। লাদেন না বুশ?

সেটা তন্ত্রবিজ্ঞানীই ঠিক করে দেবে।

তার আগে একটা কেস হিষ্টি লেখা দরকার।

একটা ছোট বার-এ ঢুকল সুখময়। লোকজন নেই। একটা বিয়ার নিল। একটা দু'নম্বর খাতায় কেস হিষ্টি লিখতে থাকে সুখময়...

আমার নাম শ্রীসুখময় সাহা। বয়স ছত্রিশ বছর। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। ইলেকট্রনিক্স। আমি চাকরি করি একটি কম্পিউটার চালিত ফার্ম হাউস-এ। ওই ফার্ম হাউসে অনেক কম্পিউটার আছে। একটা মাস্টার কম্পিউটারও

আছে। কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেলে সারানোই আমার কাজ। আমাদের ফার্মে গোরু, ভেড়া, মানুষ, এইসব পোষা হয়। ওদের শরীরে বায়োটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং করা আছে। যেমন ধরা যাক ইনসুলিন গোরু। মানে কয়েকটা গোরুর শরীরে বায়োটেকনিকালি এমন করা হয়েছে, যে ওদের প্যাংক্রিয়াস থেকে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন বের হবে। এবার ওই গোরুদের মধ্যে বিট করিয়ে এমন একটা নতুন গোরু প্রজাতি করা হল যে যাদের শরীরে ইনসুলিনের প্রস্রবন। ওই গোরুর প্রস্রাব ইনসুলিনে ভরপুর। ওই গোরুর দু'ফোঁটা প্রস্রাব দু'ফোঁটা ফেলে দিলে কম্পিউটার বলে দেয় ক' পার্সেন্ট ইনসুলিন রয়েছে। এভাবে পিটুইটারির ছাগল, থাইরয়েডের ভেড়া, এড্রানালিনের মানুষ এসবও রয়েছে।

স্কুলে পড়ছে বাচ্চারা, কাবুলে বা ইরাকে বা কাশ্মীরে, বোমা ফেলতে হবে। হায়ার এড্রানালিনের মানুষ ছাড়া পারবে কেন? বুলডেজার দিয়ে ঝুপড়ি ওড়াতে হবে। চাই উপযুক্ত এড্রানালিনসম্পন্ন মানুষ। আমাদের ফার্ম বিদেশি টাকা ও প্রযুক্তির ফার্ম। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিংটা ওসব দেশে হয় না। এসব দেশেই হয়। আমরা ওদের কাঁচা মাল সাপ্লাই করি।

টেক্সটাইল পুরুষ, প্রজেক্টন নারীও আছে আমাদের ফার্ম হাউসে। এসব কাঁচা মাল বিদেশে যায়। মেয়েদেরও কৃত্রিমভাবে মাসে দু-তিনবার ঋতুস্রাব করানো হয়। তাদের ঋতুরক্ত থেকে প্রয়োজনীয় কাচা মাল সংগ্রহ করা হয়। সবাই মাইনেপত্র ভালই পায়। বছরে দু'বার কোম্পানি বোনাস দেয়। আপনি স্যার আমাদের কোম্পানির কথা ভালভাবেই জানেন শ্রীতন্ত্রবিজ্ঞানী, আপনি একবার আমাদের কোম্পানিতে এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের কোম্পানি খুচরো বিক্রি করে না শুনে দুঃখিত হয়েছিলেন। দু-তিন হাত ঘুরে এই দ্রব্যগুলি আপনার কাছে যায়, ফলে দাম বেশি পড়ে। আপনি স্যার আমার উপকারটা করে দিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্যাম্পল পৌঁছে দেব।

আমার কাজ, আপনাকে আগেই বলেছি কম্পিউটারের টুকটাক মেইনটেনেন্স। আমার আঙুরে একজন হেলপার আছে। মোটামুটি ভালই। বললে কথা শোনে। স্টেটমেন্টে একটু থামারের ভুল হয়ে গেল। এখানে পাস্ট টেন্স হবে। হেলপারটি ছিল। এখন নেই। স্যাড কেস। কেন স্যাড কেস বলব। সব খুলে বলব।

বছর খানেক আগেকার একটা ঘটনার কথা বলি। কম্পিউটারে একটা স্পার্মের স্যাম্পল দিয়ে টি ওয়াই টিপেছি, স্ক্রিনে দেখি কিছু মাছ খেলা করছে। কিউ টিপে বেরিয়ে গেলাম। আবার টি ওয়াই। আবার মাছ। রি স্টার্ট করলাম। সেই মাছ। রঙিন মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। এরকম কী করে হয়? বারো বছর ওই কাজ করছি, কখনও এরকম সমস্যা হয়নি। আমি কম্পিউটারটা খুলি। আমার যা বিদ্যেবুদ্ধি, তাতে কোনও গণ্ডগোল পাইনি। আমার উপরে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন। তিনি আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার। হেভি স্মার্ট। পাইপ খান। আজকাল মেয়েদের কাগজে দেখবেন 'হে পুরুষ! বলে একটা কোলাম থাকে। ওখানে চুষল সেন - শতাব্দী রায়-রা সব তাঁদের ভালোলাগা পুরুষদের কথা লেখেন। ওদের কলমের পুরুষ যেন তিনি। আমার বস। সুকান্ত রায়। সুদর্শন। খুব ওডি কোলন মাখেন। ওকেই আমার ভয়। ওর হাত থেকে বাঁচান। সব বলব। পরে আসছি। কিছুই গোপন করব না। যাহা বলিব সত্য বলিব।

আমি যখন কম্পিউটারটা সারাতে পারলাম না, তখন আমি রায় সাহেবকে ডাকা করলাম। উনি আলমারি থেকে ব্লু সিট বার করে দেখলেন, কম্পিউটারটা খুলে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছু হল না। বলছেন

মাছ কী করে আসবে। কোনও সফ্টওয়্যারেই তো রঙিন মাছ ইনপুট দেওয়া নেই। যে-কোনও ফ্লপি দিলেই স্ক্রিনে মাছ। যে-কোনও সি ডি দিলেই মাছ। মাছ ঘুরছে। ছোট্ট স্ক্রিনে সমুদ্রতল। অ্যানজেল, গোল্ড ফিস, গাপ্পি, মলি...

আমিও ভাবছি এটা কী? কী করে হচ্ছে? কম্পিউটার ভাইরাসে এমন হয়? অজানা ভাইরাস? আমি ভেবেই বা কী করব? আমি ভাববার কে? বস আছেন। আই আই টি-র বি-টেক।

বস বললেন, এর লিটারেচারগুলো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। কাল দেখব। কম্পিউটারের ডালা খোলা। আমাকে তো থাকতেই হবে। যতক্ষণ ডিউটি ততক্ষণ কাজ না থাকলেও আমি বসে আছি। কম্পিউটার রুমের উলটোদিকে একটা ছোট ঘর আছে। অ্যান্ডি চেম্বার। ওখানে থাকে সব স্পয়ার, ব্যাটারি, ট্রানজিস্টার, আই সি, সিলিকন চিপস...। হঠাৎ দেখি ওই ঘর থেকে একটা ইঁদুর এল। ইঁদুররা যেমন আসে ওরকম নয়। বেশ স্মার্টলি। এসেই টুক করে ডালাখোলা কম্পিউটারের পিছন দিকটায় ঢুকে পড়ল। কুটুস কুটুস শব্দ। আমি তাড়া করে তাড়ালাম। এরপর ডালা খোলা রাখা ঠিক নয় ভেবে ডালাটা আটকে দিলাম। আবার চালালাম। ও মা? দেখি আগেকার মতো। কোয়াইট নর্মালি। স্পার্ম কনটেন্ট ID<sup>KI</sup> পার MM<sup>2</sup> ...। ঠিকঠাক বলছে। তা হলে? তা হলে কি ইঁদুরটাই ঠিক করে দিল?

পরদিন বস এলেন। আমি বললাম- স্যার আমি আবার ট্রাই করে ঠিক করে দিলাম। বস জানতে চাইলেন কোথায় গুগুগোলটা হয়েছিল? কোন সার্কিটে? কোন সেকশনে? আমি ঠিকমতো বোঝাতে পারলাম না।

এরপরও মাঝেমাঝেই খারাপ-হত মেশিনটা। মেশিনটা খারাপ হলে শ্রেফ ডালাটা খোলা রেখে চুপচাপ বসে থাকতাম ইঁদুরটা ঠিক চলে আসত। সারিয়ে দিয়ে চলে যেত। ভাল করে লক্ষ করে দেখছি, সবসময় একটা ইঁদুরই আসত এমন নয়। কয়েকটা ছিল। বিভিন্ন সাইজের।

একদিন দেখলাম একটা ইঁদুর একবার ডালাখোলা কম্পিউটার দেখে গেল, তারপর চলে গেল স্টোর রুমে। তারপর বেছেবুঝে একটা আই সি নিয়ে এল ঠোঁটে করে ইঁদুর তো সোলডারিং করতে পারে না, দাঁত দিয়ে গর্ত করে... যা পারে আর কী। আমরা পরে সোলডারিং করে দিয়েছি।

এই ব্যাপারটা আমার হেলপারটাও জেনে গেল। ওর নাম বৃন্দাবন পাল। আমি বৃন্দাবনকে বলেছিলাম, কাউকে বোলো না।

যন্ত্রটা বড্ড বিগড়োতে লাগল। স্ক্রিনে কখনও মাছ, কখনও প্রজাপতি উড়ছে, কখনও সাপ কিলবিল করেছে, কখনও বললে বিশ্বাস করবেন না, বিল গেটস বাপের জন্মে শোনেনি এমন কিছু কড়া কীয়া গুণ্ডা কীয়া। ইঁদুরটা ঠিক চলে আসত। ভেরি পাংকচুয়াল। বিদেশি কোম্পানির ইঁদুর তো।

আমাদের ফার্মে জেনেটিক্স-এর কাজ কারবার চলে, আর ওইসব পরীক্ষার জন্য ইঁদুর-টিদুর লাগে। এইসব ইঁদুর হয়তো ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে চলে এসেছে কম্পিউটার রুমে। কী খাচ্ছে কে জানে? বাস্কে নানা ওম্‌স্-এর ট্রানজিস্টার থাকে। একদিন দেখি কয়েকটা নেই। কয়েকটা খুবলে খাওয়া। কে খেল? ইঁদুরটা? মাঝে মাঝে বস ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে একটা খেলা খেলতাম। মেশিন বিগড়োলে স্টোর রুমের দরজাটা আগে বন্ধ করি, তারপর বসকে ডাকি। উনি কিস্সু করতে পারেন না। আমি তখন গুঁকে জিজ্ঞাসা করতাম আই

আই টি-তে বিরাট ক্যাম্পাস, তাই না স্যার? ওদের পড়াশুনোর স্ট্যান্ডার্ড জার্মানি-আমেরিকার চেয়েও উন্নত, তাই তো স্যার? ওখানে বুঝি প্রচুর অ্যাডভান্স স্টাডি হয়?

উনি মাথা নিচু করে চলে যান। পরে ফাঁক বুঝে স্টোরের দরজা খুলে দিতাম। তারপরই ইঞ্জিনিয়ার ইঁদুর সারিয়ে দিত। একদিন আমার বস আচমকা ঢুকে পড়ল ঘরে। তখন একটা নয়, দুটো ইঁদুর মেশিন সারাচ্ছিল। বস দেখলেন। বললেন, সে কী? ইঁদুর কোথেকে এল। আমাকে বকলেন। এসব দেখবেন তো? ইঁদুর দুটে স্টোরে চলে গেল।

বস ঝাড়ুদার বুধনকে বলল স্টোরটা পরিষ্কার করে দিতে। বুধন এল। দরজা বন্ধ করে কী সব করল। চলে গেল। সেদিন ছিল শুক্রবার। দু’দিন ছুটি। সোমবার যন্ত্র বিগড়ে গেল। স্ক্রিনে প্রজাপতি উড়ছে। বসে আছি ইঁদুরের ভরসায়। আসছে না। গোড়োর জন্য অপেক্ষা। এলেন না। বস ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাব কি না ভাবছি, এমন সময় উদ্ভাস্তের মতো ঘরে ঢুকল বুধো। মানে বুধন জমাদার। বুধোর গাম বুটে নোংরা। কম্পিউটার রুমে ঢুকবার আগে জুতো খুলে আসাই নিয়ম। তা জানে, কিন্তু ও বিচ্ছিরি অবস্থায় ছুটে চলে এল। বুধো সোজা কম্পিউটারের পিছনে চলে গেল খুট খুট করে কী যেন করল, এবং বেরিয়ে গেল।

এবার চালিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে। আমি আর আমার হেলপার বৃন্দাবন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না। ইঁদুরের বদলে বুধো?

ক’দিন পরে যন্ত্রটা আবার খারাপ হয়ে গেলে একইভাবে বুধো এল, সারাই করল। আমি বুধোকে আটকালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, বুধো, ব্যাপারটা কী সত্যি করে বলো। বুধো বলল, হচ্ছে আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথায় কেমন যেন হয়, তখন চলে আসি। একটু আগে বড় সাহেবের কমোড পরিষ্কার করছিলাম, তখনই মাথার মধ্যে কীরকম বিপ বিপ শব্দ তারপর কিছু জানি না। কীরকম যেন নেশালাগা ঘোর। এখন দেখি আমি এখানে।

বলি মেশিনের কী করলে তুমি? ও বলে, জানি না স্যার। কিছু খারাপ করলাম? মাপ করে দেন স্যার।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। সাদা হাফ প্যান্টের ভিতরে নীল শার্ট গোঁজা। পায়ে গাম বুট। বুধন। অপরাধে নিচু মুখ।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, একটা সত্যি কথা বলো তো বুধন- স্টোর রুমের ইঁদুরগুলো তুমি কী করেছ?

বুধো সরলভাবে বলল- কেন স্যার? নষ্ট করব কেন? খেয়েই নিলাম।

ইঁদুর খেলে কেন? তুমি কি জানতে ওই ইঁদুর খেলে...

স্যার, আমরা জাতে ‘কোরা’। ইঁদুর তো পেলেই খাই। প্যাঁজ-রসুন-লঙ্কা...। ইঁদুর খেতে খুব ভাল স্যার। সেদিন চার-পাঁচটা বড় ইঁদুর পেয়ে গেলাম, আর গোটা কত বাচ্চা। একবেলা বেশ ভালই হল...

হায়। একটা ইঞ্জিনিয়ার প্রজন্ম নষ্ট করে দিল বুধো...

বুধো আমাদের ফার্ম হাউসেই থাকে। একদিন খারাপ হল মেশিন, ও তখন ঘরে বসে মদ খাচ্ছিল। ওর সেদিন অফ ডে। ও টলতে টলতে এসে ঠিক করে দিয়ে গেল।

ঠিক সেইসময় আমার মায়ের হার্ট অ্যাটাক হল। মারাও গেলেন। দিন পনেরো ছুটি নিতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি আমার হেলপার বৃন্দাবন পালের জয়-জয়কার। মেশিনপত্র খারাপ হলেই সারিয়ে দিচ্ছে।



কোম্পানি বলছে এরকম একটা ট্যালেন্টকে সুখময় সাহা অ্যাডিন চেপে রেখেছিল, ছিঃ। ও সামান্য ইলেকট্রিশিয়ান সার্টিফিকেট হোল্ডার হতে পারে কিন্তু অসামান্য ট্যালেন্টেড। এতদিন বোঝা যায়নি। আমি দেখলাম সত্যিই। আমার হেলপারটি খুব তাড়াতাড়ি মেশিনপত্তর সারিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বুধো নেই। বুধো নিপাত্তা।

বুধো মাঝেমধ্যে ডুব মেরে যায়। কাউকে না জানিয়ে। কিন্তু ও খুব ‘কাজের’ বলে চাকরি যায় না।

বুধোর দেশের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠানোর পর বুধোর খুড়তুতো ভাই এসে জানাল বুধো আদৌ দেশে যায়নি। তার মানে বুধো নিখোঁজ।

আমি সন্দেহ করি বৃন্দাবনকে। বৃন্দাবন কি ক্যানিবালা? নাকি ক্যারিয়ার মানুষকে ক্যানিবালাও করে দিতে পারে?

আমি একদিন বৃন্দাবনকে মাল খাওয়াই। মালের ঘোরে ও বলেছিল-ও বুধোকে খেয়ে ফেলেছিল। তন্ত্রবিজ্ঞানী ডা. বটব্যালের নৃসিংহ অবতার ইন্টারভেনাস ইনজেকশনের কথাও বলেছিল। বলেছিল দারুণ ইনজেকশন।

তারপর স্যার আমারও ইচ্ছে হল বৃন্দাবনকে খাই। হবে নাই বা কেন? দোষের? আমি একটা শনিবার আপনার চেম্বারে গেলাম। আমি তো জানতাম না যে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে আপনার সঙ্গে দেখা করা যায় না। আমি যেদিন আপনার চেম্বারে গেলাম, সেদিন দেখি আপনার চেম্বার থেকে ব্যস্তভাবে বের হচ্ছেন আমার বস সুকান্ত রায়। উনি কিন্তু আমাকে দেখতে পাননি। আই অ্যাম শিয়োর। তারপর দিন থেকেই বৃন্দাবন নিখোঁজ।

বৃন্দাবন তো আমার পাওনা ছিল, তাই না? আমার রাগ হয়। রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমি একদিন বসকে ফেলি বৃন্দাবন পালের কী হয়েছে আমি জানি। আই নো হোয়াট হ্যাপেন্ড। আপনি ‘নৃসিংহ অবতার’-নে নেনি?

বসের মুখ হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। উনি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, আই উইল সি ইউ।

অফিসারের সি মানে কি ইট? ই এ টি? সেই থেকে আমি গায়ে দুর্গন্ধ মেখে ঘুরি। বিশ্বাদ মেখে ঘুরি। শরীরে মেখেছি মৃত্যু শুধু জীবনের জন্য। শরীরে তেতো। আমার বউকে ভালবাসার ঝোঁকে চুমু খেয়েছিলাম। ওর ঠোঁটে তিন দিন তেতো লেগে ছিল।

আমার তেতো চামড়াও কি খেয়ে নেবে আমার বস! হয়তো তাও খাবে। ক্যারিয়ার স্যার। একজনকে না মারলে যে অন্যজন টিকছে না। স্যার এখন দারুণ কাজ করছেন। সব মেশিন ঠিক করে দেন। কিন্তু আমি যে লুপ্ত বৃন্দাবন কথা জানি...।

মাননীয় তন্ত্রবিজ্ঞানী, আমাকে নৃশংসতা দিন, প্রতিশোধ স্পৃহা দিন, থাবা দিন, শ্বা দন্ত দিন আমাকে...।

আমি সুখময়।